শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র জীবন-চরিত রচনার পথিকৃৎ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন শান্তিনিকেতন গুণীমণ্ডলীর অন্যতম। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদি পর্ব থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অবিছিন্ন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল।

প্রভাতকুমারের ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখবেন দুটি খণ্ডে; কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। দ্বিতীয় খণ্ডটি তিনি লিখে যেতে পারেন নি কিন্তু প্রথম খণ্ডটিতেই জানা যায় শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং নানান অজানা তথ্য।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত এই গ্রন্থটি সুধী পাঠকমণ্ডলীর কাছে সমাদৃত হবে।

উৎসর্গ

জ্ঞানতপস্বী, ছাত্রবৎসল
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর হস্তে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
সপ্রীতি অর্পিত
হইল।

গোঁসাইজি, আপনার সদা-উৎসাহবাণী এ বইখানি লিখতে আমায় কতটা-যে সহায়তা করেছে তা জানি আমি, আর জানেন আপনি। ইতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১১ শ্রাবণ ১৩৬৯

চি ত্র সূ চী

(পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯ -এর মধ্যবর্তী)

লেখকের ভ্রাতা
ঁসুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়ের
আলোকচিত্রগুলি এই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ইতিহাস ভেবেছিলাম অতি বিস্তারিতভাবে 'রবীন্দ্রজীবনী' চার খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে অনুরূপ আকারে এক খণ্ডে লিখব; তার জন্য বহু বৎসর ধরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। আরো তথ্য পাবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলার প্রত্যেকটি দৈনিকে পঁচিশে বৈশাখ এক আবেদনপত্র প্রকাশ করি। তার উত্তর দিয়েছিলেন একজন প্রাক্তন ছাত্র। বুঝলাম আমরা তত্ত্বালোচনায় যতটা আনন্দ পাই, তথ্য অনুসন্ধানে ততটা উৎসাহ পাই না। এই বই লিখছি শুনে ঘরে-বাইরের অনেকেই প্রশ্ন করেন— 'সত্যকথা লিখতে পারবেন তো?' কোনো প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলার বলেছিলেন, 'আপনি তো শান্তিনিকেতনের ঘরবাড়ির ইতিহাস লিখবেন।' অর্থাৎ সকলেরই ইচ্ছা বিশ্বভারতীর এমন একটা ইতিহাস লিখি, যেটাতে এখানকার প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পাবে। সেই প্রকৃত মূর্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু পৃথক।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যেমন শুক্লপক্ষ তেমনি কৃষ্ণপক্ষ আছে। আমি এই গ্রন্থে সেই কথাই বলেছি যা রবীন্দ্রনাথের সত্যের সহিত পরীক্ষার ইতিহাস। দেখা যাচ্ছে, স্কুল স্থাপন বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ছককাটা ঘর ভরতি করলেই হয়। একটা কাগজের আঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান সেভাবে সরকারি অনুগ্রহে পুষ্টিলাভ করে নি বহু বৎসর। কবির নিজের অর্থ, বন্ধুদের অর্থ, ভিক্ষালব্ধ অর্থ, নৃত্য-গীত-অভিনয় করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিশ্বভারতী চলে ত্রিশ বৎসর (১৯২১-৫১)। এই অর্থ সব সময়ে ঠিকভাবে হয়তো ব্যয়িত হয় নি, সেটা অভিজ্ঞতার অভাব থেকেও বটে, পরীক্ষা করে দেখবার উৎসাহ থেকেও খানিকটা ঘটে। ভারত স্বাধীনতালাভের পর যে টাকা জলের মতো ব্যয়িত হচ্ছে, তার সবটাই কি ন্যায্য ব্যয়? মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব তার একটা বড়ো কারণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও তাই ঘটেছে। আঙুল পুড়িয়ে শিখতে হয়েছে। আগুনে জ্বালা ধরেছে তবুও বারে বারে পরীক্ষা করতে হয়েছে। অপব্যয় করে জানতে হয়েছে ব্যয়-সংকোচ করার প্রয়োজন। অযোগ্য মানুষের উপর ভার দিয়ে শিখতে হয়েছে যোগ্য লোকের প্রয়োজন কতটা। সবটাই যে শুভবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হয়েছে, তাও বলতে পারি নে। সেই কৃষ্ণ যবনিকা নাই বা তুললাম। তাতে কি সত্যের অপলাপ করা হবে?

এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত— যাঁরা জানতে চান রবীন্দ্রনাথের সত্যের সঙ্গে পরীক্ষার কথা। পৃথিবীর কোনো কবি কোনো কালে বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজের অর্থ, সময়, সামর্থ্য ঢেলে দেন নি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে তিনি একক, নিঃসঙ্গ। কিন্তু যেখানে তিনি কর্ম সৃষ্টি করেছেন, সেখানে বহুমানবের অভ্যুদয় হয়েছে।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাস একখণ্ডে বিবৃত হয়েছে সাধারণভাবে। ইচ্ছা আছে, বিশ্বভারতীর বিচিত্রদিকের কথা পরবর্তী খণ্ডে লেখবার। কত পরীক্ষা হয়েছে, কত ব্যর্থতার গ্লানি চাপা রয়েছে। কিন্তু সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে, এখানকার মনস্বিতার ইতিহাস। বীরভূমের প্রান্তরে অবস্থিত এক পল্লীর উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল। কেউ কল্পনাও করে নি, স্বপ্নেও ভাবে নি যে কালে এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যার চর্চাকে কেন্দ্র করে। তা সফল হয়েছে এখানে— এ কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করব। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর আদিপর্বের দীন আয়োজনের মধ্যে এখানকার জ্ঞান-তপস্বীরা যে কাজ করেছেন, তার তুলনা খুব কমই মেলে। সেই-সব কথা বলতে হবে পরবর্তী খণ্ডে।

পুঁথিগত শিক্ষাকেই যদি রবীন্দ্রনাথ চরম বলে মনে করতেন, তবে শ্রীনিকেতন স্থাপন করতেন না। কৃষি, শিল্প, সমবায়— জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড— গ্রাম হচ্ছে তার আধার। সমস্ত কিছুই ঘুরছে সেই সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে। সেই পল্লীসমাজের পুনর্গঠন কবি-জীবনের ধ্যানের বস্তু ছিল; সেটি মূর্তি পরিগ্রহ করে শ্রীনিকেতনে।

আজ ভারত সরকার যে পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তার বুনিয়াদ খুঁজতে হবে শ্রীনিকেতনের ইতিহাসের মধ্যে। তেমনি বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ইতিহাস বের হবে শিক্ষাসত্রের পুরোনো কথার মধ্যে।

আজ বিশ্বভারতীর অর্থদৈন্য ঘুচিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু এককালে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ বিদ্যায়তনের ব্যয়ের অনেকখানি ঘাটতি পূরণ করত। ১৯২৩ সনে ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রদত্ত ছাব্বিশ হাজার টাকার রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে এই বিভাগের পত্তন। তার পর গত চল্লিশ বৎসরে এই বিভাগ যে অভাবনীয় উন্নতি করেছে, সম্পাদনাকার্যে ও পুস্তক-গ্রন্থন ব্যাপারে যে আদর্শ সে স্থাপন করেছে, তজ্জন্য বাংলার প্রকাশনী শিল্প ও ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাকে আমরা মুখ্য স্থান দিতে পারি।

সংগীত ও কলা-চর্চায় শান্তিনিকেতন এককালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল; সে ইতিহাস আনন্দের সঙ্গে বলবার মতো, শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনবার মতো।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমাকে সর্বদা তাগিদ করে এসেছেন গোঁসাইজি ; আর করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। এ কথা অনস্বীকার্য যে আজ বিশ্বভারতীর অনেকখানি উন্নতির জন্য দায়ী রথীন্দ্রনাথ। তাঁর বহু বৎসরের নিঃস্বার্থদানের কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। 'The good is oft interned with the bones'— এ যেন না হয়। গোঁসাইজি আজ গতিশক্তিহীন হয়ে শয্যাশ্রয়ী; কিন্তু তাঁর মন এখনো সজাগ ও সচল। অদ্বৈত-বংশে জন্ম তাঁর— রসের নাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। চিরদিন হাস্যোজ্জ্বল জীবন কাটিয়েছেন আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে। এই জ্ঞান-তাপসের কাছে যে বসেছে, সেই তাঁর রসের ও জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতায় মুগ্ধ হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য প্রথম দায়ী কল্যাণীয় শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। তিনিই আমাকে নিয়ে যান বুকল্যান্ডের জানকীবাবুর কাছে। জানকীবাবুর সৌজন্যে এমন মুগ্ধ

হলাম যে গ্রন্থ লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা কেমন করে করব ভাবছি। এ বিষয়ে সব থেকে উৎসাহী হলেন ঘরের লোকটি; কথা দিয়েছি— এ কথাটা বারে বারে জানিয়ে দেন তিনি। শেষকালে কথা রাখবার আয়োজনে বসলাম; 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' লেখা হল। প্রথম খণ্ড সাধারণের হাতে দিলাম। যদি পরমায়ু থাকে, দ্বিতীয় খণ্ড একদিন দেব; না থাকে, যে-সব কাগজপত্র ফাইলে ফাইলে সাজানো আছে, তা থেকে কোনো নিষ্ঠাবান গবেষক কাজ করতে পারবেন। আমার বয়স যে সত্তর পূর্ণ হল। ইতি

ভুবননগর
বোলপুর, শান্তিনিকেতন
১১ শ্রাবণ ১৩৬৯। ২৭ জুলাই ১৯৬২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১

'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী' শব্দ দুইটির সংজ্ঞা প্রথমেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ অর্ধশতাব্দী পূর্বে শান্তিনিকেতন অর্থে বুঝাইত একটি দ্বিতল গৃহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত, আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিশ্বভারতী শব্দ প্রথম সৃষ্ট হয় উচ্চ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে। এই দুটি শব্দ স্থানবাচক নহে।

কালে শান্তিনিকেতন বলিতে মূল আশ্রমের বিশ বিঘা জমি ও তাহার বাহিরে বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গৃহাদিও বুঝাইত। অতঃপর শান্তিনিকেতন পোস্টাফিস স্থাপিত হইলে ইহার পরিধি গ্রামাঞ্চলে বিস্তারলাভ করে অর্থাৎ সেই অঞ্চল শান্তিনিকেতন ডাকঘরের এলাকাধীনে আসে। শান্তিনিকেতন ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইলে উহার এলাকা অন্য প্রকার এককে পরিণত হয়। পঞ্চায়েতপ্রথা প্রবর্তিত হইলে শান্তিনিকেতনের সংজ্ঞা পুনরায় পরিবর্তিত হইয়াছে। কয়েক-বৎসর হইল বোলপুর স্টেশনের নাম হইয়াছে বোলপুর-শান্তিনিকেতন। সুতরাং শান্তিনিকেতন নাম আরো বিস্তারলাভ করিয়াছে। স্থানীয় ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ পশ্চিম-বঙ্গীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইবার পূর্বে 'শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই' নামে পরিচিত ছিল। মোটকথা, শান্তিনিকেতন নাম নানা সময়ে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা আশ্রম— এই নামেই উহার পরিচয় সুদূরপ্রসারিত।

বিশ্বভারতী শব্দ ১৯১৮ সনে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়— যত্র বিশ্বম্ ভবতি একনীড়ম্— যেখানে বিদ্যা আহরণ ও জ্ঞানচর্চার জন্য বিচিত্র মানব আসিয়া একটি নীড় বাঁধিবে। প্রথমদিকে ইহার অর্থ ছিল বিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগ— যেখানে ভারতীয় নানা বিদ্যাচর্চা হয়। পরে একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটিরূপে বিশ্বভারতী গঠিত হয় ১৯২২ সনে। সেই সোসাইটি বা পরিষদ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও বৈষয়িক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করে। ১৯২৩ সন হইতে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ এই সমিতির তত্ত্বাবধানে আসে। তার পর ত্রিশ বৎসর পরে (১৯৫১) বিশ্বভারতী য়ুনিভার্সিটি পর্যায়ে উন্নীত হইলে ইহার সীমানা ১১ বর্গমাইল নির্ধারিত হইল। বর্তমানে শান্তিনিকেতন শব্দের স্থলে বিশ্বভারতীই প্রযুক্ত হইতেছে।

২

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবি। বাংলা ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষা-অনভিজ্ঞদের পক্ষে তাঁহার রচনার মূলগত রস অনুভব করা অসম্ভব। অনুবাদের মাধ্যমে কেবল ভাবগত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

কিন্তু শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধির নবরূপায়ণদান বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সহিত কবি রবীন্দ্রনাথের অমরস্থান যে সুনির্দিষ্ট সে বিষয়ে মতভেদ নাই।

'রবীন্দ্রজীবনী'র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় আমি বলিয়াছিলাম যে চারি খণ্ডে দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠায় কবির বাণীবিকাশের ইতিহাস লিখিয়াও মনে হইতেছে— তাঁহার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিশ্বভারতী'র ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বলা হয় নাই। যেখানে তিনি কবি ও মনীষী, সেখানে তাঁহার সৃষ্টিকার্যে তিনি নিঃসঙ্গ। কিন্তু যেখানে তিনি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, সেখানে শত শত লোকের সহায়তা তাঁহাকে নিত্য যাচ্‌ঞা করিতে হইয়াছে। জীবনের শেষপর্যন্ত পরমশ্রদ্ধাশীল আদর্শবাদী পুরুষের পাশাপাশি উদাসীন, শ্রদ্ধাহীন, এমন-কি, বিদ্রূপকারীদের প্রতিকূলতাকে স্বানুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সেই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের ইতিহাস কবিজীবনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই ইতিহাস বচিত হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে; কারণ বিশ্বভারতী তাঁহার ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ'।

কিন্তু বিশ্বভারতীর সেই ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, ইহার আরম্ভ কোথায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপজ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।' আজ বিশ্বভারতীর যে দীপ জ্বলিতেছে এবং যাহার আলোকরশ্মিতলে দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানী গুণী অনুসন্ধিৎসুর দল সমবেত হইতেছেন— তাহার আয়োজনপর্বেরও দীন ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া স্বভাবতই এই কথা মনে হয়— শান্তিনিকেতন, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বভারতীর সূত্রপাত, সেই স্থানটি একটি মহাসাগরের দ্বীপ বা বালুসাগরের মরূদ্যান নহে— তাহা 'যুগান্তরের মৃত্তিকা বন্ধন'যুক্ত বসুন্ধরারই অন্তর্গত দেশ।

এখন প্রশ্ন উঠে, কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও মানীর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, পিতার বিষয়পঙ্কিল পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বেলগাছিয়ায় গঙ্গার তীরে প্রমোদকানন বা বাগানবাড়ি স্থাপন না করিয়া বীরভূমের এই প্রান্তরে 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠা কেন করিলেন: আর সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথ সেখানে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন ও বিশ্বভারতীই বা প্রতিষ্ঠা কেন করিলেন ; এবং কবিপুত্র পিতার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত বা কেন করিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া 'আরম্ভের পূর্বে আরম্ভের কথা' স্বভাবতই আসিয়া পড়ে।

শান্তিনিকেতনের সেই প্রারম্ভিক ইতিহাস— যাহার সহিত বীরভূমের রায়পুর, সুপুর, সুরুল, বোলপুরের স্থানিক ইতিহাস জড়িত— তাহার কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়িবে। শান্তিনিকেতনের সেই আদিযুগের কথা বলিবার পূর্বে যে-রায়পুরের সিংহ পরিবারের নিকট

হইতে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর মৌজার অন্তর্গত ভুবনডাঙা গ্রামের নিকট বিশ বিঘা জমি মৌরসি পাট্টার বন্দোবস্ত লইলেন, সেই রায়পুরের ইতিহাস সংক্ষেপে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

৩

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বীরভূম ছিল নানা শিল্পের কেন্দ্র। সুরুল ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর তুলা ও রেশম উৎপন্ন হইত। ইক্ষুর চাষ ছিল পর্যাপ্ত। প্রচুর গুড় ও গুড় হইতে শর্করা ও চিটেগুড় প্রস্তুত ও রপ্তানি হইত। জেলায় অনেকগুলি লোহা প্রস্তুতের 'শাল' ছিল— লোহাগড়, লোহাপুর প্রভৃতি গ্রাম এখনো পূর্বস্মৃতি আপন নামের মধ্যে বহন করে; বাগদি নামে এক উপজাতির একটি শাখা লোহার শালে কাজ করিত বলিয়া এখন লোহার বা 'নোয়ার' বাগদি নামে পরিচিত। সুরুলের নিকট লোহাগড় গ্রামের আশেপাশে এখনো লোহাপোড়ানো খাদ দেখা যায়।

বীরভূম অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের আকর্ষণে ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা এই দিকে আসা-যাওয়া শুরু করে ও নানাস্থানে আড়ত ও কারখানা স্থাপন করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতকের শুরু হইতে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করে। ১৭৬৫ অব্দে যখন তাহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহ আলম-এর নিকট হইতে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানিপদ গ্রহণ করে, তার পূর্বেই তাহারা বাণিজ্য ব্যাপারে পূর্ব ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হইয়া কোম্পানির নিজখাতে ব্যবসায়াদি চালু করিবার ব্যবস্থা করেন। এতাবৎকাল সাহসিক ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দেশ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোম্পানি তাহাদের নিকট হইতে মাল খরিদ করিত। কিন্তু এই বিদেশীরা বা সাহসিকরা আপনাদের খাতে ব্যাবসা করিতে পারিলে ইংরেজ কোম্পানির লোকদের মাল দিত না। তাই কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় দালালদের কমিশন দিয়া ও পরে গোমস্তাদের বেতন দিয়া মালপত্র সওদা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু দেখা গেল দালালরা মালপত্র শর্তানুসারে দেয় না; দাম অযথা দাবি করে, নিকৃষ্ট মাল চালান দেয়। তখন কোম্পানির নিযুক্ত ইংরেজকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হইল। ইহাদের বলা হইত Commercial Resident। বাংলাদেশের নানাস্থানে এই পদ সৃষ্ট হয়; মালদহ, কাশিমবাজার, রামপুর-বোয়ালিয়া বা রাজশাহী, কুমারখালি, সোনামুখী প্রভৃতি স্থানে। সোনামুখী এখন বাঁকুড়া জেলাভুক্ত। এই সোনামুখী রেসিডেন্সির তত্ত্বাবধানে ছিল ৩১টি কারখানা বা ফ্যাক্টরি। এই রেসিডেন্সিতে মি. চীপ নিযুক্ত হন। তবে তিনি তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করেন সুরুলে— বর্তমান বোলপুর শহরের দুই মাইল পশ্চিমে। জন চীপ ২৫০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া তাহার উপর কুঠিবাড়ি, নীলের কারখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। সে-সবের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়।

চীপ ১৭৮২ অব্দে ষোলো বৎসর বয়সে বাংলাদেশে কোম্পানির চাকুরি লইয়া আসেন। ১৭৮৭ অব্দে ২১ বৎসর বয়সে তিনি বীরভূম (বাঁকুড়ার) কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ৪১ বৎসর তিনি এই জেলায় বাস করেন। ১৮২৮ অব্দে গুনুটিয়ায় কার্য পরিদর্শন করিতে গিয়া সেখানে মারা যান। সেখানে তাঁহার কবর আছে। গুনুটিয়ায় তাঁহার বিরাট রেশমের কারখানা ছিল।

মি. চীপের কারবার তত্ত্বাবধান করিতেন শ্যামকিশোর সিংহ— মেদিনীপুর চন্দ্রকোনার লোক। শ্যামকিশোর চন্দ্রকোনা হইতে কয়েক শত তন্তুবায় পরিবার সুরুলের নিকটস্থ গ্রামে বসাইয়াছিলেন। এই-সব তাঁতি 'গড়ার কাপড়' অর্থাৎ হাতে-কাটা মোটা সুতায় কাপড় বুনিয়া কুঠিয়াল চীপকে দিত। এই-সব কাপড় জাহাজের পালের জন্য ব্যবহৃত হইত। আফ্রিকা ঘুরিয়া য়ুরোপ হইতে জাহাজ আসিতে সময় লাগে প্রায় ছয় মাস। লোনা জলের ঝাপটে জাহাজের পাল যায় জীর্ণ হইয়া; ফিরতি পথে নূতন পালের প্রয়োজন হয়। যাহাই হউক, চীপ সাহেবের বিচিত্র কাজের সহিত যুক্ত থাকায় শ্যামকিশোর প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন ও তিনি বিপুল জমিদারির মালিক হন। অজয় নদীর তীরে রায়পুর গ্রামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করান। এইভাবে বোলপুরের নিকট রায়পুরের সিংহ পরিবারের উদ্ভব ও বিস্তার শুরু হয়। বোলপুর মৌজার অন্তর্গত ভুবনডাঙা গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান রায়পুরের সিংহদের জমিদারির অন্তর্গত।

চীপ সাহেবের আরেকজন সহায়ক ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীনিবাস সরকার— বর্তমান সুরুল গ্রামের তিনি পূর্বপুরুষ। ইঁহাদের বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এখন বহু শরিকের মধ্যে বিভক্ত। জন চীপ ৪১ বৎসর সুরুল, গুনুটিয়া ও বাঁকুড়ার সোনামুখী কুঠির কর্তা ছিলেন। সুরুলের কুঠিবাড়িতে তিনি রাজার মতো বাস করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবসায় ছিল। তিনি এই অঞ্চলে নীলের চাষ প্রবর্তন করেন। নীল তৈয়ারির গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়। উন্নততর পদ্ধতিতে চিনি প্রস্তুতের জন্য যন্ত্রপাতি তিনি বিদেশ হইতে আনয়ন করেন। ১৮২৮ অব্দে জন চীপের মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি এই সময়ে কলিকাতায় রামমোহন রায় একেশ্বরবাদ ধর্মপ্রচারে রত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৮১৭) বয়স ১১ বৎসর।

জন চীপের মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁহার সম্পত্তির মূল্য হইতে তাঁহার কারবারের ঋণ অনেক বেশি। অ্যাসেট ৮৫ হাজার ও ঋণদায় দেড় লক্ষ টাকা। ফলে তাঁহার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইল এবং মিসেস চীপকে তাঁহার সন্তানাদি লইয়া বহরমপুরে আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

১৮৩৩ অব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার লুপ্ত হয়। তখন চীপ সাহেবের কুঠি রায়পুরের সিংহরা ক্রয় করেন। শতাব্দীকাল পরে বিশ্বভারতী এই-সকল স্থান উহার কর্মপ্রসারের জন্য সরকারের সাহায্যে কিনিয়া লন। ১৯৫৬ অব্দে সমাজশিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্র (Social Education Organisers' Training Centre বা SEOTC) এখানে স্থাপিত হয়। ইহা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ইহার তত্ত্বাবধায়ক।

৪

কালবদলের হাওয়ায় একদিন রায়পুরের সিংহ পরিবারের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিকতার পরিবেশ দেখা দিল। শ্যামকিশোরের পুত্র ভুবনমোহন সিংহ এতদঞ্চলে প্রথম নামকবা জমিদার। বোলপুরের উত্তরে তিনি যে গ্রামপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ভুবনডাঙা নামে পরিচিত। তিনি সেখানে একটি সোঁতায় বাঁধ দিয়া এক বিশাল দীঘি বা বাঁধ নির্মাণ করান। ১৯৩৫ অব্দে এই বাঁধের সংস্কারের পর রবীন্দ্রনাথ ইহার নামকরণ করেন ভুবনসাগর। এই গ্রামে ভুবনমোহন সিংহ বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমের নানাস্থান হইতে মুসলমান ও বহু হরিজন যেমন, রাজবংশী বা আঁকুড়ি ডোম, হাজরা বা হাড়ি এবং বায়েন বা মুচি কয়েকটি পরিবার আনাইয়া বসান। তাহাদের বংশধরগণ বহু শাখায় আজ পল্লবিত হইয়াছে।

এদিকে বঙ্গদেশে রেলওয়ে লাইন পত্তন শুরু হইয়া গিয়াছে। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও উত্তর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার বুঝিয়াছিলেন যে দ্রুত চলাচলের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। ১৮৫৮ অব্দে অজয় নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়। অজয় হইতে সাঁইথিয়া পর্যন্ত রেলপথ তৈয়ারি শেষ হয়— ১৮৫৯ অব্দের ৩ অগস্ট (১৯ ভাদ্র, ১২৬৬); বোলপুরের রেলস্টেশন সেই সময়ের।

এই রেলপথ নির্মাণকালে সুরুল গ্রামের নিকট রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার মি. উইলসনের বাসগৃহ, অফিস, কারখানা, গুদামঘর তৈয়ারি হয়। প্রথমে কথা ছিল লুপলাইন সুরুলের দিক দিয়া উত্তরমুখী হইবে। কিন্তু পরে ঐ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। সে-সময় বোলপুর হইতে সুরুলের রেলকারখানা পর্যন্ত রেলপথ ছিল।

রেলওয়ে লাইন তৈয়ারির কাজ সমাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ এইখানকার ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া দেন, রায়পুরের সিংহরা উহা ক্রয় করিয়া লন।

ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতলগৃহ এখন বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বিশ্বভারতী পল্লী-সংগঠন বিভাগের দপ্তরখানা হইয়াছে। রেলওয়ে গুদামঘর এখন শিল্প-সদনের অন্তর্গত হইয়া আছে।

কীভাবে এইস্থান বিশ্বভারতীর হস্তগত ও কীরূপে ধীরে ধীরে এইস্থানের পরিবর্তন সংঘঠিত হয়, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

৫

শ্যামকিশোর সিংহের দুই পুত্র— ভুবনমোহন ও মনোমোহন। ভুবনমোহনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ কলিকাতায় শিক্ষিত হন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভুবনডাঙার মাঠে ২০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করেন। মনোমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকণ্ঠ মহর্ষির পরম ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে ইঁহাকে সাহিত্যের তুলিকায় অমর করিয়া গিয়াছেন। মনোমোহনের অপর

দুই পুত্র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ও নরেন্দ্রপ্রসন্ন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কালে লর্ড এস. পি. সিংহ নামে ভারতবিখ্যাত হন। ইঁহার প্রদত্ত অর্থে শান্তিনিকেতনের মধ্যে নির্মিত 'হল' (Hall) সিংহ-সদন নামে পরিচিত। নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ অব্দে ইংলন্ডে বাসকালে সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন। এইরূপে রায়পুরের সিংহ পরিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সহিত দীর্ঘকাল নানাভাবে জড়িত ছিলেন।

এ কথা পাঠকদের নিকট সুবিদিত যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৩ অব্দের ২২ ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং তার পর ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু প্রচারকর্ম ছাড়াও তিনি ধর্মসাধনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। নির্জন তপস্যার জন্য হিমালয় অঞ্চলে গমন করেন ১৮৫৬ অব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর। সেদিকে তিনি দুই বৎসর কাল বাস করেন। সিমলা শৈলবাসকালে তিনি কলিকাতায় রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিতেছেন (২৭ জুলাই, ১৮৫৮) 'তুমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে— বীরভূমবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।'

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের (১৫ নভেম্বর, ১৮৫৮) পর দেবেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ভুবনমোহনের আমন্ত্রণে তিনি দুইবার রায়পুর গ্রামে তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন (১৮৬২ ফেব্রুয়ারি ও মার্চে)।

এই রায়পুর আসা-যাওয়ার সময় ভুবনডাঙার প্রান্তর দেবেন্দ্রনাথের মন ভুলায় এবং রায়পুর আসিবার এক বৎসরের মধ্যে (১ মার্চ, ১৮৬৩) ভুবনডাঙার জমি বন্দোবস্ত লন। বোলপুর হইতে রায়পুর যাইতে এখন যে রাস্তা আছে তাহার উপর শান্তিনিকেতনের প্রান্তর পড়ে না। এই স্থানটি যথার্থভাবে পড়ে গুনুটিয়া-সুরুল রাস্তার উপর। সেই রাস্তা শান্তিনিকেতনের উত্তর দিয়া ছিল— পুরাতন মানচিত্রে তাহা দেখা যায়। কীভাবে এই প্রান্তর দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভূত হয়, তাহা সঠিক বলা যায় না। রায়পুর হইতে সুরুল পর্যন্ত পথ এখনো আছে। সেই পথে আসিয়া তিনি বোলপুরে আসিতেও পারেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে দূরের এই প্রান্তর-মধ্যে আসিয়া থাকিবেন। মোটকথা এই সমস্যাটির মীমাংসা এখনো পাওয়া যায় নাই।

ভুবনডাঙার জনশূন্য প্রান্তরে বিশ বিঘা জমির উপর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পরিকল্পিত নির্জন সাধনপীঠ স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে বাসোপযোগী করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। চারি দিকের তৃণশূন্য প্রান্তরে উদ্যান রচনার জন্য কঙ্করমিশ্রিত মৃত্তিকা সরাইয়া অন্য স্থান হইতে উৎকৃষ্ট মাটি আনা হয়। উদ্যানে আম, জাম, কাঁঠাল, আমলকি, হরিতকি, মহুয়া, নারিকেল, তাল, শাল, দেবদারু, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি বিবিধ ফলবান ও ছায়াতরু রোপিত হয়। বীরভূমের কঙ্করময় প্রান্তর রূপান্তরিত হইল উদ্যানে। সাধারণ লোকের কাছে শান্তিনিকেতনের নাম হইল 'বাগান'। প্রথমে একটি একতল গৃহ নির্মিত হয়, সেটিকেই বলা হইত শান্তিনিকেতন। ১৮৭৩ অব্দে অর্থাৎ জমি ক্রয়ের দশ বৎসর পর, রবীন্দ্রনাথ যখন ১১ বৎসর বয়সে এখানে আসেন, তখনো শান্তিনিকেতন অট্টালিকা দ্বিতল হয় নাই।

জলাশয় ব্যতীত উদ্যানের শোভা হয় না। সেজন্য মহর্ষি একটি পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করান। শান্তিনিকেতনের উত্তরকোণে উহার পাড় রাস্তা হইতে দেখা যাইত। এই পাড়ের

উপর পূর্বমুখী একটি বেদী নির্মিত হয়, সেখানে প্রভাতে মহর্ষি চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন বলিয়া শোনা যায়। পুষ্করিণী খনন করা হইল, কিন্তু জল পাওয়া গেল না। ইহার কারণ, এ অঞ্চল সমুদ্রতল হইতে উঠিয়াছে। এখানকার ভূগর্ভে এমন প্রকৃতির মৃত্তিকা আছে, যাহা জলধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। এই অঞ্চলে সাধারণত বৃষ্টির জল ধারণ করিবার জন্য বাঁধ নামে জলাধার নির্মিত হয়। এই কারণে মহর্ষির এই সাধু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পুষ্করিণীর এই স্থানটি ১৯৬১ অব্দে বিশ্বভারতী হইতে ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার ইহার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। এই পুষ্করিণীটিকে সংস্কার করিয়া উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সুপারিশ করেন অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস। তিনি বলিয়াছিলেন ঢালুপাড়ে বসিবার স্থান নির্মাণ করিতে পারিলে amphitheatre-এর মতো দেখাইবে। সেই প্রস্তাবমতো কার্য করা সম্ভব হয় নাই।

ভুবনডাঙা গ্রামে ৮৭ বিঘার যে বিশাল বাঁধ ভুবনমোহন সিংহ তৈয়ারি করান, তাহাই যথার্থরূপে এতদঞ্চলের জলাধার। অবশ্য সেই পুরাতন জলাধারের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য ১৫ বিঘার জলাধার মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে, অপরাংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। শান্তিনিকেতনের জল-সরবরাহ এখান হইতে হইয়া থাকে।

৬

আমরা পূর্বে বলিয়াছি বালক রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৩ অব্দের প্রথম দিকে, কয়েকদিন মহর্ষির সহিত এখানে বাস করিয়াছিলেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি ইহার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।... সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম— এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমাব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পর এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।'[১]

মহর্ষি বা তাঁহার পুত্র, জামাতারা যখন শান্তিনিকেতনে আসিতেন, তখন স্থানটি জনমুখর ও পরিচ্ছন্ন হইত, অন্য সময়ে শ্রীভ্রষ্ট ও জনশূন্যভাবে পড়িয়া থাকিত। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগমনের দশ বৎসর পর, ১৮৮৩ অব্দের মে মাসে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী (১২৯০ জ্যৈষ্ঠ) লিখিতেছেন, 'প্রকাণ্ড প্রাসাদ মেরামতের অভাবে শ্রীভ্রষ্ট, আসবাবপত্রও যৎসামান্য; উদ্যানের বৃক্ষলতাদি যত্নের অভাবে অধিকাংশ শুষ্ক ও শ্রীহীন এবং আশ্রমপ্রাঙ্গণ শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও আবর্জনাতে পরিপূর্ণ।... আশ্রমে দুই তিন জন মালী মাত্র অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা বলিল, কর্তামহাশয় [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ] বহুদিন এখানে

[১] "আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা", 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৪০। পরে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত।

আসেন নাই। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষতলে বেদিকা দেখাইয়া ভৃত্যেরা বলিল, এইস্থানে কর্তামহাশয় উপাসনা করিতেন। বেদীর নিম্নে কঙ্করবিস্তৃত ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।'

আমাদের আলোচ্য পর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধ ভাগে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের উপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব যেমন ব্যাপক, তেমনই গভীর হইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ, কৃষ্ণনগরের মহারাজা, কোচবিহারের মহারাজা হইতে স্কুল-কলেজের ছাত্র-অধ্যাপক সকলেই তখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হন। তখনো নব্য হিন্দুত্ব শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। ১৮৮৩-৮৪ অব্দে বোলপুর শহরেও কয়েকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন; অঘোরনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। ইনি বীরভূম-নলহাটির লোক, যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইঁহার উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে প্রথম তিনদিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব নিষ্পন্ন হয় (১-৩ নভেম্বর, ১৮৮৩), (১৭-১৯ কার্তিক, ১২৯১ সাল); এই উৎসবে বোলপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মমত বিশ্বাসী যুবক যোগদান করেন। দ্বিতীয়বার বাৎসরিক উৎসব হইল ১৮৮৬ অব্দের এপ্রিল মাসে (১২৯৩ সালের বৈশাখ ১৫-১৬)। এই উৎসবে কলিকাতা হইতে আসিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী।

মহর্ষি ১৮৮৩ অব্দের শেষ দিকে (অগ্রহায়ণ, ১২৯০) শেষবারের মতো শান্তিনিকেতনে আসেন। ইহার পর তিনি বাইশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি বোলপুরের কয়েকজন ভক্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রহ্মোৎসবের সংবাদ যথাসময়ে পাইতেন। এই-সব সংবাদে উৎসাহিত হইয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমেব জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন।

তদনুসারে, ১৮৮৮ অব্দের ৮ মার্চ (২৬ ফাল্গুন, ১২৯৪) মহর্ষি ট্রাস্টডীড করিয়া শান্তিনিকেতনের গৃহ ও বিশ বিঘা জমি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করিলেন, এবং ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে নিজ জমিদারি হইতে আনুমানিক ১৮,৪৫২ টাকার সম্পত্তি দান করিলেন। এখন হইতে শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের সম্পত্তি হইলেও ইহার ট্রাস্টি হইলেন ঠাকুর পরিবারের সংশ্লিষ্ট তিনজন ব্যক্তি— তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা অ্যাটর্নি রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষির সেবক ও সহায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

১৮৮৮ অব্দে যখন এই ট্রাস্টডীড নিষ্পন্ন হয় তখন মন্দির নির্মিত হয় নাই। উপাসনাদি 'শান্তিনিকেতন' গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত। মহর্ষির ট্রাস্টডীডে আছে; 'উক্ত শান্তিনিকেতনে [অট্টালিকা] অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রাস্টিগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার এক-ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোনো সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের মূর্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোমযজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীব-হিংসা বা মাংস-আনয়ন বা আমিষভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনোপ্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজাবন্দনাদি-ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম, উপচিকীর্ষা এবং সর্বজনীন

ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়। কোনোপ্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনোপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না; মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনোরূপ আয় হয়, তবে ট্রাস্টিগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিংবা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতিব জন্য ট্রাস্টিগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতির বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।'

এই ট্রাস্টডীডে শান্তিনিকেতনের তদারক করিবার জন্য একজন আশ্রমধারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এতদ্‌ব্যতীত আশ্রমের ব্যয় নির্বাহার্থে ১৮,৪৫২ টাকা মূল্যের যে সম্পত্তি মহর্ষি দান কবিয়া যান, তাহার পরিচালনার ভার ট্রাস্টিদের হস্তে অর্পিত হয়।

মহর্ষির ট্রাস্টডীডের যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে এই কথাই কি স্পষ্ট হইতেছে না যে শান্তিনিকেতনের বুনিয়াদ রামমোহন রায়েব ধর্মসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত? অর্ধশতাব্দী পূর্বে (১১ মাঘ, ১৮৩০) রামমোহন রায় কলিকাতায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে ট্রাস্টডীড রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ধারায় দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টডীড রচিত হইল। আবার শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টডীড রচনার বত্রিশ বৎসর পবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়া যে বীজমন্ত্র বপন করেন, তাহা তাঁহার পিতৃদেবের উৎসর্গপত্রের পূর্ণতর প্রকাশ মাত্র। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে রামমোহন রায়ের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম দেবেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্মরূপে এবং ববীন্দ্রনাথের মাধ্যমে 'মানুষের ধর্ম'রূপে বিশ্বভারতীর মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে; গঙ্গোত্রীর স্বচ্ছ শীর্ণ গঙ্গা বহু উপনদীর নানা বর্ণের জলধারায় পুষ্ট হইয়া সাগর-সংগমে চলিয়াছে। এই অখণ্ড স্রোত-ধারাকে মানসচক্ষে দেখিতে না পারিলে, ভারতের ধর্মসাধনার সত্যমূর্তি আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে না। গভীব অধ্যাত্মজীবনের প্রতি অবহেলার ফলে ব্যক্তিগত জীবন যেমন হয় নিরর্থক, সমষ্টিগত জীবন-জিজ্ঞাসাও তেমনই থাকিয়া যায় সমস্যাকীর্ণ।

৭

শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীড নিষ্পন্ন হইবার কিছুকাল পরে তথায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইল (১৯ অক্টোবর, ১৮৮৮)। সেদিনকার সভায় বোলপুর, রায়পুর, সুরুল প্রভৃতি গ্রাম হইতে দুই শতাধিক ভদ্রজন উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী সংগীত সকলকে মুগ্ধ করে। কবির বয়স তখন ২৭ বৎসর।

মহর্ষির ট্রাস্টডীড অনুসারে শান্তিনিকেতন গৃহে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ হয়। কলিকাতা হইতে ঠাকুর-পরিবারের লোকে এতকাল সেখানে আসিয়া স্বাভাবিক ভোজ্যাদি গ্রহণ করিতেন; এখন তাহা সম্ভব হইল না। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সীমানার বাহিরে ভুবনডাঙার বাঁধের উত্তরে এক বিঘা জমি খরিদ করিয়া একটি খড়ের ঘর নির্মাণ করেন। এই জমি মহর্ষিদেবের অন্যতম অনুচর কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে বার্ষিক চারি আনা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। ইহা শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীডের অন্তর্ভুক্ত জমি নহে বলিয়া এখানে গৃহস্থভাবে বাসের কোনো অসুবিধা ছিল না। এই স্থানে কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য গৃহাদি নির্মিত হয়। পুরাতন খড়ের বাড়ির একটি প্রাচীরাংশ এখনো আছে। এই স্থানকে 'নিচু-বাংলা' বলা হয়। এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন। সে স্থানটি সত্যই জ্ঞানতপস্বীর আশ্রম ছিল— এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পর শান্তিনিকেতন গৃহের অদূরে নিত্য উপাসনাদির জন্য ব্রহ্মমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকরী রূপ লইল। ১৮৯০ অব্দের ৭ ডিসেম্বর (২ অগ্রহায়ণ, ১২৯৭) মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভিত্তিস্থাপন ও উপাসনা করিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন, রবীন্দ্রনাথ সংগীত গাহিলেন।

বৎসরকাল মধ্যে মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইল। মন্দির বলিতে সাধারণত লোকের মনে যে ধারণা জন্মে— এ মন্দির সেরূপভাবে পরিকল্পিত হয় নাই। ইহা ইষ্টক বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত নয়। লৌহস্তম্ভ ও কাঠামোর মধ্যে নানা বর্ণের কাচ দিয়া প্রাচীর গঠিত; দ্বারগুলিও কাচের। মন্দিরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গন শ্বেত প্রস্তরের ও বহিরঙ্গন ও সিঁড়িগুলি বেলে-পাথরের। মন্দিরের পূর্বদিকে অলিন্দ ও তদুপরি একটি তোরণ। সমস্ত মন্দিরটি লোহার রেলিং দ্বারা বেষ্টিত; চারি দিকে চারিটি লোহার দ্বার। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দ্বারের উপর একটি অর্ধ গোলাকার ফলক— তাহা হইতে মন্দিরের বড়ো একটি ঘণ্টা প্রতিদিন দুইবেলা উপাসনার সময় ধ্বনিত হইত। বুধবার দিন উপাসনার আহ্বান জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘণ্টা বাজাইতেন।

মন্দির নির্মাণ শেষ হইলে তাহা মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিষ্ঠা দিবস ৭ই পৌষ, ১২৯৮ সাল বা ২১ ডিসেম্বর, ১৮৯১। এই সাতই পৌষে দেবেন্দ্রনাথ বাইশ বৎসর বয়সে ১৮৪৩ অব্দে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই ঘটনার ৪৮ বৎসর পরে সর্বপ্রথম ঐদিনটি বিশেষভাবে স্মরণের জন্য নির্দেশিত হইল। এতাবৎকাল এই দিন উৎসবাদির দ্বারা উদ্‌যাপন করিবার কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ আশ্রমের জমি ক্রয়ের তারিখ, ট্রাস্টডীড সম্পাদন, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন প্রভৃতি কোনোটিই তাঁহার দীক্ষা-দিনে অনুষ্ঠিত হয় নাই। যাহা হউক, মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু শত লোকের সমাগম হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া মন্দিরের দ্বার সর্বমানবের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এই প্রতিষ্ঠাপত্র মহর্ষির ট্রাস্টডীডেরই অনুরূপ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাতে উপাসনায় বেদী গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের অতি নিষ্ঠাবান সদস্য চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়; সন্ধ্যায় উপাসনা করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ সংগীতকার্যে যোগদান করিয়া উপাসকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্তি

দান করেন। সেদিন মন্দির ও মন্দির প্রাঙ্গণ বিদ্যুৎ আলোয় আলোকিত হয়; কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ব্যাটারি আনিয়া এই আলোকসজ্জা করা হয়।

এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পর প্রতি বৎসর সাতই পৌষের উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল; গত কয়েক বৎসর মাত্র জনতাবাহুল্য হেতু ঐ দিনের উপাসনা সপ্তপর্ণী বৃক্ষতলে নিষ্পন্ন হইতেছে।

পাঠকের স্মরণ আছে— মহর্ষি সম্পাদিত ট্রাস্টডীডে বার্ষিক মেলা করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত ছিল। তদনুসারে মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বার্ষিক দিনে শান্তিনিকেতনে প্রথম মেলা ও যাত্রা অনুষ্ঠিত হইল ২১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫। তখন মেলা একদিন হইত। যাত্রা হইত দিনমানে। সন্ধ্যার পর বাজি পোড়ানো গ্রামাঞ্চলের লোকের প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল। ১৯৬১ অব্দে পৌষ মেলার স্থান পরিবর্তন করিয়া আশ্রমের পূর্বদিকের মাঠের মধ্যে মেলা বসে। ৬৫ বৎসর পরে এই স্থান পরিবর্তন হয়।

৮

অনেকের ধারণা শান্তিনিকেতনে কেবল পৌষ উৎসবের সময়েই লোক সমাগম হইত; অন্য সময় স্থানটি একেবারে জনহীন থাকিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বালককালে তাঁহার পিতা আশ্রমধারী অঘোরনাথের সহিত আশ্রমে বাস করিতেন— তিনি লিখিয়াছেন যে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা এখানে নিয়মিত হইত। 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই আসতেন স্মরণ হয়।... আর যাঁরা আসতেন বলে জানা গেছে, এবং আমি স্মরণ করতে পারি তাঁদের নাম— হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [রামায়ণের অনুবাদক], রামকুমার বিদ্যারত্ন, ব্রজগোপাল নিয়োগী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ঈশানচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [রামমোহন রায়ের জীবনচরিতকার], নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শশীভূষণ বসু, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, প্রকাশ দেবজি, ভাই সুন্দর সিংজি, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে [দয়ানন্দচরিত প্রণেতা]। প্রায়ই দেখতাম পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ও এখানে কিছুদিন ফিরে ফিরে আসতেন। এ ছাড়া বোলপুরের উপাসকরা তো আসিতেনই। বোলপুর হতে বাঁধগোড়া হাইস্কুলের [তখন স্কুল ঐ গ্রামের মধ্যে ছিল] হেডমাস্টার নবীনচন্দ্র মিত্র প্রায়ই আসিতেন। এই ছিল শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া— আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর।'

এই-সব অতিথিদের সেবার জন্য মহর্ষির ব্যবস্থা ছিল। আহার ও বাসস্থানাদির জন্য কোনো অর্থ দিতে হইত না এবং একদল অতিথি একাদিক্রমে তিনদিন বাস করিতে পারিতেন। তবে ট্রাস্টিদের অনুমতিক্রমে সাধনভজনের জন্য দীর্ঘকাল থাকিবার বাধা ছিল না।

মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে শান্তিনিকেতন বাটিকার নীচের তলায় মাঝের ঘরে নিয়মিত উপাসনা হইত। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে মহর্ষি এই বাড়িটি অতি পরিপাটিভাবে সজ্জিত করিয়া দেন। সকল ঘরে মাদুর বিছানো, সর্বদা পরিষ্কার তকতক করিত। ছয়টি পালঙ্ক ছাড়া মেহগনি কাঠের বৃহদাকার একটি পালঙ্ক ছিল মহর্ষির ব্যবহারের জন্য।

অতিথিদের জন্য তিনটি পালঙ্কে শয্যাদি সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। উপরের বড়ো ঘরে জাজিমপাতা— অনেকগুলি তাকিয়া ও কয়েকখানি গদিআঁটা চেয়ার-কৌচ— নীচের তলায় পূর্বদিকের ঘরে আশ্রমের কার্যালয় ও গ্রন্থালয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এখানে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারের পত্তন করা হয়। সেই গ্রন্থাগারের কিছু-কিছু বই এখনো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থসদনে রক্ষিত আছে। ঐ-সকল গ্রন্থে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম বোলপুর' লেখা গোল ছাপ দেওয়া। মহর্ষির পঠিত গীবন-এর 'রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস', তাঁহার দাগ দেওয়া কয়েকটি গ্রন্থ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আরম্ভ হইতে) এখনো আছে।

শান্তিনিকেতনের দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নীচে ছিল আলো-বাতির ঘর। সেযুগে সেজের বাতি জ্বলিত অর্থাৎ রেড়ির তেলের বাতি— বড়ো বড়ো কাচের সেজের মধ্যে থাকিত। মন্দির নির্মিত হইলে সেখানকার জন্য বিলাতি ঝাড়লণ্ঠন আসে— তাহাতেও সেজের বাতি ব্যবহৃত হইত, পরে মোমবাতির চল হয়; এখন সেখানে বিজলি বাতি। শান্তিনিকেতন বাড়ি উত্তরমুখী। বোলপুর হইতে পাকা রাস্তা শান্তিনিকেতনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছিল।[১] এখন যে পথ শ্রীনিকেতনে গিয়াছে, তাহা ছিল না। সেটি নির্মিত হয় অনেক পরে। শান্তিনিকেতনবাটির উত্তরদিকে বারান্দা— দক্ষিণে সুবৃহৎ গাড়িবারান্দা। বিশ্বভারতীপর্বে গাড়িবারান্দা ঘিরিয়া ঘর করা হয়। পূর্বে এই বারান্দার ছাদ হইতে ঝুলাইয়া উৎসবে ব্যবহারের জন্য শামিয়ানা, শতরঞ্জ প্রভৃতি রাখা হইত। এখন সে-সব বিশ্বভারতী গুদামে সঞ্চিত থাকে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহর্ষি ব্যবস্থা করেন যে সেখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্রহ্মসংগীত গীত হইবে। তজ্জন্য বেতনভোগী লোক নিযুক্ত হন। প্রথমদিকে উত্তর-পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ, পরে তাঁহার পুত্র পরশুরাম মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন। ইঁহারা কখনো কখনো হিন্দি ভাষায় ব্রাহ্মধর্মপ্রচারকল্পে উত্তর ভারতে যাইতেন। ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধে হিন্দিতে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল।

মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যায় গান হইত। এই ব্রহ্মসংগীত গাহিবার রীতি, আমাদের মনে হয়, মহর্ষি পাঞ্জাব সফরকালে অমৃতসরের শিখমন্দিরে গ্রন্থসাহেবের যে অখণ্ড পাঠপ্রথা দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত ও ব্যবহারিক সংস্করণ।

বহু বৎসর এই প্রথা চলিয়াছিল। তার পর মন্দিরের এই প্রথা নিতান্ত প্রাণহীন মন্ত্রপাঠ ও ভাবহীন সংগীতচর্চায় পর্যবসিত হয় এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এই ব্যয়টি প্রথমে সংকুচিত ও পরে বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯৫১ সনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হইল এই-সব স্মৃতির বাহিরে।

মন্দিরের দক্ষিণে অতি মনোহর পুষ্প-উদ্যান ছিল; গোলাপের বহু গাছ অসংখ্য ফুলে ভরা; ১৯০৯ সনে আসিয়াও ইহা দেখিতে পাই। সেই বাগানের মধ্যে একটি ফোয়ারার কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছি একবার মাত্র উহাতে জল খোলা হয়। সে জল আসে বাঁধ হইতে দোনের সাহায্যে। তার পর স্তম্ভের উপর রক্ষিত জলাধারে বা ট্যাঙ্কে পাম্পের

[১] প্রবেশদ্বারের উপরে বৃত্তাকারে ধাতুফলকে খোদিত আছে :—

'একমেবাদ্বিতীয়ম্। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।'

শক্তিতে জল উঠাইয়া ফোয়ারার জন্য জল ছাড়া হইয়াছিল। পরে ফোয়ারার চারি পাশের চৌবাচ্চা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বিশ্বভারতী পর্বে রথীন্দ্রনাথ একবার বহু টাকা ব্যয় করিয়া ফোয়ারার সংস্কার করেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। পুনরায় গর্ত ভরাইয়া ফেলা হইল। এখন স্বল্পউচ্চ প্রাচীর চারি দিকে আছে মাত্র; অনেক সময় মন্দিরে স্থান সংকুলান না হইলে লোকে এই প্রাচীরের উপর বসিয়া মন্দিরের ভাষণ শুনিবার চেষ্টা করে।

মন্দির প্রাঙ্গণে কতকগুলি খর্বাকৃতি স্তম্ভ দেখিয়াছিলাম; সেগুলির গাত্রে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ও ব্রহ্মসংগীত হইতে সুন্দর সুন্দর বচন বা মন্ত্র উৎকীর্ণ ছিল। স্তম্ভের উপর থাকিত সুদৃশ্য মৃৎপাত্র বা চীনামাটির পাত্রে ফুলের চারা। সে-সবের কোনো চিহ্ন এখন নাই, মন্দিরের সম্মুখেও কোনো বাগান নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি মন্দিরের পূর্বদিকে একটি তোরণ ছিল; উহার শিখরদেশে পিতলের ফলকে-কাটা 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্র বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে পড়িত।

এই খোদিত মন্ত্র সম্বন্ধে মহর্ষি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সহচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন, 'শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই লৌহ নির্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঁকার আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে 'একং ব্রহ্মাস্তীতি'।'

এই তোরণটি এখন নাই। ১৯১৫ সনে বাংলাদেশের প্রথম গভর্নর লর্ড কাবমাইকেল শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিতে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মন্দিরে যে-সব পরিবর্তন সংঘটিত হয় তোরণ অপসারণ তাহার অন্যতম। তোরণটি ভাঙা হয় উহা খৃস্টানি ঢঙের চূড়া এই অজুহাতে। তার পর মন্দির প্রবেশপথে দুই পার্শ্বে যে দুইটি কুঠরি ছিল তাহা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টির সময়ে লোকে জুতা, ছাতা এই ঘর দুইটিতে নিরাপদে রক্ষা করিতে পাবিত। মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে চোখে পড়িত দুইটি ইষ্টক নির্মিত তোরণ, তাহাতে ব্রহ্মালোক শীর্ষক মুলকথা খোদিত। সেগুলি গ্রীক-কোরিন্থিয়ান স্থাপত্য-গন্ধী বলিয়া ভাঙিয়া ফেলা হয় এবং ফলক দুইটি প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। এখন আমরা সেইভাবেই দেখিতে পাই।

মন্দিরের পূর্বদিকে একটি তালবৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া একটি কুটির দেখিতে পাই; ইহা বিশ্বভারতী পর্বে তেজেশচন্দ্র সেন নামে জনৈক শিক্ষক-কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল; মন্দিরের এত কাছে এভাবে গৃহনির্মাণ করার ঔচিত্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন সেদিন কাহারো মনে হয় নাই। কারণ, কুটিরটি একটি সুন্দর সৃষ্টি; আর্টসর্বস্ব মনোভাবের সমর্থনে উহা নির্মিত হয়। ১৯৬২ সনে এই কুটিরটি পল্লীশিল্পকেন্দ্রের অফিস হইয়াছে।

পুরাতন পুস্তকাদিতে সপ্তপর্ণীমূলে যে বেদিকার চিত্র দেখা যায়, এখন সে বেদিকা নাই। এই বেদিকা কখন নির্মিত বা কাহার নির্দেশে রচিত সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আদি বেদী ছিল ইষ্টক নির্মিত একটি চতুষ্কোণ আসন— উপরে মর্মর প্রস্তর বসানো। পরে কোনো সময়ে বিলাতি টালি দিয়া একটি চত্বর বেদীর চারি পার্শ্বে নির্মিত হয়। বেদীর পিছনে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীর গাত্রে খোদিত ছিল— 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' সপ্তপর্ণী বৃক্ষের একটি স্থূল শাখায় আর-একটি বাণী দেখা যাইত— 'করো তাঁর নাম গান'; একটি পিতলের পাত কাটিয়া অক্ষরগুলি বৃক্ষ-ত্বকে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। বেদীর সম্মুখে অদূরেই ছিল দুইটি শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভের উপর অর্ধ-গোলাকার

মর্মরে খোদিত 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' বাণী। বেদীতে বা বেদীমূলে উপাসনাকালে এই 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' বীজ-মন্ত্রটি ধ্যানের বস্তু হইত। ১৯১৫ সনে লর্ড কারমাইকেল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য আম্রকুঞ্জে একটি অর্ধবৃত্তাকার আসন নির্মিত হয়; সেই আসনের পিছনে ছাতিমতলার 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' তোরণটি আনিয়া স্থাপন করা হয়। আশ্রমের মূলমন্ত্রটি সম্মানার্হ অতিথির সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্যই হয়তো এইটি করা হইয়াছিল। তার পর কখন কীভাবে সেই তোরণটি ভাঙিয়া পড়িল তাহার সংবাদ কেহ রাখিল না। কবির মৃত্যুর পর ১৯৪২ অব্দে চীন সরকারের সর্বময় কর্তা চিয়াং কাই-শেক ও তদীয় পত্নী শান্তিনিকেতনে আসেন; তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ্বভারতীর হস্তে সমর্পণ করেন। সেই অর্থ দিয়া সপ্তপর্ণীর বেদী সংস্কার করা হয় এবং এখন যে চত্বর দেখা যায়, তাহা নির্মিত হয়। সেই নির্মাণকার্যকালে বেদীর পশ্চাতে যে মর্মর ফলকে 'তিনি আমার প্রাণের আরাম' ইত্যাদি বাণী খোদিত ছিল, সেটিকে কোথাও আর্ট-সম্মতভাবে রক্ষা করিবার স্থান আবিষ্কৃত করিতে না পারায় সেটিকে সরাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ইন্দিরা দেবী বহু সন্ধান করিয়া গুদাম ঘরে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্য হইতে সেইটি উদ্ধার করিয়া আনান ও সপ্তপর্ণী বেদীমূলে প্রবেশপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করান। বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পার্লামেন্টারি সংবিধান রচনাকালে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' মন্ত্র বাদ পড়ার বহু পূর্বে এই মন্ত্রের বিসর্জন হইয়াছিল।

সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূলের বেদীর সহিত মহর্ষির কোনো সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া মন্তব্য শোনা যায়। তবে মূলবেদীটি যে খুব অর্বাচীন নহে, তাহার প্রমাণ আছে। মহর্ষির মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হন। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও প্রিয়শিষ্য প্রিয়নাথকে বলিয়াছিলেন— 'আহা এই সময়ে যদি আমি ছাতিমতলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, তবে আমার বড়োই আনন্দ হইত।' মহর্ষি ১৮৮৩ অব্দে আশ্রমে শেষবারের মতন আসেন। তৎপূর্বেই কি ছাতিমতলায় কোনো বেদী নির্মিত হইয়াছিল অথবা বর্ণনা শুনিয়া ও চিত্রাদি দেখিয়া মনের মধ্যে একটি বেদী রচনা করিয়া লইয়াছিলেন— তাহা আমরা বলিতে পারি না।

১৯০৫ সনে জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় মহর্ষির মৃত্যু হইলে ঠাকুর-পরিবারের বৈষয়িক বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইল। মহর্ষির সঙ্গে থাকিতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ও দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং সৌদামিনী দেবী। মহর্ষির মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বৎসরকাল রায়পুরে আসিয়া বাস করেন। শান্তিনিকেতনের দক্ষিণদিকে যে 'নিচু-বাংলা'র কথা বলিয়াছি— সেইটি দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্য বাসোপযোগী করা হইলে, ১৯০৬ সনে তিনি তথায় আসেন। বিশ বৎসর এখানে তিনি বাস করেন; ১৯২৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আশ্রমের অপরদিকে 'শান্তিনিকেতন' বাটিতে আসিয়া উঠিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথেব পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ। ইনি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের অন্যতম ট্রাস্টি বলিয়াই বোধ হয় এখানে বাস করিতে আসিলেন— পাবলিক ও পারিবারিক স্বার্থের রেখা অবলুপ্ত হইল। প্রায় পনেরো বৎসর দ্বিপেন্দ্রনাথ এই গৃহে বাস করেন।

৯

মহর্ষি সম্পাদিত ট্রাস্টডীডে আছে— 'এই ট্রাস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাস্টিগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতি বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।'

ট্রাস্টের এই অনুমোদন থাকায় ১৩০৪ সালে মহর্ষির পৌত্র বলেন্দ্রনাথ (বীরেন্দ্রনাথের পুত্র) শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গৃহনির্মাণ আরম্ভ করান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। বলেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদী আর্যসমাজীদের সহিত ধর্মবিষয়ে একত্রে কাজ করিবার আশায় একদা পাঞ্জাব গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বেদসর্বস্ব মনোভাব ও মতবাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যুক্তি ও ভক্তি -মিশ্রিত ব্রহ্মবাদের মিলন সম্ভব নয় বুঝিয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন সংকল্প গ্রহণ করেন। বলেন্দ্রনাথ নির্মিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গৃহটি এখন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারভুক্ত। আমরা নিম্নে বলেন্দ্রনাথ-কৃত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপনা করা হইবে।

২। বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

৩। আপাতত দশজন ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪। আহার্যের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০ টাকা দিলে আর ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাওয়া যাইতে পারিবে।

৫। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টিগণ ব্যতীত আরো চারিজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাস্টিগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬। অধ্যক্ষসমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টিগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষসভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন, ছাত্রনির্বাচন, পুস্তক এবং শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে (ক্লাস ৮) 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম'[১] এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত 'ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান' অধ্যাপন হইবে।

---

[১]দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ ১৩০৫ (মে ১৮৯৮)।

৯। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এন্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণসহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।...

১২। সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয় ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকেও যোগ দিবেন।

১৩। ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন ছাত্রগণ অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটি যাইতে পাবিবে।

১৪। অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন। বলেন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গৃহ নির্মাণকার্য আবস্ত হয়, নিয়মাবলী প্রণীত হয়। কিন্তু বিদ্যালয় রূপপরিগ্রহের পূর্বেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন (ভাদ্র ১৩০৬)।

ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ বৎসর (১৩০৬ সালে) ৭ই পৌষ, মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিনেব উৎসবের মধ্যে। ১৮২১ শকাব্দের (১৩০৬ সালের) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাঘ সংখ্যায় এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ আছে, তাহাব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'. এবারে উদ্যান ভূমিতে ইষ্টক নির্মিত সুপ্রশস্ত একটি গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। তাহার সোপানে পূর্ণকুম্ভ। নানাবিধ পত্রপুষ্পে তাহার শ্রীসৌন্দর্য আরো বর্ধিত হইয়াছে। ঐদিন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারেব জন্য গৃহ প্রতিষ্ঠা হইবে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্তবাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এইরূপ কহিলেন:— '... ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রমুক্ত করিয়া দিলাম।.. এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হউক'।'

১০

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ভারতের সর্বত্রই শিক্ষিতদের মনে ইংরেজি তথা পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন ও দ্বিধা জাগে। ইংরেজ শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরুদ্ধভাবের জন্ম হইতে অতীত ভারতের প্রতি একটা অতিরিক্ত মুগ্ধভাবেরও উদয় হয়। এই কথাই সেদিন ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই উদ্‌বেলিত করিয়াছিল যে, শতবৎসর ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন আলোচনা করিয়া সে না লভিয়াছে ইংরেজের সমকক্ষতা, না পাইয়াছে ইংরেজের শক্তি। তাহারা দেখে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা ধ্বংসপ্রাপ্ত, আধুনিককালের শিল্পকলা অজ্ঞাত, জাতীয় জীবনের মান অত্যন্ত হীন। অথচ অপরদিকে ভারতের কৌলিক ও মৌলিক সমাজ প্রতিষ্ঠান, তাহার অর্থনৈতিক মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; চারি দিকে অসন্তোষ ও ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। য়ুরোপে শিক্ষাপদ্ধতি ও ব্যবস্থা তদ্দেশীয় সমাজজীবনেরই অঙ্গ; আর আমাদেব দেশের শিক্ষা উপাঙ্গের ন্যায়

ভারমাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের সমাজজীবনে শ্রেণী-সংঘাত আনিয়াছে। ভারতের নিজস্ব যে শিক্ষাবিধি ছিল, তাহার মধ্যে মাত্রাগতভেদ (quantitative) ছিল— কেহ কম জানিত কেহ বেশি জানিত, কেহ-বা আদৌ জানিত না। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে তাহা গুণগতভেদ (qualitative)— কেহ একরূপ জানে, কেহ অন্যরূপ জানে। জাতিভেদের ন্যায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ দুস্তর। হিন্দুভারত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুরাপুরি পায় নাই (এবং পাওয়া সম্ভবও নয় কল্যাণকরও নয়); আবার ভারতের মৌলিক সাধনার সহিতও সে বিচ্ছিন্ন— আপনার আত্মাকেও সে হারাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে, তাঁহারাই জানেন যে তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় দেশীয় ভাষার ব্যবহার-বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সে লিখিত (১৮৮৩) প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।'

নয় বৎসর পর রাজশাহীতে স্থানীয় অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে লিখিত "শিক্ষার হেরফের" ভাষণে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার সুপারিশ ছিল। এই প্রবন্ধই কবির সর্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক সমালোচনা (১৮৯২)। তিনি লিখিয়াছিলেন, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর-কোনো গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। ('সাধনা', চৈত্র, ১২৯৯)।

শিক্ষার সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনা যে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এই ভাবনা যুবক রবীন্দ্রনাথকে সেদিন উত্তেজিত করিয়াছিল; কিন্তু তখনো ভাবনা মূর্ত হইবার অনুকূল পবিবেশ পায় নাই।

১১

কলিকাতাব দেশীয় ও বিদেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ও কৈশোরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাঁহার নিজ সন্তানদের কখনো বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই। শিক্ষা-সম্বন্ধে নিজ আদর্শে শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য কলিকাতার নৈতিক আবহাওয়া হইতে সন্তানদের দূরে মানুষ করা। আশ্রমের নির্জন পরিবেশে শিক্ষাদানের কথা তখনো কবির মনে স্পষ্ট হয় নাই— তখন তাহা নিজ সন্তানদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের মধ্যে সীমিত ছিল।

শিলাইদহে কবির পাঁচটি সন্তানের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হন শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় ও লরেন্স নামে এক সাহেব। স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাদান ও

গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে গিয়া শিক্ষাবিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইল প্রথম এখানে।

কিন্তু একদিন তাঁহার গৃহবিদ্যালয়কে শিলাইদহের গৃহকোণের সীমানা হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে আনিতে হইল। যে-সব সাংসারিক কারণে তাঁহাকে শিলাইদহের বসবাস উঠাইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনীর অন্তর্গত বিষয়— কন্যাদের বিবাহ, রথীন্দ্রনাথের এন্ট্রান্স পরীক্ষা ও শিলাইদহের নির্জনবাসে স্ত্রীর অনিচ্ছা। তাই স্থির করিলেন শান্তিনিকেতনে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিবেন।

কবির মনে এই কল্পনা আসে ১৯০১ সনের মাঝামাঝি সময়ে। অগস্ট মাসে কবি তাঁহার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখেন, 'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না— ধনী-দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনোমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। ছোটোবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে নষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকলপ্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।' ('চিঠিপত্র' ৬)।

সেপ্টেম্বর মাসে (১৯০১) কবি সপরিবারে বোলপুরে আসিয়া 'শান্তিনিকেতনে' বাস করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'জায়গাটি বড়ো রমণীয়। আলোকে, আকাশে, বাতাসে, আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানে নিভৃতে, নির্জনে, ধ্যান ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি, এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষমাস হইতে খোলা হইবে। গুটিদশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।' ('চিঠিপত্র' ৬)।

কবির আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য আসিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তাঁহার সিন্ধি বন্ধু রেবাচাঁদ। সিমলা স্ট্রিটে রেবাচাঁদের একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালার চার-পাঁচটি ছেলে হইল আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথও থাকিলেন তাহাদের সঙ্গে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১)। ইনি ধর্মপ্রাণ খৃস্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। যৌবনে ইনি কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও সেই ধর্মমত প্রচারের জন্য সিন্ধুদেশের (পশ্চিম পাকিস্তান) করাচিতে যান। সেখানে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের সংস্পর্শে আসিয়া খৃস্টধর্মমত গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' পুস্তকে লিখিতেছেন, 'এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন।... কোনোকালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় (১৩৪০) লিখিতেছেন, 'এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর

সম্পাদিত *Twentieth Century* পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।' এই শিষ্য হইতেছেন রেবাচাঁদ। পরে ইনি কলিকাতার বয়েজ ওন হোম নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অণিমানন্দ নামে পরিচিত হন (মৃত্যু, ১৯৪৫)।

১২

১৯০১ অব্দের ২২ ডিসেম্বর, ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরের সাংবৎসরিক উপাসনাদির শেষে পুর্বোল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যালয় গৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত নব-বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল।

১৮২৩ শকাব্দের (১৩০৮ সালের) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মাঘ সংখ্যায় এই দিনের যে বিবরণ আছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃতি করিতেছি :

'...আমরা জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে।... দেখিলাম সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে নিম্নোক্তপ্রকারে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন। 'ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতুমাম্। অবতুবক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ব্রহ্মাকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

'পরে ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দিলেন— হে সৌম্য মানবকগণ অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্ব পুরুষ।... তোমাদের কষ্ট স্বীকার করে, কঠিন নিয়মে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে।... প্রত্যহ অন্তত একবার-[ব্রহ্মাকে] চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে।.. সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো: 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহিধিয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।' ইহার পরে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।'

বর্ণাশ্রম ধর্মের জয়গান, অতীত ভারতের প্রশংসা ছিল বিংশ শতকের গোড়ায় সকল লেখকেরই বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ সকলেই নানা দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিয়া দেশমাতৃকার স্তব

করিতেছেন। বলা বাহুল্য কালান্তরে রবীন্দ্রনাথের এই মুগ্ধভাব অনেকটা শমিত হইয়া যায়।

১৩

ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতনে আসিলেন। তখন বর্তমান লাইব্রেরি গৃহের নীচের তলায় তিনখানি ঘর ও বারান্দা ছিল 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র একমাত্র ইমারত— ছাত্র, শিক্ষক ঐ তিনখানি ঘরেই থাকেন।

ব্রহ্মবান্ধবের ব্যবস্থায় ছাত্রদের সরল কঠোর জীবনযাপন আবশ্যিক; জুতা-ছাতার ব্যবহার নিষিদ্ধ— নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক। আহার-স্থানে বর্ণভেদ বা জাতিবিচার মানাই ছিল রীতি। প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। রন্ধন ও কূপ হইতে জল উত্তোলন ব্যতীত প্রায় সকল শ্রম-সাপেক্ষ কর্ম ছাত্রদের করিতে হইত। প্রাতঃস্নানের জন্য ছাত্র-শিক্ষকরা নিকটস্থ ভুবনডাঙার বাঁধে যাইতেন। স্নানান্তে উপাসনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মধ্যস্থ গৃহে সমবেত হইয়া ছাত্ররা বেদমন্ত্র গাহিত। অতঃপর অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া বৃক্ষতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত।

রবীন্দ্রনাথের মনে তপোবনের যে আকাশ-কুসুম রচিত হইতেছে, তাহার একটি কাব্যময় প্রকাশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল: 'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশে জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য অশন-বসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোবনরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে বলে পৃথিবীর বাহিরে কাশী তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরেজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত, আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি। সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক।'

কবি এই পত্রমধ্যে বলিতেছেন 'যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধ যুগে নালন্দা অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শ মাত্রই 'মিলেনিয়াম'-এর দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে। আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা।'

রবীন্দ্রনাথের এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের বলে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম একদিন বিশ্বভারতীর

জয়যাত্রা-পথে চলিয়াছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবসানে বিশ্বভারতীর উদ্ভব হয় নাই— কবির ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপেই তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় অধ্যাপক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব ও জগদানন্দ রায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিলে অধ্যাপনায় সাহায্য করিতেন। ইংরেজি, বাংলা, গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্তই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[১]

১৪

বিদ্যালয় স্থাপনের পাঁচমাস পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রথম সমস্যা দেখা দিল। ১৯০২ সালের জুন মাসে গ্রীষ্মাবকাশের পর ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ, শিবধন আর কাজে যোগদান করিলেন না। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কবি ও কর্মী বুঝিলেন যে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা কী কঠিন। নূতন বিদ্যালয়ে আদর্শের অস্পষ্টতা ও কর্মপ্রণালীর অনির্দিষ্টতা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; ফলে ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছিল।

উপাধ্যায়ের চরিত্রের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক প্রভুত্বশক্তি ছিল, যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোমল কবি-প্রকৃতির পক্ষে দীর্ঘকাল বহন করা কঠিন; বুদ্ধিমান উপাধ্যায় তাহা বুঝিতে পারেন।

উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ চলিয়া গেলে কবিকে বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রথম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯০২ সনে গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে, আসিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক তরুণ গ্র্যাজুয়েট; তিনি হইলেন 'হেডমাস্টার'। গত ছয় মাস আশ্রম-বিদ্যালয়ে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিল না; ছাত্ররা কোনো বেতন দিত না। ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যয় কবিকেই বহন করিতে হইত। আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনকালে রবীন্দ্রনাথ কবিসুলভ আদর্শবাদ হইতে কল্পনা করিয়াছিলেন যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গুরুগৃহ স্থাপিত হইলে দেশের ধনী হিন্দুরা অর্থ দিয়া সহায়তা করিবেন। কবি উল্লেখযোগ্য সাহায্য একমাত্র পাইয়াছিলেন ত্রিপুরা স্টেট হইতে; বিদ্যালয় স্থাপনের আরম্ভ হইতে কবির মহাপ্রয়াণের পর পর্যন্ত ঐ স্টেট বার্ষিক সহস্র মুদ্রা করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

কবির আদর্শবাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে বলিয়াছেন: 'ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না; তাদের যা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটি কথা ভেবেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে,

---

[১] ১৯০২ সনের, ১৪ এপ্রিল (১৩০৯ সালের বাংলা নববর্ষের দিন রবীন্দ্রনাথ 'নববর্ষের চিন্তা' শীর্ষক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এই ভাষণই 'বঙ্গদর্শন' (বৈশাখ, ১৩০৯) "নববর্ষ" নামে প্রকাশিত হয়। তৎপরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮২৪ শকাব্দে) আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় বাহির হয়। দ্র. "ভারতবর্ষ"। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪'। পরে গদ্যাবলীর অন্তর্গত 'ধর্ম' গ্রন্থ সম্পাদনকাল সংক্ষেপে "নববর্ষ" লিখিয়া দেন।

আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্যপ্রবাহিত দান-দক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ; এদের স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমার ক্ষীণশক্তির উপর নির্ভর ক'রে। গুরু-শিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়— এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে— এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম -ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা।'

১৯০২ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে ছাত্রদের বেতন ১৫ (পনেরো) টাকা ধার্য হইল। বলা বাহুল্য ছাত্রপ্রদত্ত বেতন হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় সংকুলান হইতে পারে না। সমস্ত ঘাটতি কবিকে পূরণ করিতে হইত। এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য কবিকে খুবই বিব্রত হইতে হয়; কারণ কুষ্ঠিয়ার ব্যাবসা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, উহার সমস্ত লোকসানের চাপ তাঁহার একার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। শোনা যায়, এই বিবিধ চাহিদা মিটাইতে গিয়া তাঁহার পত্নী মৃণালিনী দেবীর অলংকারাদিও বিক্রীত হয়।

১৫

১৯০২-এর গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে আসিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; ইতিপূর্বে ছিলেন জগদানন্দ রায় ও লরেন্স।

আদিযুগের এই শিক্ষকদের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। জগদানন্দ ও লরেন্স শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। লরেন্স ইংরেজ কিন্তু তাহার পূর্বাপর ইতিহাস জানা যায় না। কবি লিখিয়াছেন, 'এক পাগ্‌লা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা ছিল খুব ভালো; আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি।' ("আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা")।

জগদানন্দ রায় নদীয়ার কৃষ্ণনগরের লোক; তাঁহার সঙ্গে কবির পরিচয় হয় 'সাধনা' পত্রিকার মাধ্যমে— এই মাসিকের অন্যতম লেখক হিসাবে। কবি লিখিতেছেন 'এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্য প্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল।

আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম।'

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'হেডমাস্টার'-রূপে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তিনি গ্র্যাজুয়েট। রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রস্তুত করার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়। একবৎসর মাত্র তিনি এখানে ছিলেন। আশ্রম ত্যাগের পর কবির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই। কবি তাঁহাকে যে-সব পত্র লেখেন, সেগুলি মনোরঞ্জনবাবু কবির মৃত্যুর পর 'স্মৃতি' নামে মুদ্রিত করেন। শেষদিকে তিনি সম্বলপুরে ওকালতি করিতেন।

১৯০২-এর জুলাই মাসে নূতন শিক্ষক আসিলেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া-যশাইকাটিতে তাঁর গৃহ। ঠাকুরবাড়ির পুরাতন খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহার মাতুল। মাতুলের সুপারিশে বি.এ. পর্যন্ত পড়ার পর হরিচরণ ঠাকুর এস্টেটের সেরেস্তার একটি চাকুরি পান। হরিচরণ অবসর সময়ে বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন— এই সংবাদ কবি পাইয়াছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর শিবধন বিদ্যার্ণব আশ্রমের শিক্ষকতা কার্যে যোগদান না করায়, কবি হরিচরণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। কবির বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা প্রত্যেক সংস্কৃতিবান হিন্দুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কৃতকে সহজ শিক্ষণীয় করিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে 'সংস্কৃত শিক্ষা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহায়তায়। হরিচরণ শান্তিনিকেতনে আসিলে তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষার এক পাণ্ডুলিপি দিয়া বলেন 'এইটা দেখে পড়াও আর এই পদ্ধতি অনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আরম্ভ করো।' সেই পাণ্ডুলিপির ধারা দেখিয়া হরিচরণ তিন খণ্ড 'সংস্কৃত প্রবেশ' লিখিলেন। এই সময়ে কবি একদিন তাঁহাকে বাংলার শব্দকোষ সংকলনের কথাও বলেন। কবির আদেশে ও প্রবর্তনায় হরিচরণ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (১৩১২)।

আরো দুইজন শিক্ষক এইবার আসেন— সুবোধচন্দ্র মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— উভয়েই গ্র্যাজুয়েট। সুবোধচন্দ্র ছিলেন কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্রের জ্ঞাতিভ্রাতা; বাংলাসাহিত্যে 'পঞ্চপ্রদীপ' নামে গল্পগুচ্ছ লিখিয়া এককালে যশস্বী হন। ইনি পরে রাজস্থানের জয়পুর রাজ্য-সরকারের কাজ লইয়া যান ও সেইখানে শেষ জীবন পর্যন্ত বাস করেন। ইঁহার নিকট কবির স্বহস্তলিখিত কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ছিল। সেগুলি তাঁহার পুত্র সমীরচন্দ্র শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে অর্পণ করিয়াছেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চন্দননগরের লোক। আকৃতি-প্রকৃতিতে তিনি কবি ছিলেন। টেনিসনের "এনোক আর্ডেন" ও "প্রিন্সেস"-এর বাংলায়-অনুবাদকরূপে তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "এনোক আর্ডেন" সম্পূর্ণ দেখিয়া শুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই কয়জন শিক্ষক লইয়া পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল গ্রীষ্মাবকাশের পর অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপনের ছয় মাস পরে।

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে থাকেন 'শান্তিনিকেতন' গৃহে; ট্রাস্টের নিয়মানুসারে সেখানে সপরিবারে থাকা সম্ভব নয় বুঝিয়া আশ্রমের পূর্বদিকে রাস্তার ধারে বিঘা-সাত জমি নিজখাতে বন্দোবস্ত লইয়া 'নূতনবাড়ি' আরম্ভ করিলেন। এই সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়-গৃহের পূর্বদিকে একটি টালির ছাদের লম্বা ঘর নির্মিত হয়। ইহার দেওয়াল মাটির, মেঝে ইঁটের খাদরি করা। সেই গৃহ এখন 'প্রাক্‌কুটির' নামে পরিচিত— আসলে ইহাই আদি কুটির।

১৬

১৩০৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় নূতনভাবে চালু করিবার অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে সাংসারিক কারণে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন হইতে দূরে থাকিতে হয়। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। আশ্রমের বালকদের প্রতিদিনের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা তিনি করিতেন। নিজে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে তিনি ভালোবাসিতেন। কিন্তু কবির ভাগ্যলিখন অন্যরূপ। মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া কবিকে কলিকাতায় যাইতে হয়। সেখানে ১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ তাঁহার মৃত্যু হয়। এর দশমাসের মধ্যে মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু ঘটে (আশ্বিন ১৩১০)। কবিকে পূর্ণ এক বৎসরের অধিকাংশ সময় বাহিরে-বাহিরে কাটাইতে হয় (১৯০২ সেপ্টেম্বর-১৯০৩ অক্টোবর), তখন বিদ্যালয়ের ভার স্বভাবতই শিক্ষকদের উপর গিয়া পড়ে। দূর হইতে কবি পত্র মারফত পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিতেন; তবে নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ না থাকায়, নানা আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা দিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় স্ত্রীর কঠিন পীড়া লইয়া খুবই ব্যস্ত; কিন্তু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভাবনা হইতে মুক্তি পাইতেছেন না। ১৯০২ সনের ১০ নভেম্বর (১৩০৯ সালের ২৭ কার্তিক) কবি কুঞ্জলাল ঘোষ নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক ভদ্রলোককে আশ্রমের কার্যে বহাল করিয়া তাঁহার মারফত বিদ্যালয়ের কার্য কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত পত্র শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক-ব্যবস্থার জন্য প্রথম অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হয়। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার হইলেন প্রথম সদস্যত্রয়। সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন। এই সমিতির নির্দেশমতো কার্য সম্পাদন করিবেন কুঞ্জলাল ঘোষ। এই নিয়মাবলীর ভূমিকা ও উপসংহার অংশে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন শিক্ষা সম্বন্ধে মনোভাবের ও মতামতের সন্ধান স্পষ্টত পাই। তাঁহার মতে 'বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্ব লাভ— স্বার্থ নহে, পরমার্থ।... ইহাই ব্রহ্মচর্য ব্রত; এ কেবল পড়া মুখস্থ করা ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নহে। ইহা ধর্মব্রত।' ১৯০২ সনে ভারতের শিক্ষাসংস্থায় এই শ্রেণীর ভাবনা অপরিচিত।

কবি লিখিতেছেন 'ছাত্রদিগের সহিত... পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।... শিক্ষক পাওয়া যায়, কিন্তু গুরু পাওয়া যায় না।' তিনি আর-একটি বিষয়ের প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন : 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধাবান করিতে চাই।' তিনি এমন-কি, বলিলেন, 'বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।' রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব সমসাময়িক 'নৈবেদ্যে'র কয়েকটি কবিতায় ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে বিঘোষিত হইতে শোনা যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সমসাময়িক রচনা ও রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এই মতেরই পোষক।

এই দীর্ঘ পত্র ও নিয়মাবলী খসড়া করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন— 'এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন, ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্য আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার— তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম— এ যদি না হয়, তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।'

পরিশেষে তিনি বলিলেন, 'আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্তসমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনাসহকারে তাহা দুর্লভধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।'

হিন্দি চলতি প্রবাদ আছে— 'গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।' উপদেশ মতে জীবনযাপন দুরপনেয় সমস্যা। সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হইল। কুঞ্জলাল ঘোষ মহোৎসাহে তাঁহার কর্তব্য পালনে মন দিলেন। কিন্তু অচিরেই এই মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের মধ্যেই শক্তির খেলা শুরু হইয়া গেল। কবি কন্যার পীড়ার জন্য উদ্‌বিগ্ন— রাজনীতির ঝঞ্ঝাও তাঁহাকে কলিকাতায় আকর্ষণ করে। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক-রূপেও কর্তব্যপালনে তাঁহার ত্রুটি নাই। এই-সকল অনিবার্য কারণে কবির বিদ্যালয়ে থাকা দীর্ঘকাল সম্ভব হইতেছে না। কুঞ্জলাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম— জাতিতে কায়স্থ। তাঁহাকে লইয়াই শিক্ষকদের সমস্যা। আশ্রমের বিধি অনুসারে উপাসনান্তে ছাত্রেরা শিক্ষকদের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করে। ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা কায়স্থ শিক্ষকের পদধূলি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে— তাহাই হইল সমস্যা। এই বিষয়ে মনোরঞ্জনবাবু কবিকে কলিকাতায় পত্র লিখিলে, কবি উত্তরে লেখেন (১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯), 'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজবিরোধী, তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে— এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্বাপেক্ষা ভালো হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন, তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না।' এই আপোষ মনোভাবের পরেও তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে— 'ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?' ('স্মৃতি')।

রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে সমস্ত সংবাদ পান— কখনো অর্ধসত্য সংবাদ অতিরঞ্জিত আকারে, কখনো সত্য সংবাদ বিকৃতভাবে তাঁহার কাছে পৌঁছায়। এ ঘটনার অবসান কোনোদিনই হয় নাই। ভাবুকতার অবসানে কবিকে বারে বারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও দেখা গিয়াছে। অধ্যক্ষ সমিতি স্থাপনের দুই মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মের ভার অর্পণ করিলেন তাঁহার মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপর। কবি মনোরঞ্জনবাবুকে

লিখিতেছেন (৮ মাঘ, ১৩০৯)— 'আমি মাঘের শেষ সপ্তাহে বাহির হইয়া পড়িব— ফিরিতে দুই-তিন মাস লাগিবে। ইতিমধ্যে সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য আমি নিয়ম দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সত্যেন্দ্রের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার দিয়াছি; যাহাতে নিয়ম কোনো মতেই শিথিল হইয়া না পড়ে, আমি বার বার তাহাকে সে উপদেশ দিয়া দিয়াছি। কঠিন নিয়মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি আমাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা সংগত বোধ করি। এখন হইতে, নিয়ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আপনারা সকলেই অনুগ্রহ করিয়া সতর্ক থাকিবেন।' ('স্মৃতি')।

স্বাধীনতার দায় বহন করা বড়ো কঠিন। তাই ডেমোক্রেসি ব্যর্থ হইলে এককর্তৃত্বের অভ্যুদয় স্বভাবের ধর্ম— রাষ্ট্রনীতির প্রতিদিনের ঘটনা। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ইতিহাসে ও পরবর্তী যুগে বিশ্বভারতী-পর্বে এই বহুজনকর্তৃত্ব ও এককর্তৃত্বের ঘূর্ণিপাক বারে বারে আসিয়াছে, গিয়াছে।

বিদ্যালয় মাত্র এক বৎসর হইয়াছে; ইহাব মধ্যেই কবিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কয়েকবারই পরিবর্তন করিতে হইল। এইবার যে পরিবর্তন করিলেন— তাহাও ব্যর্থ হইল; কারণ সত্যেন্দ্রনাথের পরিচালনা শক্তি ছিল না; তিনি আমোদপ্রিয়, অমায়িক ভদ্রলোক। হাতের কছে জানাশুনা লোক কাহাকেও না পাইয়া কবি নিজ জামাতার উপর এই ভার দিয়াছিলেন।

১৭

আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাত অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়েও আদর্শ ও বাস্তবের সমস্যা কঠিন রূপেই দেখা দিল। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে আজ জগদানন্দ রায়ের রেমিটেন্ট জ্বর, কাল সুবোধচন্দ্রের কন্যার পীড়া ইত্যাদি নানা বাধায় বিদ্যালয়ের কাজ প্রতিদিন হইতেছে। রথীন্দ্রনাথের এন্ট্রান্স তরণী (১৯০৩ সন) পরীক্ষা-পারে ভিড়াইবার জন্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ১৯০২ সনের গোড়া হইতে ১৯০৩-এর পূজাবকাশের পূর্ব পর্যন্ত মনোরঞ্জনবাবু শান্তিনিকেতনের সহিত যুক্ত ছিলেন মনে হয়। তার পর তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যান এবং কবিকে লেখেন যে তাঁহারই অন্যায় ও দুর্বলতা তাঁহার (মনোরঞ্জনের) কর্মপরিত্যাগের কারণ।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা নূতন নহে, একাধিকবার ঘটিয়াছে। কবির জীবনে দেখা গিয়াছে যে, এক-এক সময়ে এক-একটি লোক প্রভূত প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর কবির তখন অগাধ নির্ভরশীলতা। তাঁহাদের পরামর্শে অনেক কাজ করিয়া ফেলেন, যাহার জন্য তাঁহাকেই নিন্দাভাগী হইতে হয়।

১৯০৩ সনের গোড়ায় ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) নামে এক তরুণ শিক্ষক আসিলেন— তাঁহার নাম শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের সহিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত।

সতীশ বরিশালের লোক— কলিকাতায় মেসে থাকিয়া বি.এ. পড়েন। রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্য ও তাঁহার বিদ্যালয়ের আদর্শবাদ যুবককে এমনই মুগ্ধ করিল, সে কলেজের আসন্ন পরীক্ষা না দিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজে আসিয়া যোগদান করিল। ইঁহারই সগোত্রীয়রা, আদর্শবাদী নবযৌবনের দল একদিন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' বলিয়া স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

সতীশ শান্তিনিকেতনে আসিবাব পব মাত্র এক বৎসর জীবিত ছিলেন। এই পর্বের প্রথম কয়েক মাসই কবির সহিত সতীশের আন্তরিক যোগ স্থাপিত হয়। কবির মনে হইতেছে এতদিনে তাঁহার মনোমতো আদর্শ শিক্ষক পাইলেন। 'আশ্রমের যারা শিক্ষক হবে, তারা মুখ্যত হবে সাধক— এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।' 'আত্মভোলা মানুষ, যখন-তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে-সেখানে। প্রায় সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্য সম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।'

সতীশের সাহিত্যিক জীবন আলোচনার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নহে; কেবলমাত্র শিক্ষকরূপে তাঁর যে অসামান্যতা প্রকাশ পায়, তাহাই তাঁহাব বন্ধু ও সতীর্থ অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: 'তাঁহার অধ্যাপনা তেজে আনন্দে আবেগে এমনি পরিপূর্ণ ছিল যে, তাহা ভাবসৃষ্টিরই মতো বোধ হইত।... পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়মনের সত্য-উদ্‌বোধন-কার্য যাহাতে হয় সেইদিকেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। সতীশের অধ্যাপনায় সেই কাজটি হইত। তিনি বাংলা পড়াইতেন— যেখানেই রচনার মধ্যে কোনো বর্ণনাব আভাস আছে সেখানে তাহার স্ফুটনে বালকদিগকে লাগাইতেন, তাহারা মানসচিত্রে সমস্তটা দৃশ্যের খুঁটিনাটি আশপাশ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে কি না তাহা যাচাইয়া লইতেন। এমনি করিয়া তাহাদের কল্পনাবৃত্তির বোধন হইত। ছন্দ শুনাইয়া ছন্দোবোধ এবং ছন্দ-রচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কীরূপে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা জানাইয়া দিতেন। সাহিত্য পড়াইতে গেলে যে তাহার ভিতরের আসল জিনিস রসবোধ কী করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয়, তাহা ইনি জানিতেন আশ্চর্যরূপে।

'প্রকৃতি গ্রন্থেও ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট করিতে এই প্রকৃতিব ভক্তটি ওস্তাদ ছিলেন। তাহাদের কাছে প্রকৃতির একটি রূপও অগোচর থাকিত না; প্রতিদিনের আবহাওয়া— সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান, মেঘবৃষ্টি, ফুলফলের উন্মীলন, পক্ষীপরিবারের নানাকথা, সমস্তই চোখের সামনে মেলা ছিল।... বর্ষায় তাহারা বাহির হইত। জ্যোৎস্না রাত্রে কে তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিবে। বৈশাখের ঝড়ে তাহারা ধুলায় গড়াগড়ি যাইত। তিনি তাহাদের উপভোগকে, কল্পনাকে হৃদয়কে এমনি করিয়া জাগাইয়াছিলেন।'

সতীশচন্দ্রের অদ্ভুত শিক্ষাপদ্ধতি, মস্ত কবির ন্যায় জীবনযাপন— ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদের আদৌ ভালো লাগিত না— তজ্জন্য সতীশকে যথেষ্ট মনোকষ্ট পাইতে হইত; তজ্জন্য আদর্শবাদের ঘাটতি কখনো দেখা যায় নাই। বাইশ বৎসরের স্বল্পায়ুজীবনে যেরূপ অধ্যয়নশীলতা ও প্রকাশনিপুণতা সতীশচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন— তাহা অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ এইটিই চাহিতেন— শিক্ষকরা ছাত্রদের ন্যায় অধ্যায়নশীল হইবেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যাকে লইয়া দীর্ঘকাল আলমোড়ায় থাকিতে হয়। সেখান হইতে এক পত্রে লেখেন। সতীশচন্দ্র যেন পড়িতে ও লিখিতে ও ভাবিতে সময় পান। 'শুদ্ধমাত্র

পড়াইবার কাজে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না।... ঔদার্যের আবেগে নিজের মানসশক্তির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত করিতে' নিষেধ করিলেন।

অধ্যাপকগণ জ্ঞানচর্চা করিবেন— তাঁহারা হইবেন দীপবর্তিকা— ছাত্রেরা তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে— এই ছিল কবির মানসলোকের স্বপ্ন। অধ্যাপকগণকে অধ্যয়নশীল দেখিলে তিনি কী যে প্রীত হইতেন— তাহা নিজ জীবন হইতেই সাক্ষ্য দিতে পারি।

১৯০৩ সনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন মনোরঞ্জন, জগদানন্দ, হরিচরণ, কুঞ্জলাল, সত্যেন্দ্রনাথ। নূতনদের মধ্যে আসেন সতীশচন্দ্র রায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কবি তাঁহার জামাতা ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি অধ্যক্ষতার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচালনকার্য তাঁহার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতেছিল না। কবি তাঁহার পীড়িতা কন্যা রেণুকাকে লইয়া আলমোড়ায় আছেন। এই দূরদেশে বাস করিলেও বিদ্যালয়ের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না। এই সময় কবির সহিত পরিচয় হয় মোহিতচন্দ্র সেনের। মোহিতচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সদস্য— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সিটি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরম রবীন্দ্রভক্ত। এই তরুণ অধ্যাপকের সহায়তায় কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ নূতনভাবে সম্পাদনে প্রবৃত্ত। কবি তাঁহাকে তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য আলমোড়ায় আহ্বান করিয়া আনেন; কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনাও হয়তো এই আহ্বানের কারণ হইতে পারে। প্রায় পক্ষকাল (২০ মে-৩ জুন, ১৯০৩) মোহিতচন্দ্রের সহিত নানারূপ কথাবার্তার পর 'বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাবিধি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার' তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। উপরন্তু অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত ও মোহিতচন্দ্রকে লইয়া কমিটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্থির হয় যে মোহিতচন্দ্র 'মাসে একবার করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন'। ('স্মৃতি')।

গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে এইভাবে কাজ চলিল; পূজাবকাশের পূর্বে (১৯০৩ সেপ্টেম্বর মাসে) মনোরঞ্জনবাবু কার্যত্যাগ করিয়া যাওয়াতে কবির পক্ষে বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিতে হইতেছে। কবির বলিষ্ঠ মনের আশাবাদ প্রগাঢ়, তাই মনোরঞ্জনবাবুকে এক পত্রে লিখিলেন— 'আপনি নিজেকে ভুলিতে পারেন নাই; আপনি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে আপনার করিয়া লন নাই। এ বেদনা আমার আজও মনে আছে। আমরা আত্মীয়ভাবেই ছিলাম— সে ভাব ভোলা কঠিন। সেইজন্যই বিদ্যালয়ের প্রতি আপনাদের অনাসক্তি ও বিমুখতা আমার পক্ষে চিরকাল ক্লেশকর থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অন্যায় কথা আপনি মনেও স্থান দিবেন না যে বিদ্যালয়ের পক্ষে কোনো আশঙ্কা বা অবনতির কারণ ঘটিয়াছে। প্রতিদিন আমি এই বিস্ময় অনুভব করিতেছি যে সমস্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া বিদ্যালয় নবতর প্রাণ ও প্রবলতর প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে।... আপনি ইহার অভ্যুদয় জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু আপনারা নিঃসংশয় হইবেন এমন দিনও আসিবে।' ('স্মৃতি')।

এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা না থাকিলে এই প্রতিষ্ঠান সমুজ্জ্বল মূর্তিতে কখনো প্রতিভাত হইতে পারিত না।

পূজাবকাশের পর (অক্টোবর, ১৯০৩) ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজে সুবোধ মজুমদার ফিরিয়া আসিলেন; নূতনদের মধ্যে আসিলেন নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

আশ্বিনের প্রথমদিকে কবির মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু হয়। অক্টোবর মাসে কবি

শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহার সন্তানেরা 'নূতন বাড়ি'তে দূর-আত্মীয়া রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে থাকেন। বিদ্যালয় অক্টোবরের মাঝামাঝি খুলিলে কবি উহার পরিচালনাদির ব্যবস্থা করিয়া শিলাইদহে চলিয়া যান। তৎপূর্বে মোহিতচন্দ্রকে লিখিলেন (৪ নভেম্বর, ১৯০৩) 'আপনি কবে আসিবেন আমি তার জন্য পথ চেয়ে আছি। আমার চিত্ত ক্ষুধাতুর।... আমি অবলম্বনের জন্য উৎসুক— বন্ধুর মধ্যে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করতে আমি ব্যাকুল। আমাকে আপনি মঙ্গলের সরল পথে সর্বদা প্রবৃত্ত রাখবেন।' ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', চৈত্র, ১৩৪৯)।

পৌষ উৎসবে আসিয়া কবি যথাবিধি মন্দিরে উপাসনাদি করিলেন। কলিকাতায় মাঘোৎসবের ভাষণও দান করেন। তখন শান্তিনিকেতনে শীতের ১৫ দিন ছুটি থাকিত। শীতাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে ফিরিবার মুখে সংবাদ পান শান্তিনিকেতনে মাঘীপূর্ণিমার দিন সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

শীতের ছুটি হইলে সতীশচন্দ্র, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পথে সতীশের জ্বর হইলে সকলে ফিরিয়া আসেন। তখনকার শান্তিনিকেতনে কয়টি মানুষেরই-বা বাস ছিল— তার পর তখন শীতাবকাশে বিদ্যালয় বন্ধ। কেবল আছেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১] নামে বাঁকুড়া-নিবাসী এক ভদ্রলোক— আশ্রমের সেরেস্তায় কাজ ও অবসরমতো শিক্ষকতাও করেন। এই বিরল পরিবেশে গুটিকা রোগে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪)।

সতীশের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩১০) সতীশের প্রতি তাঁহার প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তার পর ধীরে ধীরে সতীশচন্দ্র কবির মনোরাজ্যে আদর্শায়িত পুরুষ হইয়া উঠিলেন। "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে। 'বনবাণী' কাব্যখণ্ডে "শাল" কবিতায় (৭ ফাল্গুন, ১৩৩৪) কবি স্মরণ করিয়াছেন সতীশচন্দ্রকে।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত 'গুরুদক্ষিণা' নামক গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। বহুবৎসর এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। এই গ্রন্থের স্বত্ব সতীশচন্দ্রের পরিবারের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র বিবাহিত ছিলেন, তাঁহার এক মূককন্যা ছিল। কতদিন এই উপস্বত্ব সতীশের পরিবার ভোগ করে, তাহা জানি না। পিয়ার্সন সাহেব *Santiniketan* নামে একখানি বই লেখেন— তাহাতে এই গ্রন্থের অনুবাদ ছিল। বিশ্বভারতী পর্বে কোনো এক সময়ে বইখানি পাঠ্যতালিকা হইতে সরিয়া যায়।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর চারি মাস (ফেব্রুয়ারি-মে, ১৯০৪) বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে মোহিতচন্দ্র সেন কলিকাতার অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়া এই বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিলেন। আর ড্রয়িং শিক্ষকরূপে আসিলেন নগেন্দ্রনাথ আইচ। ইনি খুলনা-নিবাসী, 'ভার্নাকুলার' শিক্ষোত্তীর্ণ— বাংলা গণিতাদিতে পারদর্শী।

---

[১]রাজেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কলাভবন হইতে পাস করিয়া কলিকাতা আর্টস্কুলে অধ্যাপক হন; ইঁহার পুত্র সোমেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর বাংলার অধ্যাপক। ইঁহার ভাগ্নে সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় চীনাভবনের অধ্যাপক, সংস্কৃত ও তিব্বতিতে সুপণ্ডিত।

১৮

গ্রীষ্মাবকাশের পর (জুন, ১৯০৪) ছাত্র ও অধ্যাপকগণ পুনরায় শান্তিনিকেতনে সমবেত হইলেন। মোহিতচন্দ্র সেন 'হেডমাস্টার' হইয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। মোহিতচন্দ্রের চেষ্টায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়— শিলাইদহে বিদ্যালয় থাকিতেই নূতন ছাত্র ভর্তি হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠা প্রথমদিকে দেখা দিয়াছিল। শিক্ষক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের প্রেরণায় বালকদের মধ্য হইতে তিনজনকে বিশেষভাবে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া ছাত্রদের নেতা বা আদর্শস্থানীয় করা হইল। ইহারা নিজেরা আদর্শ জীবনযাপন করিবে এবং বিদ্যালয়ের আদর্শ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, এজন্য অন্যান্য ছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখিবে। এ শ্রেণীর moral monitorship কৃত্রিম— ইহা দীর্ঘকাল চলে নাই। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় চলিয়া আসার পর মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে পাবলিক স্কুলরূপে গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিলেন।

মোহিতচন্দ্র সুপণ্ডিত; শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী উদ্‌ভাবনের কাজে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচী সাধারণ শিক্ষকের দ্বারা কার্যে পরিণত করা কঠিন।

ছাত্রসংখ্যা ২০-২৫টির স্থলে ৫৫টি হইল। ছাত্রাবাস ছিল প্রাক্‌কুটির। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গৃহের উত্তরে একটি খড়ের চালা ছিল; সেখানে ভৃত্যেরা থাকিত। এইবার সেই খড়ের চালাঘর মেরামত করিয়া ছাত্রাবাসে পরিণত করা হয়।

মোহিতচন্দ্র সেন যৌবনের উৎসাহে ভাবিলেন তিনি কবির স্বপ্নে রূপদান করিবেন; আর রবীন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, যে-লোক এমন নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করিলেন, যিনি আত্মত্যাগ করিয়া তাঁহার কার্যে যোগদান করিলেন— তিনি সকল কর্মই সফলতার সহিত করিতে সমর্থ হইবেন। কবি ও দর্শনের অধ্যাপক উভয়েই ভুল করিলেন। মোহিতচন্দ্রকে লিখিত পত্রধারা পাঠ করিলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অদ্ভুতকর্মা ভাবিতেছেন। একজন পণ্ডিতের পক্ষে রান্নাঘরের তদারক, ছাত্রদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন উজ্জীবন, অধ্যাপনা ও অধ্যাপকদের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সমস্ত কাজ করা অসম্ভব। অর্থ সন্ধান, 'ইংরাজি সোপানে'র শুদ্ধ কপি প্রস্তুত, নূতন ঘর করার প্ল্যান ও এস্টিমেট করানো, ছাত্রদের নিয়মিত সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থাপন প্রভৃতি বিবিধ ফরমাইস আসিতেছে। একখানি পত্রে কবি মোহিতচন্দ্রকে লিখিতেছেন 'প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ট যোগ রাখবেন— আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন। প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্বাংশের সম্বন্ধ থাকবে— এই আমার ইচ্ছা। বলা সহজ করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয়, কলের সাহায্যে নয়— এইটেই আদত কথা কিয়ৎ পরিমাণে কলের দরকার হয়ে পড়েই; কিন্তু সে কল আপনি নন— অন্য শিক্ষকেরা। আপনি যন্ত্রী, আপনি মানুষ।

'এই সমস্ত কথা আনুপূর্বিক চিন্তা করে আপনার সমস্ত কৃত্য সবিস্তারে টুকে নেবেন এবং প্রত্যহ কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। শিক্ষকদের যে আদেশ উপদেশ দেবেন সেটি

লিখে রাখবেন এবং পালিত হচ্ছে কি না, বারংবার একটা বিশেষ নিয়মে যাচাই করে নেবেন।' ('বিশ্বভারতী পত্রিকা')।

কৈশোরে ছাত্রদের নানারূপ মনোবিকার দেখা যায়। বোর্ডিং বিদ্যালয়ে পাঁচজনের সহিত 'সহজ স্বাভাবিকতা লাভ করিতে' না পারাও বালকদের জীবনে একটা সমস্যা পর্ব। রবীন্দ্রনাথ বালকদের এই অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষকদের উপদেশ দিতেন। তিনি জানিতেন কোনো কোনো ছাত্রের আত্ম-সচেতনতার ব্যাধি (self-consciousness) থাকে। এই বিকার উত্তীর্ণ হইয়া অনেকেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ছাত্রদের প্রতি কবি কী স্নেহশীল, ক্ষমাপরায়ণ ছিলেন, তাহা সাক্ষ্য দিবার মতো ছাত্র হয়তো এখনো আছেন।

স্বাস্থ্য ও খাদ্যের প্রতি কবির দৃষ্টি ছিল চিরদিন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আদি যুগে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা ছিল। কবির মতে 'ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্য কিছুমাত্র ভাবতে হয় না, যদি তাদের best sauce-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' তিনি বলেন সকালে বিকালে কিছুক্ষণ খুব কষে কোদাল পাড়িতে পারিলে খাবার খুঁতখুঁতানি থাকে না। তিনি আরো লিখিতেছেন 'বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ, পরিশ্রমকালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোনো অসুখ করে না; বরং নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই-একজন ছেলের এক-আধ দিন একটু-আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ, কড়া রৌদ্রটা মাথায় ভালো নয়; রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তা হলে কোনো ভয়ের কারণ নেই; কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি হাত-পা ভালো করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসে। দুই-একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুত পদচালনা করে চলবেন। দু-চার দিন এমন করলেই রৌদ্র বৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ সংগত।'

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকেও কবি ছাত্রদের স্নানাদি বিষয়ে বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছিলেন। কত সূক্ষ্ম ও সাধারণ এমন-কি, আপাত-তুচ্ছ বিষয় কবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পত্র-মধ্যে আলোচনা করিতেন।

১৯

বাস্তবতাবোধ শূন্য অধ্যাপকের আদর্শবাদ রূঢ় আঘাত পাইল। মোহিতচন্দ্র বিদ্যালয়ে অধিক বয়স্ক ছাত্র ভর্তি করেন— তাহারা নিয়ম মানিতে অনভ্যস্ত— তাহারা হইল বিদ্যালয়ের সমস্যা। এদিকে মোহিতচন্দ্রের স্বাস্থ্য শান্তিনিকেতনে টিকিতেছে না; প্রায়ই অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় থাকিতে হইতেছে। সমসাময়িক অধ্যাপকগণ মোহিতচন্দ্রের সহিত পূর্ণ সহযোগ করিয়াছিলেন বলিয়া তো মনে হয় না। তদুপরি বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি অভাব-অভিযোগ

দেখাইয়া কবিকে পত্র লিখিয়াও অনেকে উদ্‌বেজিত করিতেন। বোধ হয় এইরকম কোনো পত্র পাইয়া কবি গিরিডি হইতে কোনো অধ্যাপককে লিখিতেছেন, (১৭ ভাদ্র, ১৩১১) 'বিদ্যালয়কে কতকগুলি জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।' সত্যই বাহিরে এই বিদ্যালয়কে নামে অনেকে বলিত সংশোধনাগার বা রিফর্মেটরি।

কবি বুঝিলেন মোহিতচন্দ্রের দ্বারা অধ্যক্ষতা করা সম্ভব হইবে না। মোহিতচন্দ্রের স্বাস্থ্যও টিকিতেছিল না। অপরদিকে নূতনের প্রতি কবির চিরমুগ্ধ মনোভাব ম্লান হইয়া আসিতেছে। তাহা না হইলে যে মোহিতচন্দ্রকে কয়েক মাস পূর্বে ছাত্রদের পক্ষে 'বিধাতার প্রতিনিধিত্ব' করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আজ মনে হইতেছে মাসিক একশত টাকা বেতনে সে লোককে পোষণ করা দুঃসাধ্য। বৎসরকাল পূর্বে এই মোহিতচন্দ্রের নিকট হইতে অত্যন্ত অভাবের সময় এক সহস্র মুদ্রা দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা অধ্যাপক পাইয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষকরূপে। সে কথা কি কবি আজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? অথবা আদর্শের কোনো সংঘাত বাধিয়াছিল?— যাহার ফলে মোহিতচন্দ্রকে আর্থিক ভারস্বরূপ মনে হইতেছে।

পূজার ছুটির পর (১৯০৪) বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন করা হইল। বয়স্ক ছাত্রদের একেবারে বিদায় করা হইল। অল্প বয়সের ছাত্র রাখাই স্থির হইল। কবি এক পত্রে লিখিতেছেন যে 'এন্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমতো শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।' অন্য পত্রে লেখেন 'অভিভাবকের দিক হইতে আমাদের সমস্ত লক্ষ্য ফিরাইয়া আনিয়া বিদ্যালয়ের অন্তর্গত আদর্শের দিকে আমাদের লক্ষ্যস্থির রাখিতে হইবে।'

মোহিতচন্দ্র চলিয়া গেলেন। কতকগুলি অবাঞ্ছিত ছাত্র ও অযোগ্য শিক্ষককে বিদায় দিয়া কবি ভাবিতেছেন, বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন সাধন করিবেন। কতবার কল্পনা করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া অভিভাবকদের দিকে না তাকাইয়া নিজ আদর্শমতো শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; তজ্জন্য পরযুগে শ্রীনিকেতনে 'শিক্ষাসত্র' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। আজ তাহা বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা-পাসের মোহ কাটানো বড়োই কঠিন।

কবি কতবার উত্তেজিত মনোভাব হইতে 'পরীক্ষা' উঠাইয়া দিবার কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যে পরিণত যে করেন নাই— তাহার কারণ তাঁহার বাস্তববোধ। তিনি জানিতেন পরীক্ষার শীলমোহরশূন্য বিদ্যার মান দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই— সুতরাং আপোষ অনিবার্য, জীবিকার সহিত পরীক্ষা-পাস অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত।

মোহিতচন্দ্র সেন চলিয়া গেলে পূজাবকাশের পর বিদ্যালয়ের ভার অর্পিত হইল ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর। নূতন নিয়মে বারো বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক ছাত্র স্কুলে লওয়া বন্ধ হইল। এখনো সেই নিয়ম চালু আছে, তবে ইহার যে ব্যত্যয় হয় নাই, তাহা বলা যায় না। তার পর ১৯২৬-এ বিশ্বভারতীপর্বে কলেজ বিভাগ রীতিমতোভাবে খোলা হইলে আশ্রমের ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বিপর্যস্ত হয়। কালে আশ্রম বড়ো হইতে থাকিলে, নানা শ্রেণীর অধ্যাপক, কর্মী, ঠিকাদাররা বৃহত্তর শান্তিনিকেতনে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের সন্তান ও আত্মীয়েরা বয়স নিরপেক্ষভাবেই বিদ্যালয়ে

ভরতি হইতে লাগিল। শিক্ষক ও কর্মীদের জন্য বাসগৃহ— গুরুপল্লী, পূর্বপল্লী ও দক্ষিণপল্লীর পত্তন হইলে— তথাকার বালকবালিকারা স্কুলের ছাত্রছাত্রী হইল— কিন্তু বোর্ডিংবাসী হইল না। ইহার ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী হইয়াছে— আবাসিক ও অনাবাসিক। তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যালয় এমন-কি, বর্তমানের কয়েকটি পাবলিক স্কুলের আদর্শ— আবাসিক জীবনযাপনের আদর্শ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের মনে হইতেছে!

২০

১৯০৪ সনে পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় নূতনভাবে গঠিত হইলে, বয়স্ক ছাত্রদের বিদায় দিয়া ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াইল ১২-১৩ জন মাত্র। অধ্যাপক থাকিলেন জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, নগেন্দ্রনাথ আইচ, অজিতকুমার চক্রবর্তী। নূতন আসিলেন কানাইলাল গুপ্ত— ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও বটে। অজিতকুমার সতীশচন্দ্রের সতীর্থ ও বন্ধু ছিলেন। ১৯০৪ সনে বি.এ. পাস করিয়া পার্থিব উন্নতির পথে না গিয়া বন্ধুর ন্যায় শান্তিনিকেতনের কার্যে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে যোগ দিলেন। অল্প বয়সে অজিতকুমার সাহিত্য, দর্শনাদি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তদুপরি রস গ্রহণের শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের উপর বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মভার অর্পিত হইল। কবি ভূপেন্দ্রনাথকে আদর্শায়িত করিয়া দেখিতেছেন ও নানাভাবে পত্র লিখিয়া উদ্‌বোধিত করিতেছেন। শিক্ষার ও শিক্ষকের আদর্শ কবির মনে কী ছিল, তাহা ভূপেন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রধারা হইতে আমরা জানিতে পারি। কবি এক পত্রে লিখিতেছেন, 'আপনার আত্মার উদার জ্যোতি যেন অবাধে আপনার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে পারে— ধৈর্য, ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে মঙ্গলের মূর্তিটিকে আকার দান করিয়া গড়িয়া তুলিবেন... কাহাকেও কোনো দিকে ছোটো হইতে দিবেন না।' অন্য পত্রে লিখিতেছেন—'আমাদের বিদ্যালয়ে কাজকর্ম, পড়াশোনা, অনুষ্ঠান-আয়োজন এবং নীতিশাস্ত্রসম্মত কর্তব্যটার টানাটানি থাকতে পারে, কিন্তু মাঝখানে তিনি কোথায়, সেই রসস্বরূপ? এই রসের প্রতিষ্ঠান না করলেও কাজ চলে। কিন্তু কাজই মানুষের শেষ নয়, লক্ষ্য নয়—'রসং হি লব্ধানন্দীভবতি'— সেই রসকে জানলেই আনন্দ হয়। আনন্দই সকল চেষ্টা, সকল কাজের পূর্ণতা। আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে, অধ্যাপকদের মধ্যে, কাজের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে সেই আনন্দ কবে দীপ্তি পেয়ে উঠবেন?'

রবীন্দ্রনাথ আদর্শে যাহা ভাবিতেছেন, কল্পনায় যাহা গড়িতেছেন— বাস্তবের সংস্পর্শে তাহা যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

ভূপেন্দ্রনাথের উপর বিদ্যালয়ের সকলপ্রকার কর্মভার চাপাইয়া তাঁহার হস্তে মাসিক ৫০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা করিলেন। ছাত্রদত্ত বেতন মাসিক গড়ে ২০০ টাকার বেশি হইত না; অর্থাৎ অবশিষ্ট তিন শত টাকা প্রতিমাসে কবি দিতেন শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট হইতে ও

নিজস্ব আয় হইতে। নিজস্ব আয় বলিতে বুঝাইত জমিদারি হইতে মাসোহারা। গ্রন্থ-বিক্রয়লব্ধ আয় যা ছিল তাহা নগণ্য। পত্রিকায় কিছু লিখিলে তখনি অর্থপ্রাপ্তি হইত না।

যাহা হউক, ভূপেন্দ্রনাথ যদি নির্বিবাদে কাজ করিতে পাইতেন, তবে হয়তো ঐ টাকায় বিদ্যালয় চালানো সম্ভব হইত, কিন্তু কবির 'মাথায় কত নূতন নূতন ভাব আসিতে লাগিল; এবং তদনুরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থারও কত পরিবর্তন হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে ব্যয়ভারও বাড়িতে লাগিল।... এক একটা নূতন স্কীমে সব উলটপালট হইয়া যাইত।'

২১

১৯০৫ সনের ১৯ জানুয়ারি (১৩১১ সালের ৬ মাঘ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল। শান্তিনিকেতনের যে-সব অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তাহার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যালয়ের দিক হইতে বলিবার মতো হইতেছে যে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের হিসাবপত্র এতকাল রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় দেখিতেন, এখন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শান্তিনিকেতন' গৃহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তিনিই এই হিসাবপত্রের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

আমরা বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ নিজ পরিবারের বাসের জন্য আশ্রমের পূর্বদিকে 'নূতন বাড়ি' নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই বাড়ির পূর্বদিকে খুব ছোটো একটি দ্বিতল বাড়ি তৈয়ারি করিয়া লন; বাড়িটি 'দেহলি' নামে এখন পরিচিত। 'খেয়া'র অনেক কবিতা এই বাড়ির দ্বিতলে বসিয়া রচিত।[১]

১৯০৫ সনের গোড়া হইতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন। তবে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা আরম্ভ হইলে, তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইত। এবার আশ্রমে আসিয়া প্রত্যেক অধ্যাপককে অধ্যয়নে, অনুশীলনে ও রচনাকার্যে উৎসাহদান করিতেছেন। ১৯০৫ সনে, ২ জুন এক পত্রে লিখিতেছেন, 'আমি অধ্যাপকদের লইয়া মাসখানেক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কিছু-না-কিছু বলা-কহা করিয়াছি। তাহার পরে বড়োদাদাও (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

---

[১]নূতন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পরিবার থাকিতেন। রথীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা, কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর এই বাড়ি কবির ব্যবহারে লাগিল না। ১৯০৮-১০ সন পর্যন্ত ইহাতে ছিল শিশুবিভাগ। তৎপরে কয়েকটি শিক্ষক পরিবার বাস করেন। ১৯১৫ সনে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত গান্ধীজির ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাস করেন, গান্ধীজিও ছিলেন। 'নিচু-বাংলা' যখন বিশ্বভারতী নিজাম তহবিলের অর্থ হইতে ক্রয় করিলেন, তখন 'নিচু-বাংলা'র স্বত্বাধিকারী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধবা পত্নী হেমলতা দেবীকে 'দেহলি' বাড়িটি দেওয়া হয়। হেমলতা দেবী পুরীতেই দীর্ঘকাল বাস করায় সংস্কারাভাবে এই বাড়ি ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয়। বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয় ব্যবস্থা করিয়া ইহার সংস্কার করিয়াছেন। এখন এই বাড়িতে 'আনন্দ-পাঠশালা' বা শিশু বিদ্যালয় বসে। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে।

কিছুদিন সন্ধ্যার আসর জমাইয়াছিলেন। আজকাল আবার আমার হাতে পড়িবার উপক্রম করিয়াছে।' ('স্মৃতি')।

কবি যখনি শান্তিনিকেতনে থাকেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাসে পড়ান। ইংরেজি মুখে মুখে পড়াইতে পড়াইতে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সোপান' ও 'ইংরেজি সহজশিক্ষা' বইগুলির পত্তন হয়। এই রচনাকার্যে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন— পরে অজিতকুমারও। কিন্তু পদ্ধতি কবির নিজের।

শুধু ক্লাস লওয়া নহে, ছাত্রদের জন্য নূতন নূতন ক্রীড়া, কৌতুক উদ্‌ভাবন করিতেন এবং তাহাদের ঘরে আসিয়া ইন্দ্রিয়বোধ চর্চা বা সেন্স ট্রেনিং করাইতেন। একজন সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিতেছেন— 'ছাত্রগণকে অনুমানে পারদর্শী করিবার জন্য কবিবর অতিসুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন ছোটোবড়ো ভাঙা ইট আনাইয়া একস্থানে রাখা হইয়াছে।... খেলিবার ছুটি হইলে কবিবর ছাত্রদের লইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন এবং একজনের পর একজন ছাত্রকে ডাকিয়া এক একখানা ইটের ওজন কত হইবে আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ যাহা বলিল, তাহা একজন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তার পর একখানির পর একখানি ইট তৌলদাঁড়িতে ওজন করিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাত। অন্য একদিন দেখিলাম তিনি একটি বল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেটা কত গজ দূরে পড়িল তাহা ছাত্রগণকে অনুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গজের দ্বারা মাপিয়া দেখাইলেন যে প্রকৃত দূরত্ব হইতে তাহাদের আনুমানিক দূরত্বের পার্থক্য কীরূপ। এইরূপে ভারের অনুমান, দূরত্বের অনুমান, সময়ের অনুমান সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা ধারণা হইত।' ('প্রবাসী', মাঘ, ১৩৪৭)।

উপরের দৃষ্টান্ত কয়টি ছাড়া আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি কথা বলিতেছি। কবি 'নাট্যঘরে' আসিয়া ছাত্রদের মধ্যে বসিলেন এবং আমাদিগকে কয়েকটি বস্তু আনিয়া রুমাল চাপা দিতে বলিলেন। ছাত্ররা আসিয়া দাঁড়াইলে রুমালটি একবার তুলিয়া লইয়া আবার জিনিসগুলি ঢাকা দিলেন। তার পর ছাত্রদের লিখিতে বলিলেন কী কী জিনিস তাহারা দেখিয়াছে। পলক মাত্রে দেখিয়া সবগুলি মনে রাখার শিক্ষা এইটি। আবার কতকগুলি শব্দ বলিয়া গেলেন— পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সেগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। চোখ বন্ধ অবস্থায় নানাপ্রকারের শব্দ শুনিয়া বলিতে হইত— কিসের শব্দ, কোনদিক হইতে আসিতেছে। এই-সবই অত্যন্ত দ্রুত করিতে হইত।

আর একদিন 'আবোলতাবোল' শব্দরচনার পরীক্ষা হইল। কে কত অদ্ভুত, অসংগত শব্দ দ্রুত বলিতে পারে। আমাদের অনেকেই বিপরীত শব্দ বলিলাম— তাহা যথার্থ অসংগত নহে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন 'অশোক রাজা ঘুঙুর পায়ে তেলের পিপে গড়াচ্ছেন' ইত্যাদি। সবটা মনে নাই; শেষ পঙ্‌ক্তি হইল—'কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুট্‌কি দিতে।' সবটা মিলে আবোলতাবোলের অদ্ভুত রস সৃষ্ট হইল।

২২

১৯০৪ সন হইতে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সূত্রপাত; ১৯০৫ সন হইতে উহা স্বদেশী আন্দোলনের রূপ লইল। এই দেশব্যাপী বিক্ষোভের আরম্ভ হইতে নেতাদের মনে এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে বাঙালিকে বলশালী হইয়া উঠিতে হইবে।

'সাতকোটি সন্তানে রে, হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি'— এই গ্লানি দূর করিবার জন্য বাংলাদেশের সর্বত্র শরীরচর্চার দিকে বালক ও যুবকদের দৃষ্টি গেল। স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগারের পত্তন হইল; খেলাধুলায় মন গেল। এই সময়ে কবিরও মনে হইতেছে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকগণকেও শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে। জাপান হইতে জুজুৎসুবীর সানো সান আসিলেন— জুজুৎসু ক্রীড়ার জন্য একটি টিনের চালার ঘর নির্মিত হইল। এর ত্রিশ বৎসর পরে আর একবার এক জুজুৎসুবীরকে জাপান থেকে কবি আনিয়াছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত আপশোশের বিষয় এখানে অনেক জিনিস সগৌরবে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ধারণ করিবার আধার সৃষ্টি করা হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের একাধিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ— কারণ কাগজপত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করি নাই— জীবনেও তাহা ধরিয়া রাখি নাই।

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সহিত রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। এমন-কি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি উদ্যোক্তাদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। জানি না, সেই সাময়িক উত্তেজনার স্পর্শে তিনি শান্তিনিকেতনের মানবগণকে অভয়ব্রতী করিয়া তুলিবার জন্য ইচ্ছান্বিত হইয়াছিলেন কি না।

রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজে' যে গঠনমূলক কার্যের নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসী গ্রহণ করে নাই। কবি গ্রামের কার্য করিবার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণকে উৎসাহিত করিলেন। ভুবনডাঙা গ্রামে প্রথম নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শাসন -বিষয়ে ১৯০৫ সনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এই নূতন ব্যবস্থার মূলকথা— আত্মশাসন ও ডিমোক্রেসি। শাসন ও সংযম পরস্পরের পরিপূরক। ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়েই শিক্ষায়তনের অপরিহার্য অঙ্গ। উভয়কেই দেশের নূতন পরিস্থিতিতে গঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে— ইহাই হইল বিদ্যালয়ের নবকথা।

বিদ্যালয়ের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন আসিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশে আমলাবাদ ও গুরুবাদের স্থলে জনমতবাদ বা ডিমোক্রেসির পত্তন হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পড়িল 'অধ্যাপকমণ্ডলী'র উপর— কোনো ব্যক্তির উপর নহে। অনেকটা collective leadership ও responsibility। অধ্যাপকমণ্ডলী যাঁহাকে নির্বাচন করিবেন তিনিই হইবেন অধ্যক্ষ। সেই হইতে বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে নির্বাচনবিধি প্রবর্তিত হয়।

অধ্যাপকমণ্ডলীর উপর বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালন ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পড়িল। অধ্যাপকদেরই পালাক্রমে রান্নাঘরের কার্য দেখা, হিসাবরক্ষা প্রভৃতি সকলপ্রকার কাজই করিতে হইত। একজন পরিদর্শক প্রতিমাসে নির্বাচিত হইতেন; তাঁহার কাজ ছিল, আশ্রমের কোথায় কী ত্রুটি তাহা দেখিয়া রিপোর্ট করা। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের ছোটাখাটো
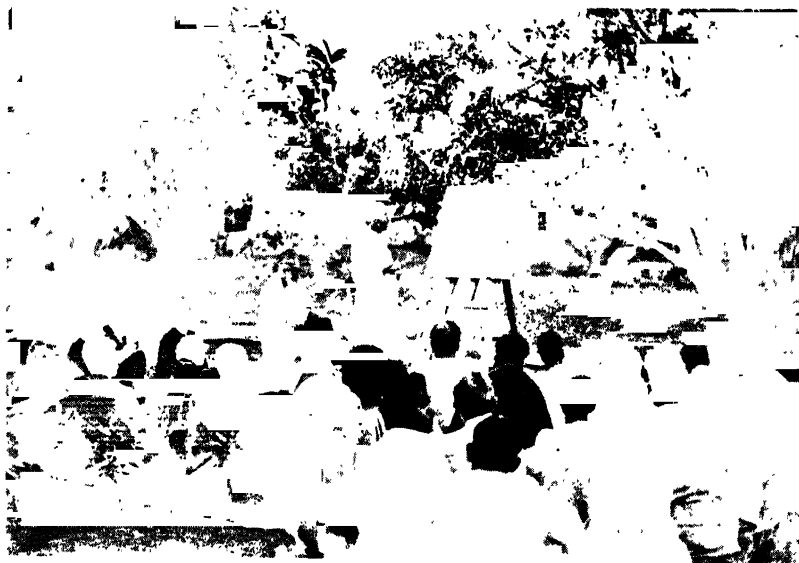
অধ্যাপক লেভি ক্লাস নিচ্ছেন

শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা

লেখক ও রথীন্দ্রনাথ

ছাতিমতলায় কয়েকটি ছাত্র

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ক্লাস নিচ্ছেন
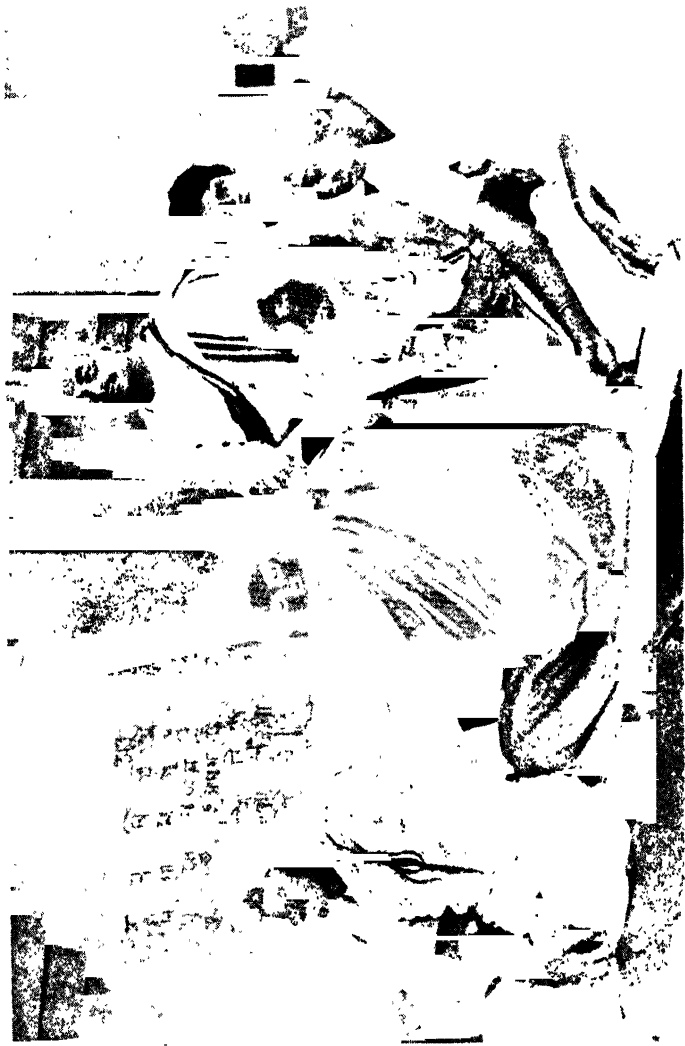
মঞ্জু ঠাকুর, রাণু অধিকারী (লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়), ভীমরাও হসুরকর, বাসু, শান্তিদেব, পারুল

মেরামতির কাজ, মিস্ত্রি মজুরদের কাজের তদারক শিক্ষকদেরই করিতে হইত; মেথরদের কাজ দেখা, তাহাদের বেতন দেওয়া, কাবুলিদের দেনা হইতে তাহাদের রক্ষাদি কার্য শিক্ষকরাই করিতেন। রান্নাঘরের কাজ শরৎবাবু বেশি দেখিতেন; মাঝে মাঝে হরিবাবু, জগদানন্দবাবু ও আমাকেও করিতে হয়। এখানে একটি কথা বলা দরকার; এই-সব ফালতু কাজের জন্য শিক্ষকরা কোনো পৃথক বেতন পাইতেন না। তবে থাকা, খাওয়া প্রভৃতি সমস্তই বিনা খরচে পাওয়া যাইত; অবশ্য সেটা সকল শিক্ষক ও কর্মীই পাইতেন। বর্তমানে বিশ্বভারতীর কর্মীদের বেতন বেশি, কিন্তু কোনো amenities বা সুবিধা সুযোগ বিনামূল্যে তাঁহারা পান না। ঘরভাড়া, বিজলিবাতি, কলের জল, পাহাবা, ডাক্তার, ঔষধ, ধোপা, নাপিত, পুত্রকন্যাদের স্কুলকলেজের বেতন, আসবাবপত্রের ভাড়া প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা বেতন হইতে কাটা হয়। ইহাব ফলে কর্মীদের মধ্যে বিদ্যালয় হইতে কিছু পাইতেছি তজ্জন্য কোনো কৃতজ্ঞতার ভাবের উদ্রেক হয় না। তাঁহারা পড়াইতেছেন বা দপ্তরখানার কাজ করিতেছেন, তজ্জন্য বেতন পাইতেছেন এইভাবই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আশ্রমের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতেছে।

আশ্রম-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের উপর যেমন বাসস্থানের ভার পড়ে, ছাত্রদের উপরও প্রচুর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ছাত্রশাসন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্ররা অধ্যাপকদের সহায়তা করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই ছাত্রশাসন ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের উপর ন্যস্ত হইল। ছাত্রভবনে নায়কতা বা ছাত্রপরিচালনা ব্যাপারে নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তিত হয়। অধ্যাপকদের মধ্য হইতেও তিনজন অধিনায়ক হইলেন— ইঁহাদের উপর সেই collective leadership ও responsibility পড়িল। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের ছাত্ররা নিজ নিজ গৃহের ছাত্রনায়ক বা নেতা নির্বাচন করিত এবং সকল ছাত্রের পরিচালনার জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হইত। অধিনায়ক ও গৃহনায়করা ছাত্রদের পড়াশুনা ছাড়া আর-সকল বিষয়ের জন্য দায়ী। ছাত্রদের অপরাধের বিচার সরাসরি শিক্ষকদের কবিবার অধিকার ছিল না। ছাত্রাবাস সম্বন্ধে নিয়মভঙ্গ হইতে অন্যায়ভাবে নকল করা প্রভৃতি অপরাধের বিচার ছাত্রসভাই করিত। সেই বিচারে দৈহিক প্রহারাদি শাস্তি দিতে তাহারা পারিত না; তবে অন্য নানারূপ শাস্তি দিতে পারিত। অপরাধীকে সাধারণ পঙ্‌ক্তি হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ানো, রান্নাঘরে পৃথক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা ছিল চরম শাস্তি। সাধারণত অতিরিক্ত ঘর ঝাঁট দেওয়া, খেলা বন্ধও ছিল শাস্তির মধ্যে। একে বলা যায় জুনিয়র রিপাবলিক। 'আশ্রম সম্মিলনী' সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

২৩

শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি বোর্ড ছিল— বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল— প্রত্যেক বিষয়ের এক-একজন পরিচালক। ক্লাসের শিক্ষকগণ নিজ নিজ ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে প্রতি মাসের পাঠোন্নতি বা অবনতির কথা, পরীক্ষার ফল প্রভৃতির

রিপোর্ট লিখিয়া পরিচালকের নিকট পাঠাইতেন— অথবা বিষয়ানুযায়ী যে মোটা বাঁধানো খাতা থাকিত, তাহাতে লিখিয়া দিতেন। মাসান্তে সভায় আলোচনা হইত। যে ছাত্রের অবনতি দেখা যাইত— তাহাকে ক্লাসের উপযুক্ত করিবার দায়িত্ব শিক্ষকদেরই; তজ্জন্য বিশেষ ক্লাসের প্রয়োজন হইলে করা হইত— অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর বিশেষ শিক্ষকের নিকট গিয়া ছাত্রকে কাজ করিতে হইত। ইহা 'প্রাইভেট টিউশনি' নহে। কোনো অনগ্রসর ছাত্রকে পড়াইয়া পৃথক টাকা রোজগারের কথা তখন কল্পনার অতীত ছিল। পরযুগে পাঠভবনের অধ্যক্ষরা বিশেষ কোচিং-এর জন্য অভিভাবকদের নিকট হইতে মাসিক টাকা চাহিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষকরা সে-সময় যে ছাত্রগত প্রাণ ছিলেন, তার একটি কারণ শিক্ষকদিগকে ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করিতে হইত। তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ না থাকায় তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ ছাত্রদের উপরই নিবিষ্ট ছিল। কয়েকজন শিক্ষক আপনাদের গৃহে বাস করিলেও, ছাত্রাবাসে তাঁহাদের নির্দিষ্ট আসন ও কর্তব্য ছিল; সেইজন্য ছাত্রদের সহিত যোগ ক্ষুণ্ণ হইত না।

২৪

১৯০৯ সনের পূজাবকাশের পর নভেম্বর মাসে আমি শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পাইয়াছিলাম।[১] ছয়মাস লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। ১৯১০ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে কবি আমাকে বলিলেন যে ছুটির পর স্কুলে কিছু কিছু পড়াইবার কাজ করিতে হইবে। বেতন ধার্য হইল পনেরো টাকা।

ছুটিতে গিরিডিতে বাড়ি গিয়া শুনিলাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্যত্র কাজ লইয়া যাইবেন। সমস্যা হইল মা ও ছোটো ছোটো ভাইবোনদের কী ব্যবস্থা করা যায়। গিরিডিতে গিয়া দেখি মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী তাঁর দুই কন্যাকে লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়াছেন। মোহিতচন্দ্র সেন আমার পিতার কলেজের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় ছিল যে আমার পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের— আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রাখেন মোহিতকুমার। মোহিতচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সুশীলা দেবী শান্তিনিকেতনে আসেন বালিকাদের বোর্ডিং-এর ভার লইয়া। এই কাজ তাঁহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে না এই অজুহাতে কিছুকাল পরে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। নিরাশ্রয় অবস্থায় সুশীলা দেবী কন্যাদের লইয়া গিরিডিতে আমাদের বাড়িতে যান। তাঁহারা গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে গিরিডিতে থাকিলেন।

---

[১] তখন হিমাংশুপ্রকাশ রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম শিক্ষক। আমাদের সহিত গিরিডিতে তাঁহাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হিমাংশুবাবুর অতিথি হইয়া আমি ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমাকে তিনি সামান্য বালক বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আমি বোলপুর আসিলাম। কবিকে আমাদের সংসারের কথা বলায়, তিনি বলিলেন 'তোমার মা যদি বালিকাদের দেখাশোনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের এখানে আনিতে পার।' আষাঢ়ের মাঝামাঝি আমি তাঁহাদের গিরিডি হইতে শান্তিনিকেতনে আনিলাম। মা দুইটি ভগ্নীকে লইয়া থাকেন দেহলিতে; ছোটো ভাই থাকিল হোস্টেলে; আমি তখন থাকি নূতন বাড়িতে শিশুবিভাগের একটি ঘরে; সেই ঘরে জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় কাজকর্ম পড়াশোনা করেন।

আমি আসিলাম শ্রীশচন্দ্র রায়ের স্থানে। ছুটির পর হিমাংশুবাবু আর আসিলেন না।

শ্রীশচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভ্রাতা বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সত্যেশ্বর নাগ, শরৎকুমার রায়— ইঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন বরিশাল হইতে। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন গোঁড়া বিবেকানন্দ পন্থী। বড়ো ছাত্রদের লইয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চর্চাই ছিল তাঁহার মুখ্য কর্ম। একবাব কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া তিনি অভিভাবকদের অনুমতি না লইয়া বেলুড়ে যান; অভিভাবকগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র দেন। শ্রীশচন্দ্রকে সেই অপরাধের জন্য যাইতে হয় বলিয়া শুনিয়াছিলাম।

১৯১০ সনে আরো কয়েকজন শিক্ষক আসেন— হীরালাল সেন ও নেপালচন্দ্র রায়।

হীরালালের বাড়ি খুলনার সেনহাটি গ্রামে। সেখানে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। 'হুঙ্কার' নামে এক কবিতাগ্রন্থ লিখিয়া রাজদ্রোহ অপরাধে তিনি জেলে যান। এই বইখানি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন কবির অজ্ঞাতে; এজন্য কবিকে খুলনা যাইতে হয় সাক্ষী দিতে। কবির মনে হইয়াছিল তাঁহার সাক্ষ্যদানই হীরালালের কারাবরণের কারণ। সেইজন্যই হীরালাল জেল হইতে মুক্তি পাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। লোকটির অনেক গুণ— গানে, অভিনয়ে, হাস্যরসিকতায়। ছাত্রদের প্রতি যেমন সদয, তেমনি কঠোর। তাঁহাকে নিজে হাতে ছেলেদের খোসপাঁচড়া গরম জল দিয়া ধুইয়া দিতে দেখিয়াছি। ইঁহাকে নিয়োগ করায় বহুকাল কবিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন থাকিতে হয়। দুই বৎসর সংগ্রামের পর তাঁহাকে রাখা সম্ভব হইল না। কবি তাঁহাকে বিদ্যালয়ের কাজ হইতে মুক্তি দিয়া নিজ জমিদারিতে চাকুরি দেন। কয়েক বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপালচন্দ্র রায় খুলনা-মুলঘরের লোক। এলাহাবাদে শিক্ষকতা করিতেন। কিন্তু সেখানে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়ায় শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা তাঁহার উপর আদৌ সদয় ছিলেন না। সেইজন্য তিনি প্রৌঢ় বয়সে আইন পাস করেন— ইচ্ছা ছিল স্বাধীনভাবে রাজনীতিক কাজ করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী ম্যানচেস্টার বৃত্তি পাইয়া অক্সফোর্ডে থিওলজি বা ধর্মতত্ত্ব পড়িবাব জন্য ইংলন্ড যাত্রা করেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পড়াইবার জন্য নেপালবাবু সাময়িকভাবে আসিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার জীবন আশ্রমের সামুদায়িক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গেল। তাঁহার আশ্রম হইতে ফিরিয়া যাওযা আর সম্ভব হইল না।

আমি পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯০৮ সনে বি.এ. পাস করিবার পর শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হইয়া আসেন। ইনি আমাদের পূর্ববর্ণিত আশ্রমধারী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কবির নিকট সপ্তপর্ণী তলে ১৩১৭

সালে ৭ই পৌষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞান পড়াইতেন এবং কালে বিদ্যালয়ের দপ্তর বা অফিস সুশৃঙ্খলিত করেন। তিনি বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ঘণ্টার যে কোড বা সংকেতগুলি করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত নিত্য ধ্বনিত হইতেছে।

আমি আসিয়া যে কয়জন শিক্ষক ও কর্মীকে দেখিয়াছিলাম তাঁহাদের কয়েকজনের কথা বলিয়াছি। আর সে-সময় ছিলেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, তেজেশচন্দ্র সেন, কালিদাস বসু। আমি শান্তিনিকেতনে যখন ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে দুইদিনের জন্য বেড়াইতে আসি— তখন আমি বিধুশেখরকে দেখিয়াছিলাম সংস্কৃত গ্রন্থাগারের মধ্যে। বিধুশেখরের সদ্য প্রকাশিত 'মিলিন্দ পঞ্চহো' পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ক্রয় করিয়া আসিয়াছি। আজ তাঁহাকে তাঁহার কর্মপীঠে কর্ম-নিরত দেখিলাম। বিধুশেখর কাশীতে সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন ইঁহার বাল্যবন্ধু। ১৯০৫ সনে ২৬ বৎসর বয়সে ইনি আসেন শান্তিনিকেতনে। নবাগত অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৩১৫ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন বেদাদি গ্রন্থ হইতে বর্ষার উপযোগী শ্লোক স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের দ্বারা আবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। উৎসব ক্ষেত্রে পর্জন্যদেবতার বেদী বৈদিক রীতিতে রচিত হয়।

ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ি ঢাকা বিক্রমপুরের সোনারঙ গ্রামে। তাঁহার বাল্য ও যৌবন কাটে কাশীতে। সেখানকার সংস্কৃত কলেজ (কুইন্স কলেজ) হইতে এম. এ. পাস করিয়া তিনি চম্পারাজ্যে শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি পান। বাল্যবন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর মারফত কবির সহিত ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই মানুষটিকে দেখামাত্র কবি বুঝিলেন যে ইনি আশ্রমের আদর্শ সেবক হইবেন। ১৯০৮ সনে তিনি আশ্রমের কার্যে আসিয়া যোগদান করেন। ক্ষিতিমোহন সেন আশ্রমের সকল কাজে কবির সহায় ছিলেন।

কালীমোহন ঘোষ ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরনিবাসী। দেশের কাজ তথা গ্রামের কাজ করার উৎসাহ ছিল তাঁহার অদম্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারিতে যে পাঁচজন যুবককে লইয়া পল্লী-সংগঠন কাজের পত্তন করিয়াছিলেন কালীমোহন ঘোষ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু এই পল্লীসংগঠন কার্য বেশিদিন চলিতে পারে নাই। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত। কালীমোহন ঘোষ শান্তিনিকেতনের শিক্ষকরূপে আসেন ১৯০৮ সনে। পরবর্তী যুগে কালীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবা ও সংস্কার বিভাগের প্রতীকস্বরূপ হইয়া খ্যাতিমান হন। যথাস্থানে সে কথা আলোচিত হইবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসিবার কয়েক মাস পূর্বে ঢাকা হইতে তেজেশচন্দ্র সেন নামে একটি বালক আসে। বালকটি মন্দিরের পূর্বে এক তালগাছ-তলায় বসিয়াছিল। ক্ষিতিমোহন সেন স্বল্প পরিচয়ে তাহাকে চিনিয়া ফেলেন। কবিকে বলিয়া তিনি বালকটির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমি যখন আসি, তখন তেজেশচন্দ্র নীচের ক্লাসে ছাত্রদের পড়াইতেছেন। তাঁহার এই শিশু-বাৎসল্য সমভাবে চিরদিন ছিল।

নগেন্দ্রনাথ আইচের ভাগিনেয় কালিদাস বসু ছিলেন বাংলার শিক্ষক। অসীম বলশালী

পুরুষ অথচ শিশুর ন্যায় কোমল ও মৃদু স্বভাব। তিনি সর্বদাই আপনার মধ্যে একটি স্তব্ধতা অনুভব করিতেন— তাহার স্পর্শ আমরাও যেন পাইতাম তাঁর সান্নিধ্যে। অজস্র কবিতা লিখিতেন, কিন্তু প্রকাশের জন্য কোনো ব্যাকুলতা ছিল না। ইঁহার বাড়ি ছিল খুলনা জেলায়। ইঁহার এক পুত্র আনন্দ বসু বর্তমানে বোলপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক।

২৫

১৯১০ সনে কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদাব আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন কবিয়া আশ্রমের কার্যে যোগদান করেন। সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথকে কবি (১৯০৬) আমেরিকা পাঠান— বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষিবিদ্যা ও গোপালন-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য।

সন্তোষচন্দ্রের আত্মীয়দেব ইচ্ছা ছিল সন্তোষকে লইযা কলিকাতায় একটি কোম্পানি গঠন কবিয়া গোশালা স্থাপন করা। রবীন্দ্রনাথেব ইচ্ছা সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে আসিয়া গোশালা স্থাপন কবেন ও আশ্রমবালকদের চিরন্তন দুগ্ধসমস্যা দূর করেন।

তিনি সন্তোষকে আশ্রমেই গোশালা স্থাপনে উৎসাহিত করিলেন। উত্তরভারতীয় দুগ্ধবতী গাভীর সঙ্গে আসিল উত্তবপ্রদেশের গোয়ালা। শান্তিনিকেতন মন্দিরের উত্তরে রাস্তার অপর পারে বিবাট গোগৃহ স্থাপিত হইল। সন্তোষচন্দ্র তাঁহার তিন বৎসর কলেজ-পড়া বিদ্যা লইয়া গোশালার কাজ আরম্ভ করিলেন। খাতাপত্র, ফর্ম, ছক তৈয়ারি হইল— কোন গরু কী খায়, কতখানি খায়, কতখানি দুধ দেয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। সদ্য-ম্যাট্রিক পাস করা হীবালাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবকের উপর এই-সব কাজের ভার পড়ে। সন্তোষচন্দ্র হইলেন বিদ্যালয়েব শিক্ষক— ইংরেজি পড়ান। এ ছাড়া তাঁহার প্রধান কাজ ছিল আশ্রমের অতিথি সৎকার। এমন আন্তরিকতাব সঙ্গে অতিথিসেবা করিতে কাহাকেও দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি লইয়া তিনি জীবন কাটাইয়া দেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের গোশালা কালে অচল হইয়া পডিল। লালধারী নামে এক হিন্দুস্থানি গোয়ালা গোশালাটি চালাইত তার দেশওয়ালিদের লইয়া। বিশ্বভারতী পর্বে সেটি উঠিয়া গেল।

সন্তোষচন্দ্র প্রায় একশত বিঘা ডাঙা জমি শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে সুপুরের জমিদারদের নিকট হইতে স্বল্পমূল্যে জমা লন। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী পূর্বদিকের মাঠ সরকারেব সাহায্যে অ্যাকুইজিশন করেন। সেই সময়ে সন্তোষচন্দ্রের নিজ বাস্তু ও কয়েক বিঘা জমি ছাড়া বিশ্বভারতীর মধ্যে আর-সব আসে। এই ব্যাপার লইয়া সন্তোষচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদের সঙ্গে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

২৬

১৯১১ সনে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াছে; নূতন দুইটি ঘর হইয়াছে— বীথিকাগৃহ ও বাগানবাড়ি। বীথিকাগৃহ ছিল শালবীথির দক্ষিণে, 'বাগানবাড়ি' তৈয়ারি হয় পুকুর পাড়ে। এই বাড়ি দুইটি এখন নিশ্চিহ্ন। বাগানবাড়ির ছাত্রেরা খুব ভালো করিয়া বাগান করিত বলিয়া সেটির নাম হয় বাগানবাড়ি। কালিদাস বসু ও কালীমোহন ঘোষ দীর্ঘকাল এই বাগানবাড়িব ছাত্রদের দেখাশোনা করিতেন। এই দুই ঘর হইতে 'বীথিকা' ও 'বাগান' নামে দুইখানি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকাগুলির বার্ষিক উৎসব হইত দেখিবার মতো। কতরকম ফুলপাতা কত পদ্ম সংগ্রহ করিয়া ছাত্ররা নিজেরাই সভামণ্ডপ সাজাইত। ইহা ছিল তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ।

১৯১১-১২ সনের মধ্যে আরো তিনটি ঘর নির্মিত হয়— সতীশকুটির, মোহিতকুটির, সত্যকুটির— তিনজন গতায়ু শিক্ষকের নামে— সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতচন্দ্র সেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কিছুকাল পরে এই পঙ্‌ক্তির পূর্বদিকে ডোবা ভরাইয়া শমীন্দ্রকুটির নির্মিত হয়— রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের নামে।

এইভাবে বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্মিত হইলে ছাত্র পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য সংবিধান নূতনভাবে রচিত হয়। সকলপ্রকার কার্য পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইল। সর্বাধ্যক্ষ হন জগদানন্দ রায়। ছাত্র পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগে তিনজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। আদ্যবিভাগের বা বড়ো ছেলেদের ভারপ্রাপ্ত হইলেন নেপালচন্দ্র রায়, মধ্যবিভাগ বা মাঝারি বয়সের ছাত্রদের অধ্যক্ষ হইলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শিশুবিভাগের ভার সমর্পিত হইল তেজেশচন্দ্র সেনের উপর। এই বিভাগীয় শাসনপ্রথা বহুকাল চলিয়াছিল।

সর্বাধ্যক্ষ ও বিভাগীয় অধ্যক্ষেরা অধ্যাপকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। অধ্যাপকমণ্ডলীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য কর্মীরাও সভ্য হইতেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও এই অধ্যাপকমণ্ডলী কয়েকবৎসর একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে চলিয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ইহার সকল ক্ষমতা সংকুচিত হইল এবং কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহার বিকল্পরূপে যে কর্মীমণ্ডলী স্থাপিত হয়— তাহা বর্তমানে অর্ধমৃত প্রতিষ্ঠান।

২৭

আশ্রম জীবনের সামুদায়িক উন্নতির জন্য ছাত্র ও শিক্ষকগণ মিলিত হইতেন আশ্রম সম্মিলনীতে। আশ্রম বিদ্যালয়ের বিচিত্র কাজ ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ সহযোগিতায় সম্পন্ন হইত।

শিক্ষকগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্য হইতে সম্পাদক, কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ব্যতীত আশ্রমের স্বাস্থ্য, খাদ্যসমস্যা, পত্রিকা-পরিচালনাদি সকল কার্য সম্বন্ধে এই সভা মতামত দিতে পারিত এবং তাহাদের বক্তব্য আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইত।

আশ্রম সম্মিলনীর সভা বসিত মাসে দুইবার অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়। সে-দুইদিন অপরাহ্ণে ক্লাস হইত না। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকিলে, অনেক সময়েই এই সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। ছাত্ররা তাঁহার সম্মুখে তর্কবিতর্ক করিতেছে সাধারণ বিদ্যালয়ের আদর্শে এই ধরনের কার্য চপলতা; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অশেষ ধৈর্য ও কৌতুকের সহিত সভাপতির কার্য করিতেন। কবির মতে ছাত্রদের কাজেকর্মে দিনরাত্রি চালনাটাই যেন বড়ো হইয়া না উঠে। ছাত্রগণকে অধ্যাপকদের সহযোগী সহকর্মী করিয়া তোলাই হইতেছে আশ্রম সম্মিলনীর আদর্শ। সমসাময়িক একপত্রে কবি লেখেন 'আমি মানুষের শক্তির উপরেই সমস্ত শ্রদ্ধা রাখি। আমি জানি একবার মানুষের ঠিক মর্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা যায়।'

আশ্রম সম্মিলনীর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ— সেবাবিভাগ। ছাত্ররা মাসিক চাঁদা তোলে এবং আনন্দমেলা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎকুমার রায় ছিলেন ইহার ন্যাস-রক্ষক। তাঁহারা গ্রামের দুস্থ ব্যক্তি, বাহিরের দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করিতেন। মনে আছে গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান তাঁহার পুত্রের জন্য প্রতিমাসে কিছু অর্থ সাহায্য পাইবার জন্য আসিতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনো আছে। ছাত্ররা চাঁদা তুলিয়া, অভিনয় করিয়া অর্থ উঠাইয়া কঠিন পীড়াগ্রস্ত অধ্যাপকদেরও সহায়তা দান করিয়াছে। গ্রামে তাহারা ঔষধপথ্য দিয়া এখনো বহু দরিদ্রকে রক্ষা করে। তবে উৎসাহী শিক্ষকদের সহযোগিতায় উহা কার্যকরী হয়, সেখানে ঔদাসীন্য দেখা দিলে ছাত্রদের মধ্যেও প্রেরণা হ্রাস পায়।

ছাত্রদের সেবা-বিষয় উৎসাহের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের পাটচাষিদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। শান্তিনিকেতনের দুইজন শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ ও পিয়ার্সন পূর্ববঙ্গ সফরে যান ও চাষিদের দুর্দশা দেখিয়া আসেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের নিকট সেই চাষিদের কথা বলায় ছাত্ররা তখনি তাহাদের আশ্রম সম্মিলনীতে স্থির করে যে তাহাদের দৈনিক খাদ্যসামগ্রী হইতে চিনি, ঘৃতাদি বাদ দিয়া বিনিময়ে যে মূল্য পাইবে, তাহা দুস্থদের জন্য প্রেরণ করিবে।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া এন্ড্রুজকে লেখেন ছাত্রদের পক্ষে নিজেদের নির্দিষ্ট খাদ্য অংশ হইতে যে উপকরণগুলি শরীর গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা তাহাদের দেওয়া যায় না। তবে তিনি বলিলেন ছাত্ররা পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করুক-না-কেন; সেই পরিশ্রমলব্ধ অর্থের মূল্য আছে। ছাত্ররা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ডাঙা জমি কাটিয়া মজুরি বাবদ নব্বই টাকা বোধ হয় পায়; শমীন্দ্রকুটিরের নিকটস্থ ডোবা ভর্তি কবিবার মজুরিও ছাত্ররা ঐ তহবিলে দান করে। ঐ টাকা পূর্ববঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল।

২৮

১৩১৮ সালে ৮ পৌষ আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপকদের লইয়া আশ্রমিক সংঘ নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন ছাত্রদের উপর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন। ইংলন্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড প্রভৃতিতে প্রাক্তন ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। কবির ভরসা আশ্রমের পুরাতন ছাত্ররা তাঁহার জীবন আদর্শ ও শিক্ষা আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

১৩১৮ সালের ৭ই পৌষের পরদিন বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের জন্য নির্ধারিত হইল। এই বৎসর সপ্তপর্ণীর ছায়াশীতল বৃক্ষতলে উপাসনান্তে সভা হয়। এই সভায় অজিতকুমার চক্রবর্তী আশ্রমের রূপ ও আদর্শ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে যে ভাষণ পাঠ করেন, তাহা 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে মুদ্রিত হয়। সেদিন উৎসবক্ষেত্রে আশ্রমের বহু পুরাতন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই সভার পর কবির নূতন আশ্রম-সংগীত—'আমাদের শান্তিনিকেতন' গীত হইল।

ইহার পর-বৎসর এই বার্ষিক উৎসব আরো সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় (ডিসেম্বর, ১৯১২)। সভার সভাপতি হন পাটনা কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। যদুনাথ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া কবির ও আশ্রমবাসীর প্রিয় হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটিকা যদুনাথকে উৎসর্গ করেন।

সেদিনকার উৎসবে জগদানন্দ রায় বার্ষিক বিবরণীর কিয়দংশ ও প্রভাতকুমার অবশিষ্টাংশ পাঠ করেন। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ স্মৃতিকথা পড়িয়া শোনান। এই বৎসর হইতে আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক সভা ৮ পৌষেই হইয়া আসিতেছে।

২৯

১৯০৮-০৯ সনে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে যে ধর্মদেশনা প্রায় প্রতিদিন দিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব শিক্ষকদের জীবনে দীর্ঘকাল কার্যকরী হয়। ১৯১১ সনে চুনীলাল মুখোপাধ্যায় ও অনঙ্গমোহন রায় নামে দুইজন ব্রাহ্মযুবক শিক্ষক হইয়া আসেন। চুনীলাল নববিধান সমাজের লোক, খৃস্টভক্ত। প্রতিদিন উপাসনা ও বাইবেল পাঠ করিতেন। অনঙ্গমোহন সুকণ্ঠ ছিলেন, বিভোর হইয়া গান করিয়া আনন্দ পাইতেন। সেসময়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের জন্য সকলেরই মধ্যে একটা আগ্রহ ছিল। আমরা বহুদিন প্রত্যুষে ছাতিমতলায় সমবেত হইয়া কিছু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতাম— দশ মিনিটের মতো। আজকাল কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না যে কোনো শিক্ষক ও ছাত্র সপ্তপর্ণী বেদীতলে ধ্যানস্থ আছেন। কিন্তু সেদিন তাহা অতি সহজ ছিল। মনে আছে একবার প্রকাশচন্দ্র রায় ('অঘোরপ্রকাশ' গ্রন্থের লেখক— বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা) আশ্রমে আসেন। তিনি যেন সর্বদা ভক্তিরসে আপ্লুত থাকিতেন। আমার জীবনে ইঁহার ন্যায় ভক্ত আমার চোখে পড়ে নাই। শান্তিনিকেতন মন্দিরে তিনি উপাসনা করেন; সকলেই তাঁহার ভগবৎ ভক্তিতে তৃপ্ত হন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় যে ব্রাহ্মধর্ম আদর্শে গঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উপদেশাদি দিতেন তাহা যে আদি ব্রাহ্মসমাজীয় ধারার অনুসরণ, শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে-সব মন্ত্র উচ্চারিত হইত, তাহা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের বাণী, যে-সব গান মন্দিরে গীত হইত সেগুলি ব্রহ্মসংগীত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররা সকালে ও সায়াহ্নে যে মন্ত্র সমবেতভাবে আবৃত্তি করে, তাহা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত— এক কথায় এই প্রতিষ্ঠানের আদি-অন্ত-মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ওতপ্রোত হইয়া বিদ্যমান— এই দৃষ্টি হইতেই শান্তিনিকেতনের ধর্ম যে বিচারণীয়— সে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ কবির মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিলেও, তিনি শান্তিনিকেতন মন্দিরে ১৯১০ সনের 'বড়োদিনের' সন্ধ্যায় যিশুখৃস্ট সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।

১৩১৮ সনের ফাল্গুন মাসে (১৯১১, মার্চে) কবি মন্দিরে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ভাষণ দিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন বুদ্ধদেব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সত্যই শান্তিনিকেতনে ধর্মের নবযুগের অভ্যুদয় হইল। ইহার কিছুকাল পরে হজবত মহম্মদ ও ভারতীয় সন্তদের স্মরণ-দিন উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হয়।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি ও আর্টিস্ট। তাঁহার আর্টসত্তার প্রকাশটাই পাশের লোকের চোখকে ধাঁধাইয়া ফেলে। তাঁহার গভীর ধ্যানময় জীবনে আর্ট ছিল সাধনারই অঙ্গ; প্রাকৃতজনের মধ্যে আর্টটাই হইয়া উঠিল প্রবল। শান্তিনিকেতন হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক হইয়াছেন— কিন্তু এখানকার ধর্মাত্মা ব্যক্তি কেহ সুনাম অর্জন করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

৩০

আমি যখন আসি, তখন পথের ধারে খড়ের বাড়িতে হাসপাতাল ছিল— এখন তাহার চিহ্নও নাই। সেই হাসপাতালে বোলপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা বসিতেন। ঔষধাদি দিতেন অন্নদাচরণ বর্ধন— ত্রিপুরা-চাঁদপুরের লোক আর সেবক ছিলেন অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী। অন্নদাচরণ পরে এই কর্ম ছাড়িয়া রেলওয়েতে কাজ লন ও যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করেন। আশ্রমের সহিত দীর্ঘকাল তাঁহার যাওয়া-আসা ছিল।

অনঙ্গমোহন কিছুকাল পরে এই কাজ ছাড়িয়া রথীন্দ্রনাথের জমিদারিতে মোটরবোট, মোটরকার চালাইবার চাকুরি গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি বোলপুরবাসী হইয়াছিলেন।

আমার সমসাময়িক অক্ষয়কুমার রায় আসিয়া এই সেবাকার্যে ব্রতী হন। সেবা ছিল অক্ষয়কুমারের জীবনধর্ম। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মধ্যে কোনো সংক্রামক ব্যাধি হইলে অক্ষয়কুমারই নির্ভীকভাবে সে সেবার ভার গ্রহণ করিতেন। আশ্রমের দক্ষিণে একটি খড়ের চালাঘর ছিল— সেইটিকে বলা হইত সেগ্রিগেসন ওয়ার্ড। সে বাড়ি পরে গৃহী-শিক্ষকদের

বাসের জন্য প্রদত্ত হয়। আমি সপরিবারে ১৯১৯ সন হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত ঐ গৃহে বাস করি। এখন সে-সব গৃহের চিহ্ন নাই।

অক্ষয়কুমার গান্ধীজির ডাণ্ডি যাত্রায় যোগদান করেন। শেষ জীবনে তিনি দেশের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

৩১

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে বুধবার উপাসনা হইত। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকিলে তিনিই উপাসনার কার্য করিতেন। মনে আছে কবি সর্বাগ্রে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রবেশদ্বারের উপর যে বিরাট ঘণ্টা ছিল তাহা নিজে বহুক্ষণ বাজাইতেন; তিনি যেন সকলকে উপাসনা মন্দিরে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। তাঁহার কত ভাষণ যে এখানে প্রদত্ত হইয়াছে— তাহার হিসাব নাই। ছাত্রেরা কিছু কিছু লিখিয়া লইত ও তাহাদের মাসিক পত্রে তাহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিত। পুরাতন হাতে লেখা পত্রিকা 'শান্তি', 'প্রভাত', 'বাগান', 'বীথিকা' অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। পরযুগে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রদ্যোতকুমার সেন, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকেই কবির মন্দিরের ভাষণের শ্রুতলিপি করিয়াছিলেন এবং সেগুলি কবি দেখিয়া পুনরায় অনেক সময় লিখিয়া দিতেন।

৩২

ছাত্রদের জীবনযাত্রা ও দিনচর্চা— যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে অন্ধকার থাকিতে ঘণ্টাধ্বনির সহিত শয্যাত্যাগ করিতে হইত। ঘণ্টার ভার ছিল অধিনায়ক বা কাপ্তানের উপর। আমরা পূর্বে নায়কশাসনপ্রথার উল্লেখ করিয়াছি। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র গৃহ-নায়কদিগকে নিজ নিজ ঘরের ছাত্রদের জাগাইয়া দিতে হয়; ঘণ্টাধ্বনির কয়েক মিনিটের মধ্যে বিছানা গুটাইয়া জলের ঘটি লইয়া ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ায়; সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য 'মাঠে' যায়। তখন আশ্রমে কয়খানিই বা বাড়ি— চারি দিকে মাঠ— অদূরে খোয়াই— মাঠে যাইতে কোনোই অসুবিধা ছিল না। পায়খানা ছিল— তবে তাহা কয়েকজন শিক্ষক ও সামান্য অসুস্থ ছাত্ররা ছাড়া অপরে ব্যবহার করিত না— মাঠে যাওয়া ছিল আবশ্যিক।

প্রাতঃকৃত্য শেষে ঘরঝাঁট ছিল পালাক্রমে ছাত্রদের কর্তব্য— কোনো ভৃত্য ছাত্রাবাসের জন্য নিযুক্ত ছিল না। ঘর-সাফাই-এর পর ছিল ব্যায়াম। এখানে ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত কেহ অনুপস্থিত হইতে পারিত না। ব্যায়ামের জন্য কোনো শিক্ষিত ব্যায়ামবীর ছিলেন

না— শিক্ষকরা করাইতেন। আমি দীর্ঘকাল এই কাজ করি। ব্যায়াম ছিল ডন, বৈঠক এবং দৌড়। কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র মাটিকাটা বা কুস্তি করিত। এখন যেখানে শমীন্দ্রকুটির— সেখানে ছিল একটা ডোবা। প্রাক্‌কুটির নির্মাণ করিবার সময় মাটি ঐ স্থান হইতে কাটিয়া আনা হয়। সেখানে বিনোদ নামে একটি সুস্থ সবল ছাত্র আপন মনে একটি ইঁদারা কাটা শুরু করে।

ব্যায়ামের পরে স্নান; কী শীত, কী বর্ষা— প্রাতঃস্নান ছিল সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। স্নান-অনিচ্ছুক ছাত্রদের বড়ো ছেলেরা চ্যাংদোলা করিয়া ইঁদারাব পাশে আনিয়া জোর করিয়া মাথায় জল ঢালিয়া দিত। স্নানের পূর্বে ভালো করিয়া সরিষার তেল মর্দন করা রীতি ছিল। প্রাতে দাঁত মাজিবার জন্য খড়িগুঁড়া থাকিত— তাহাই সকলে ব্যবহার করিত। পেস্ট প্রভৃতি অজ্ঞাত ছিল।

গ্রীষ্মকালে জলাভাব হইলে কঠোরভাবে জল নিয়ন্ত্রণ করিতে হইত। মনে আছে জলাভাবের সময়ে সকলকেই ছয় মগ জলে স্নান দুই মগ-এ কাপড় কাচা শেষ করিতে হইত।

স্নানের পর উপাসনা। ছাত্ররা নিজ নিজ আসন লইয়া মাঠের মধ্যে, বাগানের ভিতর বসিয়া যাইত। বৃষ্টি ব্যতীত ঘরের মধ্যে বসিবার নিয়ম ছিল না। ছাত্ররা কীভাবে উপাসনা করিবে— এ-সব বিষয়ে কোনো শিক্ষা দেওয়া হইত না। পূর্বে গায়ত্রী মন্ত্র তাহাদের ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। কিন্তু কবি দেখিয়াছিলেন যে সবিতার ধ্যান বালকদের পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি জানিতেন বাহিরের প্রকৃতির স্পর্শ হইতে তাহারা যাহা পাইবে— তাহাই তাহাদের সম্বল হইবে।

ব্যক্তিগত উপাসনার পর সমবেত উপাসনা। সকলে গোলাকার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া 'ওঁ পিতা নোহসি' মন্ত্র ও সন্ধ্যায় 'ওঁ যো দেবোহগ্নৌ' মন্ত্রটি সমস্বরে আবৃত্তি করিত। ব্যক্তিগত উপাসনার সময় শিক্ষকগণ নিজ নিজ আসনে স্তব্ধ হইয়া বসিতেন; এবং সমবেত উপাসনায় যোগ দিতেন। সন্ধ্যার উপাসনার সময় আশ্রম নিস্তব্ধ হইত, এমন-কি, রান্নাঘরের পাচক-ভৃত্যরাও মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলিত।

উপাসনাশেষে জলখাবার। চা, ছাত্ররা পাইত না। তবে শিক্ষকদেব মধ্যে অনেকেই চা পানে অভ্যস্ত বলিয়া তাঁহাদের জন্য চা দেওয়া হইত। শরৎকুমার রায় ছিলেন পরম চা-বিলাসী। চা তৈয়ারি কবিতে ও বণ্টন করিতে তাঁহার পরম আনন্দ। সকালে বিকালে জলখাবারেব পর রান্নাঘরের সংকীর্ণ বারান্দায় এই চা-এর মজলিশ জমিত। সকালে ক্লাস থাকিত, তাই বেশিক্ষণ বসা হইত না— বিকালে আসর জমিত ভালো। চা-এর সব-কিছুই বিদ্যালয় হইতে সরবরাহ হইত— চা-ক্লাবের ট্যাক্স তখনো ধার্য হয় নাই।

১৯১৫ সনে শরৎকুমার আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলে চা-এর মজলিশ গিয়া জমিল দিনেন্দ্রনাথের ঘবে— কখনো বেণুকুঞ্জে, কখনো দ্বারিকে। এমন-কি, 'সুরপুবী'তে দিনেন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন, আমরা সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করিতাম। দিনেন্দ্রনাথের চা-এর সভা ছিল যথার্থ মজলিশ। বহিরাগত অতিথিদেরও এখানে আনা হইত। কত সময়ে নানাবিষয়ের আলোচনা চলিত।

সকালে জলখাবারের পর সাতটার সময়ে ক্লাস বসে, এগারোটা পর্যন্ত। এই চার

ঘণ্টায় ছয়টি পর্ব-মাঝে দশ মিনিট বিরাম। এখানে স্কুল বাড়ি নাই— বৃক্ষতলে ছাত্ররা পড়ে। শিক্ষক আসনে বসেন— তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে ছাত্ররা। এখানে প্রত্যেক শিক্ষকের নির্দিষ্ট বৃক্ষতল আছে— তিনি সেখানে উপবিষ্ট— ছাত্ররা তাঁহার কাছে আসে বিদ্যালাভের জন্য। এক ক্লাস হইতে অন্য ক্লাসে যাইবার জন্য তিন মিনিট সময় থাকিত।

আজকাল পাঠভবনের ছাত্ররা পুরাতন প্রথানুসারে গাছতলায় ক্লাস করে; কিন্তু অন্য বিভাগে গৃহাভ্যন্তরে অধ্যাপনার ব্যবস্থা শুরু হইয়াছে।

বৃক্ষতলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পর্ব শেষ হইলে মধ্যাহ্নভোজনে যাইত ছাত্ররা শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে। খাওয়া ছিল নিরামিষ। খাওয়ার পর ছাত্ররা নিজ নিজ বাসন নিজেরা মাজিত ও নিজ নিজ ঘরে লইয়া যাইত।

বাসন মাজা হইয়া গেলে ছেলেরা নিজ নিজ গৃহে যায় ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। তার পর পড়ে সিটে (seat) বসিবার ঘণ্টা। তখন সকলে নিজ নিজ আসনে বসিয়া ক্লাসের টাস্ক বা অন্য পড়াশুনা করে। এই সময়ে নায়কের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো ঘরের ছাত্র আসিতে পারে না। ঘরের মধ্যে একাসনে দুইজন ছাত্র বসা নিষিদ্ধ ছিল। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই এক বা দুইজন শিক্ষক থাকেন; তাহাদের কাছে ছাত্রবা প্রয়োজনমতো সাহায্য পায়।

দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টা ক্লাস হয়। ক্লাসে যাইবার পূর্বে ছাত্রদের সকালের স্নানের কাপড়-চোপড় রৌদ্র হইতে উঠাইয়া ঘরে যথাস্থানে রাখিতে হয়। কিন্তু কেহ কেহ ভুলিয়া গিয়া সময়মতো তোলে না। গৃহনায়ক সেগুলি সংগ্রহ করিয়া 'নিলাম-বাক্সে' জমা দেয়। বৈকালে সাধারণ লাইনে যখন ছাত্রদের নাম-ডাক হয়, তখন সেখানে সংগৃহীত কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য জিনিস সকলকে দেখানো হইত। অপরাধীরা অধোবদনে সর্বজনসমক্ষে ভুলের শাস্তি এইভাবে গ্রহণ করিত। বার বার একই অপরাধ করিলে, বিচারসভায় তাহাদের ডাক পড়ে।

ক্লাসের পর ঘরঝাঁট, জিনিসপত্র গোছানোর কাজ; তার পর জলখাবারের ঘণ্টা।

আশ্রমে তখন একটি কড়া নিয়ম ছিল; কোনো অভিভাবক নিজ ওয়ার্ডের জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য পাঠাইতে পারিতেন না; যদিই-বা পাঠাইতেন, তবে তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য অথবা গৃহস্থিত সকল ছাত্রদের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পাঠাইতে হইত। মনে আছে— নাট্যঘরে থাকি, একজন অভিভাবক এক টিন হান্টলি পামারেব বিস্কুট পাঠাইয়াছিলেন— তাহা ঘরের সকল ছাত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। খাবারঘরে কাহাবো জন্য বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইত না— শিক্ষকদেরও সাধারণ নিয়ম মানিতে হইত।

তবে কোনো ছাত্র অসুস্থ হইলে বা কাহারো ওজন কমিলে, তাহার জন্য হাসপাতালে বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা হয়।

বৈকালের জলখাবার খাওয়া হইয়া গেলে— সকল ছাত্র লাইব্রেরির সম্মুখে প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সেইখানে নাম-ডাক, যাহা-কিছু ঘোষিতব্য তাহা ঘোষিত, 'নিলাম-বাক্সে'র জিনিস সনাক্ত ও প্রত্যাবর্তনাদি হইত। ইহার পর ছাত্ররা খেলিতে যায়। ফুটবল খেলা ছাড়া কতকগুলি দেশীয় খেলাও প্রচলিত ছিল। খেলার সরঞ্জাম ছাত্র ও শিক্ষকদের হেফাজতেই থাকে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আমেরিকা হইতে আসিয়া এখানে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন, তাহা বলিয়াছি। তিনি ছাত্রদের লইয়া ড্রিল, ফায়ার ড্রিল করাইতেন। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে

ছাত্রদের yell বা চিৎকার ধ্বনি তিনি প্রবর্তন করেন 'রা-কা রাকা চাকা বোম্-ই-য়া ইয়া' ইত্যাদি শুনিতে ভালোই লাগিত।

ক্রীড়ায় যে সব ছেলেই যাইত, তাহা নহে; কয়েকজন ছাত্র বাগান করে, কয়েকটি ছাত্র গ্রামে পড়াইতে যায়। সাঁওতাল গ্রাম ও ভুবনডাঙায় এই শ্রেণীব দুইটি বিদ্যালয় ছিল। এই শিক্ষাদান কার্যে পরম উৎসাহী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ ও মি. পিয়ার্সন। আমিও বহু বৎসর ভুবনডাঙার নৈশ বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলাম। সে-সব বিদ্যালয় এখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

খেলার পর বড়ো ছেলেরা নিজে কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করে; অন্যরা হাত-পা ধুইয়া বিশ্রামান্তর সান্ধ্য উপাসনার জন্য প্রস্তুত হয়।

সান্ধ্য উপাসনার পর বড়ো ছাত্ররা ঘরে বসিয়া পড়ে। অন্যরা যায় শিক্ষকদের নিকট গল্প শুনিতে। এই পর্বকে বলা হইত 'বিনোদন পর্ব'। আমার মনে আছে, আমি 'আইভ্যানহো,' 'লে মিজারেবল্স', 'লিসবেথ' ও ওলন্দাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, নেপোলিয়নের জীবনী প্রভৃতি বলিয়াছিলাম। জগদানন্দ রায় গল্প বলিতে ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার গল্পের দিনের জন্য ছেলেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। তিনি কাঠেব একটা বড়ো টেলিস্কোপ বাহির করিয়া মাঝে মাঝে ছাত্রদের গ্রহ ও চাঁদ দেখাইতেন। নগেন্দ্রনাথ আইচ, অজিতকুমার, ক্ষিতিমোহন সেন সকলেই খুব ভালো গল্প বলিতে পারিতেন।

রাত্রের আহারাদি সাড়ে আটটার মধ্যে শেষ হইয়া যাইত।

কিছুকাল পরে সকালে ও রাত্রে বৈতালিক প্রথা প্রবর্তিত হয়। সকালের বৈতালিক হইতে রাত্রের বৈতালিক জমিত ভালো।

আহারের পর ছাত্রদের বিচারসভা বসে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে সারাদিন যে-সব অভিযোগ জমিয়া উঠে তাহার বিচার হয় এইখানে। সে সভায় অধিনায়ক, গৃহনায়কগণ ও ছাত্রপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকে— তাঁহারাই বিচারক। বিচারকগণ রীতিমতোভাবে সভার বহিতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ ও কী শাস্তিবিধান করা হইল, তাহার প্রতিবেদন বা রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। নিয়মলঙ্ঘনকারীদের মুখ বুজিয়া সে শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। ছাত্রদের উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ বিশ্বাস; তাহাদের আত্মসম্মান ও আত্মশাসনবোধ জাগ্রত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য পরীক্ষার সময়ে 'গার্ড' দেওয়ার প্রথা ছিল না। ছাত্ররা যদৃচ্ছাক্রমে যথাতথাস্থানে বসিয়া প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিয়া নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষকের হস্তে দিয়া যাইত। কোনো কোনো ছাত্র অভ্যাসদোষে অসৎপন্থা অবলম্বন করিলে বিচারসভা তাহাদের উপর কঠোর শাস্তি বিধান করিত। দৈহিক শাস্তি অর্থাৎ প্রহারাদি করিবার ক্ষমতা সভার ছিল না। তাহারা সামাজিক শাস্তি দিত— যেমন পঙ্‌ক্তি হইতে পৃথকভাবে ভোজন, সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, বৈকালে খেলা বন্ধ, সাধারণ লাইনের সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা ইত্যাদি।

৩৩

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন ১৯০৫ সন হইতে দেশব্যাপী হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের মনকে ইহার উত্তেজনা স্পর্শ করে। ১৯০৯-এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নানা পথে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত না থাকিলেও গান লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, মিছিলের পুরোভাগে চলিয়া, জাতীয়শিক্ষা-পরিষদের সহিত যুক্ত হইয়া এই আন্দোলনকে নানাভাবে উত্তেজিত, কখনো শমিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির সহিত বহুবার জড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যায়তনকে কখনো রাজনীতির মধ্যে টানিয়া লইয়া যান নাই।

১৯০৯ সনে রাখীবন্ধন-দিন বা ৩০ আশ্বিনের দিনটি স্মরণ করিয়া তিনি অজিতকুমারকে যে পত্র লেখেন— তাহাতে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের মূলগত আদর্শ অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়—

'সাধারণত আমাদের দেশে যে ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে— আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করি নে— বস্তুত সে ভাবটি ও জায়গার পক্ষে অসংগত।.. আমি কোনো সংকীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না। আমার বাখীবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে রাখীতে আত্মপর, শত্রুমিত্র, স্বজাতি-বিজাতি সকলকেই বাঁধে, সেই রাখীই শান্তিনিকেতনের রাখী... বর্তমান ভাবতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিকূলতা আছে, এ রাখী তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে, আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা বারংবার, সহস্রবাব সকলকেই প্রীতির বন্ধনে বাঁধবাব চেষ্টা করব— এইটেই আমাদের একটা দায়— বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিম, রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার ভিতবেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করিবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে।... যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব— আমাদের উপর এই আদেশ আছে।... ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, আমরা তাদের কাউকে শত্রু বলে দূরে ফেলতে পারব না।... রাখীবন্ধনের... দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই ঐ বড়োদিনে বুদ্ধ, খৃস্ট, মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না— কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।

'...আমাদেব আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকাল স্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয়, তা হলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে।... আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে; যিনি শান্তম্ শিবম অদ্বৈতম্ তাঁকে যেন কোনো দিনই কোনো মতেই আমরা না ভুলি— তাঁর চাইতে আর কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি।...'

শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক রূপটা দেখিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। তিনি বিদ্যালয়ের দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে যে পুস্তিকাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই বিদ্যালয়ের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে উহা কী হইতে পারে সে

সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অজিতকুমারের গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি— 'অনন্ত আকাশকে বাদ দিয়া যদি ধূলিকণাকেই দেখি, তবে তখন সে ধূলির আর-কোনো সৌন্দর্য থাকে না; কারণ অনন্তের মধ্যেই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য। তেমনি এই সাধনার অন্তর্গত করিয়া যাহা লইব, কিছুই আর অশান্তির কারণ হইবে না। জ্ঞানানুশীলন যদি লই, তবে তখন আশ্রম আর বিদ্যালয় হইয়া পড়িবে এ ভয় থাকিবে না। যদি এমন হয় যে, এখানে ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষারও সংস্থান হইবে, ক্রমে নানা বিদ্যালয়ের যোগে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিবে, এখানে নব নব জ্ঞানের বিকাশ দেখা দিবে— হোক— সমস্তই ব্রহ্মসাধনার অন্তর্গত হইয়া থাকিবে; সমস্তের তলে তলে জাগিবেন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।...

'এই আশ্রমে আজ আমাদের কতটুকু জ্ঞানানুশীলন প্রকাশ পাইল; কিছুই নয়। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, এখানে দেশ-বিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে— যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্য লাভ করিবে। সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে ব্যাখ্যাত হইবে।

'তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এ দেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত, এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে; এইখানে. . সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্য-সকল উদ্ধার করিবেন, উদ্ভাবনী শক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্ভাবন করিবেন। সেই মানসলোকের পরিপূর্ণ জ্ঞানতপস্যার সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আজ দেখো।

'সর্বভূতে আপনাকে দেখা আশ্রমের আদর্শ— এখানে এমন পরিবার-সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নবর্তী হইয়া কাজ করিবে; যাহাদের প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর প্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীটপতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে; যাহারা স্বাধীন হইবে, যাহারা কোনো মিথ্যার হাতে ধরা দিবে না, কোনো কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না, যাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্মে আচরণ করিবে।...

'এখানে যে মহাপুরুষ ঐ সপ্তপর্ণদ্রুমতলে তপস্যা করিয়াছিলেন তিনি এই আশ্রমের মধ্যে একটি অক্ষয় ব্রহ্মাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কেমন নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই; সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানে কাজ হইবেই।'

আমাদের মনে হয় শান্তিনিকেতনের মূলগত আদর্শ এখানে অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ধর্মস্থান এবং অধ্যাত্মজীবনের আলোকেই ইহাকে দেখিতে হইবে। নতুবা ইহা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরুক্তি মাত্র হইয়া পথভ্রষ্ট হইবে। কালস্রোতে ধর্মের অর্থ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সংজ্ঞার পরিবর্তন হইতেছে এবং হইবে ইহাই জীবনধর্ম। তবে গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাসাগর-সংগম পর্যন্ত একই জলধারা যেমন প্রবাহিত হইতেছে, আশ্রম-মধ্যেও সেই একই ব্রহ্মচেতনা তেমনইভাবে কার্যকরী হইবে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ইতিহাস যদি কেবল একটি বোর্ডিং স্কুলের বিবর্তন-কথা হইত, তবে ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার কোনোই প্রয়োজন হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্র,

ভাষণ, প্রবন্ধ -মধ্যে 'আদর্শ' শব্দটি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। কবির আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'র মধ্যে। কবির প্রেরণায়, তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী আদি দেখিয়া শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই আদর্শ হইল এই আধ্যাত্মিক জীবনযাপন অর্থাৎ উপাসনা ও ধর্মগ্রন্থপাঠ— অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত জীবন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী পাঠকরা অবগত আছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি বিশেষভাবে আঘাত পান। তাহার মৃত্যুর একবৎসর পরে তিনি প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকিতে মন্দিরে গিয়া বসিতেন। সে সময়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের কয়েকজন তাঁহার নিত্য উপাসনায় যোগ দিতেন। ১৯০৮ সনের অগ্রহায়ণ হইতে ১৯০৯-এর এপ্রিল (বৈশাখ, ১৩১৬) পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন তিনি মন্দিরে ভাষণ দিতেন। সেইগুলি 'শান্তিনিকেতন' নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইত। এই বইগুলি ছিল অনেকের অধ্যাত্মজীবনের নিত্য সহায় ও সম্বল।

৩৪

১৯০৮ সনের পূজাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে 'একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট্ট চারা আপনিই গজিয়ে' উঠে। কবি লেখেন 'অনেকদিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভয়ে এগোই নি। ঠাকুর যখন আপনিই ঘরে এসেছেন, পূজা না করে তো আর নিষ্কৃতি নেই।'

এই বালিকা বিদ্যালয় 'আপনি গজিয়ে' উঠার কারণ ছিল। কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহের পরেই জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি কৃষিবিদ্যা অর্জনের জন্য আমেরিকা চলিয়া যান। মীরার শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন। নিচু-বাংলায় হেমলতাদেবীর কাছে থাকে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃহীন বালিকাকন্যা সাগরিকা— সে আসে বিদ্যালয়ে পড়িতে। লাবণ্যলেখা নামে একটি বালবিধবা রবীন্দ্রনাথকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হন— তাঁহারও শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন।

ক্ষিতিমোহন সেন আশ্রমের কাজে যোগদানের পর, তাঁহার শ্বশুর বিহারের এক্‌জিকুটিভ ইঞ্জিনিয়র মধুসূদন সেন তাঁহার পুত্রদের ও এক কন্যা স্নেহলতাকে (টুলু) এখানে পাঠাইলেন। গয়ার ইঞ্জিনিয়র তারকচন্দ্র রায়ের পুত্রেরা এখানকার ছাত্র; তাঁহার কন্যা প্রতিভা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্রের কন্যা সুধা এখানকার মেয়ে বোর্ডিং-এ আসিল। ক্ষিতিমোহনের আত্মীয় ঢাকার প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র ও আত্মীয়রা এখানে ছাত্র ছিল। তিনি তাঁহার দুই কন্যা হিরণবালা ও ইন্দুবালাকে ছাত্রীরূপে পাঠাইলেন। এইভাবে নিজেদের জানাশোনার মধ্য হইতে কয়টি ছাত্রী লইয়াই বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন হইল। কবি তাঁহার দেহলিভবন ইহাদের জন্য এবং নূতন বাড়ি শিশুদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। তিনি 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দোতলায় আশ্রয় লইলেন।

মেয়েদের দেখাশোনা করিতেন প্রথমদিকে অজিতকুমারের জননী সুশীলাদেবী। অজিতকুমারের স্বল্পবেতনে তাঁহার মাতাকে অন্যত্র রাখা কষ্টকর হওয়ায় কবি তাঁহার থাকিবার

জন্য নূতন বাড়িতে একটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

ইতিমধ্যে মোহিতচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার বিধবা পত্নী সুশীলা সেন দুইটি বালিকা কন্যা লইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। কবি ইঁহার উপর বোর্ডিং-এর বালিকাদের দেখিবার ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহাকে দেহলির উপরতলা ছাড়িয়া দেওয়া হয়; নীচে থাকিত মেয়েরা।

মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একত্র পড়ে। ক্লাসে পড়া ছাড়া ছাত্রদের সঙ্গে আর-কোনো সম্বন্ধ ছিল না। সে সময়ে পর্দাপ্রথা পুরোপুরি না থাকিলেও কতখানি ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে একটি ঘটনা হইতে। রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর নববধূ প্রতিমাদেবী ও আশ্রম বালিকারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করে। এই অভিনয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও দেখিতে পায় নাই, আমরা তো দূরের কথা। শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় অভিনয় হয়। পৌষ উৎসবের মেলায় ভ্রমণ করিতে বা বাজি পোড়ানো দেখিতে মেয়েরা পাইত না। সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর এই মেয়েদের বাজি পোড়ানো দেখার ব্যবস্থা করেন। মহর্ষির সময়ের একটা বিরাট চার-চাকার শকট ছিল; তার মধ্যে মেয়েদের ভরিয়া আমরা ঠেলিতে ঠেলিতে মন্দিরের কোণায় গাড়ি লইয়া যাইতাম। শকটের ঝিলিমিলি দিয়া মেয়েরা বাজি দেখিত।

সহশিক্ষার পরীক্ষা বাংলাদেশে এই বোধ হয় প্রথম। কিন্তু সহশিক্ষার মধ্যে যে কত জটিল প্রশ্ন জড়াইয়া আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনে অস্পষ্ট ছিল; অথবা কবি ভাবিতেন যে যাঁহাদের উপর কর্মের দায়িত্ব আছে, তাঁহারা এই কার্যে যোগ্যতম ব্যক্তি।

সুশীলাদেবীর ছাত্রীনিবাস চালনার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কঠোর নিয়মাদি না থাকায়, নানা সমস্যা দেখা দিল। অবশেষে সুশীলাদেবীকে এই কর্ম হইতে বিদায় দেওয়া হয়, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সুশীলাদেবীর পর লেখকের জননী গিরিবালাদেবীর উপর এই ছাত্রীনিবাস পরিচালনার ভার অর্পিত হয় (জুন, ১৯১০)। কিন্তু তিনিও দেখিলেন যে সমাজসৌজন্য-সংগত নিয়মাদি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইবার বাধা অনেক। অতঃপর ১৯১০ সনের পূজার ছুটির পূর্বে বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার দশ বৎসর পরে, বিশ্বভারতী-পর্বে নারী বিভাগ খোলা হয়।

৩৫

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সংগীত ও অভিনয় আদিযুগ হইতেই সমাদৃত। ১৯০৮ সনের অগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ শরৎকালের উপযুক্ত কয়েকটি গান রচনা করেন ও ছাত্রদের অভিনেয় নাটক 'শারদোৎসব' লিখিয়া ঐ গানগুলি তাহার অন্তর্গত করিয়া দেন। পূজাবকাশের পূর্বে 'শারদোৎসব' নাটক প্রথম অভিনীত হয় নাট্যঘরে। এই গৃহটি অল্পকাল পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

এই নাট্যঘরে প্রায় বিশ বৎসর নানা নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলির মধ্যে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দিনেন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার

প্রমুখ প্রায় সকল শিক্ষকই নাটকাভিনয়ে ছাত্রদের সঙ্গে যোগদান করিতেন। কখনো-বা শিক্ষকরাই অভিনয় করিতেন, ছাত্ররা হইত সহায়। তখন নাট্যমঞ্চ সাজানো, অভিনয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিজেরা করিতেন। সে যুগে বিজলীবাতি ছিল না। ডিট্‌মারের ঝুলানো আলো ও ডিজ্‌লণ্ঠন দ্বারা আলোকসজ্জা হইত। সেগুলি 'শান্তিনিকেতনে' দ্বিপুবাবুর কাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। মনে আছে ফুট্‌লাইট হইত রাস্তার ল্যাম্প্‌পোস্টের আলো। সামনে একটা পর্দা টাঙাইয়া ড্রপ্‌সিন ফেলা থাকিত। গাছপালা, শরপাতা, কাশফুল, পদ্ম, কেয়া যে ঋতুতে যাহা পাওয়া যাইত সেই-সব দিয়া ভিতর সজ্জা করা হইত। মুকুল দে তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। শ্রীমান একটা বড়ো চাদরের উপর শিবের তাণ্ডব নৃত্যের একটা ছবি আঁকেন— সেটা ড্রপ্‌সিনরূপে বহু বৎসর ব্যবহৃত হয়। স্টেজ ছিল নাট্যঘরের পূর্বদিকে— মেঝে হইতে দুই ইট উঁচু; পরে পশ্চিমদিকে অনুরূপ বাঁধানো স্টেজ হয়। পাশের ঘর হইত গ্রীনরুম। এই নাট্যঘরের চিহ্ন এখন নাই।

৩৬

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শাসনব্যবস্থা ছিল কঠোর, নিয়মানুবর্তিতা অলঙ্ঘনীয। এই অবস্থায় ছাত্রদের জীবনে ও মনে কীভাবে আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় সেইটিই হইয়াছিল কবির প্রধান প্রশ্ন। আনন্দহীন সংযম বিচারহীন আচার পালনের ন্যায় নঞর্থক; উভয়ই মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে। অভিনয়মঞ্চে ও ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে বালককে সমষ্টির সহিত একযোগে, সংহত আবেগে কার্য করিতে হয়— উভয়ক্ষেত্রে কায়িক ও মানসিক সংযম অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্রমবিকাশমান আদর্শে সৌন্দর্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টি শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। তবে সৌন্দর্যচর্চার অর্থ বিলাসিতা নহে— পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন ও পরিবেশ সৃষ্টিই যথার্থ সৌন্দর্যচর্চা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিযুগের ছাত্ররা 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করে। নারীর ভূমিকা ছাত্ররাই গ্রহণ করে। ছাত্ররা 'বালক' পত্রিকা হইতে 'হাস্যকৌতুকের' ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি প্রায়ই অভিনয় করিত; 'হাস্যকৌতুক' তখনো গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই।

ঋতু উৎসব আরম্ভ হয় আরো পরে। ১৯০৭ সনের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ও তাঁহাব সমবয়সী ছাত্ররা হল ঘরে বা প্রাক্‌কুটিরে 'বসন্ত উৎসব' নাম দিয়া এক অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করেন। সেই বৎসর পূজার সময়ে শমীন্দ্রের মৃত্যু হয়।

পর বৎসর বর্ষাকালে (১৯০৮ জুলাই) নবাগত শিক্ষক ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরের আগ্রহে ও প্রযোজনায় বর্ষা উৎসব হইল। তাঁহারা পর্জন্যদেব সম্বন্ধে বৈদিক উক্তিগুলি চয়ন করিয়া দেন। ছাত্ররা সেগুলি আবৃত্তি করে। ইহাই আশ্রমের আদি বর্ষা উৎসব। শারদোৎসবের সময় হইতেই যথার্থ ঋতু উৎসবের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। সেই হইতে প্রায় প্রত্যেক ঋতুতেই উৎসবেব আয়োজন হয়।

৩৭

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বহু বৎসর ক্লাস বা শ্রেণী ছিল না। সাধারণত স্কুলের একটি ক্লাসে কতকগুলি ছাত্র পড়ে; কর্তৃপক্ষ ধরিয়া লন ঐ ক্লাসের সকল ছাত্র সকল বিষয়ে একই প্রকার মান (standard) রক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখা যায় কোনো ছাত্র ইংরেজিতে ভালো, বাংলায় খাটো, গণিতে পাকা, ভাষাবোধে কাঁচা। সেইজন্য এই বিদ্যালয়ে 'বর্গ' বা Group প্রথা ছিল। একই ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা ও পারদর্শিতা অনুযায়ী পৃথক বর্গে পড়িতে যাইত। যাহারা পিছাইয়া আছে তাহাদের জন্য পৃথক কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল এবং প্রাক্-মাত্রিক ক্লাসের পূর্বে তাহাদিগকে সকল বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। অবশ্য তখন এই কোচিং-এর জন্য ছাত্রদের কাছ হইতে পৃথক টাকা লওয়া হইত না— ইহা শিক্ষকদের নিত্য কর্তব্য-অন্তর্গতই ছিল। ছাত্রদের হাত হইতে টাকা লইয়া পড়াইতেছি— এ কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পর্ব হইতে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও পঠনপাঠন বিধির যে-সব পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহাও শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-কৌতূহলীদের জানিবার বিষয়। ইহার সহিত অধ্যাপকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিদ্যালয়ের আরম্ভভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করাইবার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। মোহিতচন্দ্র সেন ১৯০৪ সনে আসিয়া খুব বিস্তারিতভাবে পঠনপাঠনবিধি প্রণয়ন করেন। তখন হইতে অল্প বয়স্ক ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাবিধি নূতনভাবে প্রবর্তনের জন্য কবি 'ইংরাজি সোপান' প্রথম খণ্ড রচনা করেন। এই কার্যে প্রথম দিকে মোহিতচন্দ্র ও পরে অজিতকুমারের সহায়তা পান। ১৯০৪ সনে বিদ্যালয় যখন শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসে, তখন 'ইংরাজি সোপান' প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল ; দ্বিতীয় খণ্ড হয় কিছুকাল পরে। এই বই দুটিতে ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষরীতি (Direct method) অবলম্বিত হয়। এতকাল ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্যারিচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অব রিডিং'— যাহা স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে 'ফার্স্ট বুক' নামে চলিত তাহাই পাঠ্য ছিল। এই বই-এর আশুতোষ দেবের অর্থপুস্তক বালকদের কিনিয়া পড়িতে হইত। আমার যতদূর মনে হয় ভাবতীয় বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষরীতি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। অবশ্য মিশনারি স্কুলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালীন কোচবিহার রাজকলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই গ্রন্থগুলি ('ইংরাজি সোপান') দেখিয়া কবিকে যে পত্র দেন, তাহাতে তিনি বলেন— 'আমি যত দূর জানি, এই পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুংগত— Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষা-পুস্তক প্রণেতাগণ, এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনাব উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী। এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথ প্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।

'আজ দুই-তিন বৎসর হইল আমার Note on University Reforms-এ আমি নিম্ন শ্রেণীতে ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, উদ্ধৃত করিতেছি—

'The way in which English is taught in the lower classes, is faulty in the extreme. English should be taught in the same way as French, German

and other continental languages are now taught. The methods of Otto, Ollendorf and Saner are real improvements on the old classical device of grammar-grinding and written excercises. We learn a language in short, more by learning it spoken than by artificial exercises in syntax or idiom, conversation, questions and replies to questions as in the Robinson lessons of the elementary German school. Constant and familiar use of certain simple forms of clauses and phrases, the sentence taken as the unit of speech rather than the word, the co-operation of the tongue and the ear in reciting page after page, these are the surest, the most rapid and the most powerful means of learning a foreign language. They are the conscious imitation of the unconscious processes by which we learn our vernacular in infancy.'

ব্রজেন্দ্রনাথেব এই উদ্ধৃত অংশের সহিত যদি কেহ 'ইংরাজি সোপান'গুলি দেখেন তো বুঝিবেন যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারেই বইগুলি লিখিত।

ইংরেজি ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল হইতেই চেষ্টান্বিত দেখা যায়। আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত বাল্মীকি-রামায়ণ-অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহায়তায় ১৮৯৬ সনে যে 'সংস্কৃত প্রবেশ' পুস্তক লেখেন, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া আসিলে কবি তাঁহাকে নূতনভাবে সহজে সংস্কৃত-শিক্ষাদানের জন্য বই লিখিতে উৎসাহিত করেন। পরে রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিতকে দিয়া রামায়ণের সংক্ষিপ্ত এক সংস্করণ সম্পাদন করান। কবি স্বয়ং নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা কীভাবে সংকলিত হইবে।

বাংলা-শিক্ষাদান বিষয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভ পর্ব হইতে বিশেষ দৃষ্টি প্রদত্ত হয়। ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁহার বাংলাভাষা শিক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন। কবি কতবার ভাবিয়াছেন যে দশ-বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষাই একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের চাপে, অভিভাবকদের চাহিদায়— সে পরীক্ষা এই বিদ্যালয়ে করিতে সাহস পান নাই।

কবি বিশ্বাস করিতেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু ও বালকদের সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজন। সেইজন্য এখানে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানাদি বাংলাভাষায় পড়ানো হইত। অথচ ইংরেজিভাষার প্রতিও যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের দশ বৎসর পূর্বে তিনি "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে বাংলার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা ও প্রচারের জন্য যে সুপারিশ করেন, তাহার পরীক্ষা নিজ বিদ্যালয়ে আরম্ভ করেন।

বাংলাদেশে এমন দশা একদিন ছিল, যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাংলাভাষা পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল না; কেবল মেয়েরা বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলা বিকল্প বিষয় রূপে গ্রহণ করিতে পাইত। ছেলেরা সে অনুমতি বহু কষ্ট ও তদবির না করিলে লাভ করিতে পারিত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থায় ১৯১০ হইতে বাংলা আবশ্যিক পাঠ্য ও পরীক্ষার বিষয় হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতে নানাভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে মনোযোগী হন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে সরকারি টেক্সট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত পুস্তকই কেবল পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইত না। এখানে নীচের শ্রেণীতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই, 'ছেলেদেব বামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুরাণ', কুলদারঞ্জন রায়ের 'পুরাণের গল্প' প্রভৃতি পড়ানো হইত। ইংরেজি ক্লাসে পাঠ্য ছিল, কারণ ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার সময় গ্রীক পুরাণকথা জানা না থাকিলে, তাহা সহজ বোধগম্য হয় না। শিশুবিভাগে কবিতার বই পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'। এই কাব্যের মধ্যে যেগুলি শিশুর উপযোগী সেইগুলিই ছেলেরা পড়িত। এছাড়া সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছুটিব পডা', 'কথা ও কাহিনী', 'স্বদেশ' নামে কাব্যখণ্ড (এখন পৃথক খণ্ড নাই), নাট্যকাব্য, গদ্যপ্রবন্ধ 'সমাজ', 'চারিত্রপূজা' ধাপে ধাপে পড়ানো হইত। অধ্যাপনার সময়ে যথাযথভাবে পাঠ ও আবৃত্তি করার দিকে শিক্ষকরা দৃষ্টি রাখিতেন। রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি বিষয়ে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন— কারণ অনেকেই আবৃত্তি ও 'আব্রিত্তি'র মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারেন না।

বাংলাভাষা চর্চার জন্য ছাত্ররা অনেকগুলি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে। 'শান্তি' বড়োছেলেদের পত্রিকা, 'প্রভাত' শিশুদেব ও মধ্যবিভাগের ছিল 'বাগান' ও 'বীথিকা'।

শিক্ষকরা ছিলেন পত্রিকা পরিচালনায় সহায়ক। ইংরেজি বই পড়িয়া তাহার চুম্বক বা অনুবাদ করানো, কীটপতঙ্গাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কার্যে উৎসাহদান প্রভৃতি তাঁহারা করিতেন। কিন্তু ছাত্ররাই ছিল এই-সব কাজের পুরোভাগে। এই-সব পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্ররা আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজিয়া পাইত। অনেক সময়ে ছাত্ররা বুধবার দিন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ভাষণ দিতেন, তাহাও নিজ সাধ্য ও বুদ্ধি -মতে লিখিয়া লইত এবং পত্রিকায় প্রকাশ করিত।

শান্তিনিকেতনের সকল কাজকর্ম বাংলাভাষায় চলিত। সভা-সমিতির প্রতিবেদন, বিজ্ঞাপন, অভিভাবকদের সহিত পত্রব্যবহাব, ক্লাসের ছাত্রদেব সম্বন্ধে মন্তব্যলিপি, হিসাবপত্র সবই বাংলায় লিখিত হইত। ১৯২১ সনের পরেও কিছুকাল অধ্যাপকমণ্ডলীর কাজকর্ম বাংলায় চলে, তার পর যেমন-যেমন বিশ্বভারতী সুপ্রতিষ্ঠিত ও উহার পরিচালনব্যবস্থা কেন্দ্রীত হইতে আরম্ভ করিল— বাংলাভাষার ব্যবহারও সংকীর্ণ হইয়া আসে; ইংরেজি-ভাষার মাধ্যমেই কাজকর্ম শুরু হয়। ইহাকে অনিবার্যই বলিব। কারণ ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল বঙ্গদেশের বিশেষ প্রতিষ্ঠান; কিন্তু 'বিশ্বভারতী' নিখিল ভারত তথা জগতের বিদ্যায়তনরূপে গঠিত হইবার দিকে চলিতেছে, সে ক্ষেত্রে ইহার কাজকর্ম সর্বলোকের বোধগম্য ইংরেজি-ভাষার মাধ্যমেই প্রচলিত হইল।

এখন বিদ্যালয়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ফিরিয়া আসা যাক।

একেবারে যাহারা প্রথম ইতিহাস আরম্ভ করিত, তাহাদের কাছে দেশ-বিদেশের বীরদের কাহিনী মুখে মুখে গল্পচ্ছলে বলা হইত। তার পর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভারত ইতিহাস পাঠ্য ছিল। বইটা লেখেন নেপালচন্দ্র রায়; কিন্তু তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার বন্ধু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ানো হইত প্রাচীন জগৎ, চতুর্থ শ্রেণীতে আধুনিক জগৎ। তৃতীয় শ্রেণীতে ভারত ইতিহাস। তার পর শেষ দুই ক্লাসে ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য অনুসরণ করাই ছিল রীতি।

প্রাচীন জগতের ইতিহাস পড়াইতাম আমি। অনেক কিছু পড়িয়া ঘাঁটিয়া 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' নামে বই লিখি। তার ভূমিকা লিখিয়া দেন পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। যদুনাথ ভূমিকার মধ্যে লেখেন, 'আজ ৪ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষার একটি অঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য জগতে ইহার উল্লেখযোগ্য চর্চা আরম্ভ হয় নাই; লেখক ও পাঠক কেহই এদিকে তাকান না। সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানিকে এই পথে প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমি উৎসাহের উপযুক্ত মনে করি। এখানি গল্পের বই। ইহাতে ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া হয় নাই; বিষয়গুলিও সম্পূর্ণ এবং নিয়মিতরূপে সাজানো হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, ছেলেদের মন এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীনতম জাতের দিকে আকৃষ্ট করা। তাহার পক্ষে গল্পই প্রশস্ত উপায়।

'কাহিনীর সাহায্যে মানবচরিত্রের কয়েকটি জ্বলন্ত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া এবং সভ্যতার পট চিত্রিত করিয়া লেখক নিশ্চয়ই তরুণ পাঠকদিগের মনে কৌতূহল জাগাইতে এবং একখানি সুস্পষ্ট ও রঙিন ছবি অঙ্কিত করিতে পারিবেন।' এই বই প্রকাশিত হয় ১৯১২ সনে।

নেপালচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ভূ-পরিচয়' নামে একখানি উৎকৃষ্ট ভূগোলের পুস্তক লেখেন। এই বইখানি বহুকাল বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত ছিল।

অজিতকুমার 'খৃস্ট' সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছেলেদের জন্য লেখেন— রবীন্দ্রনাথ উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন (১৯১১)। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে শরৎকুমার রায় ভারত ইতিহাসের দুইটি পর্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া লেখেন 'শিখগুরু ও শিখজাতি' এবং 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি'। 'শিখগুরু' গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎকুমার 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে গ্রন্থ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদার 'হজরত মহম্মদের জীবনী' লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। রবার্ট বলের *Starland, The Story of the Universe, The Sun* প্রভৃতি বই নিজে পড়িয়াছিলেন, নিজের পুত্রকন্যাদের পড়িবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং আশ্রমের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানোৎসুক, তাঁহাদেরও এই-সব বিজ্ঞানের বই পড়িতে বলিতেন। তাঁহারই প্রেরণায় তেজেশচন্দ্র সেন লেখেন 'চন্দ্রসূর্যের কথা'।

অধ্যাপকদের মধ্যে হরিচরণের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তিনি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলনে প্রবৃত্ত হন। বিধুশেখর সংস্কৃত হইতে 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র বঙ্গানুবাদ ও পালি হইতে 'মিলিন্দ পঞ্‌হো'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন করিলেন কবীরের দোহা-অনুবাদ যাহার উপর নির্ভর করিয়া পরে অজিতকুমার চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ *One Hundred Poems of Kabir* ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন। অজিতকুমার প্রবন্ধ লেখক— 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথ' নামে তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকটি কবিকে interpret বা ব্যাখ্যান করিবার আদিগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিছুকাল পরে অজিতকুমারকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত লিখিবার জন্য আদিসমাজ হইতে বৃত্তি দিয়া বিদ্যালয়ের কার্য হইতে এক বৎসরের ছুটি দেওয়া হয়।

কলিকাতায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত নিত্য সাক্ষাত ও আলোচনার ফলে বহু তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ এই জীবনচরিত গ্রন্থ রচিত হয়।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক তরুণ শিক্ষক কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছিলেন। এই যুবক শিক্ষক বহু পরিশ্রম করিয়া 'জৈনধর্ম' সম্বন্ধে বাংলায় একখানি গ্রন্থ লেখেন। বোধ হয় বাংলাভাষায় জৈনদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থ প্রথম।

জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের লেখক। 'সাধনা' পত্রিকায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক রচনা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে শিলাইদহে আহ্বান করিয়া আনেন। জগদানন্দ মাসিকপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা ইংরেজি বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা— বিশেষভাবে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান', 'পপুলার সায়েন্স' ও 'নেচার' হইতে সংকলিত। তাঁহার বাংলা লিখিবার ভঙ্গিতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার গুণে তাঁহার রচনা জনপ্রিয় হয়। এত কাজ করিয়াও তিনি বড়োছেলেদের গণিত ও বিজ্ঞান পড়াইতেন। সে বিজ্ঞান-অধ্যাপনা বীক্ষণাগারের সাহায্যে হইত। ব্রহ্মবিদ্যালযে যে ল্যাবরেটরি ছিল— তাহা স্কুলের পক্ষে পর্যাপ্ত; এই-সব সরঞ্জাম আসিয়াছিল ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হইতে। সেখানে মহারাজ একটি কলেজ স্থাপনের জন্য এই-সব সংগ্রহ করেন; কলেজ চলে নাই— তখন যন্ত্রপাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করেন।

শিশুদের ভূগোল শিক্ষা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রায় একই সঙ্গে চলিত। ভূগোলের প্রতি আমার অনুরাগ বরাবরই। তাই বোধ হয় ছোটোদের ভার আমার উপর দেওয়া হয়। আমি ছাত্রদের লইয়া শান্তিনিকেতনের নিকটস্থ খোয়াই-এ গিয়া স্রোতধারা, দ্বীপ, অন্তরীপ, মালভূমি প্রভৃতি দেখাই। বর্ষার জলস্রোত চলিয়া গেলে এখানকার খোয়াই এর বালুর উপব লোহার কণা দেখা যায়, সে-সব ছাত্ররা সংগ্রহ করে। মৃত্তিকার নানাপ্রকাব ভেদ দেখাই। ছাত্ররা আশ্রমের গাছপালা পর্যবেক্ষণ, ঋতু পরিবর্তন লক্ষ করে এবং খাতায় সংক্ষেপে লেখে। কোনো ছাত্র সংগ্রহ করে গাছের পাতা, ফুল, কাঁটা ; সেই-সব সাজাইয়া তার প্রদর্শনী হয়। মাঝারি ছাত্রদেব জন্য তাপমান যন্ত্র দুই-তিনরকমের আনাই। একটা অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার ছিল ল্যাবরেটবিতে; সেইটা ছাত্রদের সহজে দেখার ব্যবস্থা করি। ১৩১৮ সালে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয় পূজার পূর্বে। মনে আছে বদ্ধ ঘরে ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে এই চাপমান যন্ত্রের কাঁটার পরিবর্তন লক্ষ করিতেছিলাম ও ছাত্রদের দেখাইতেছিলাম। এ-সব পর্যবেক্ষণ ছাত্ররা লিপিবদ্ধ করে; তার জন্য 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ' নামে বহি ছাপাইয়াছিলাম। তাহাতে বহুবিধ দৈনিক তথ্য ও মাসিক তথ্য সংগ্রহের ছক ছিল।

বারিমাপন যন্ত্র বা রেনগেজ কলিকাতায় লরেন্স মেয়োর দোকানে লিখিয়া পাই নাই— তাহারা বোম্বাই হইতে আনাইয়া দেয়। দেরাদুনে মেটিরিওলজিক্যাল বা আবহতত্ত্ব বিভাগকে আমি পত্র দিই; তাহারা কীভাবে তাপাদির মাপন করিতে হয় সে সম্বন্ধে পুস্তিকা ও একখানি পুস্তক পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেয়।

আশ্রমের গাছপালা, কীটপতঙ্গও চোখ খুলিয়া দেখিতে হয়— এ শিক্ষা ছাত্ররা যেন নিজে হইতে পায়। শিক্ষকদের নিকট হইতে সামান্য আভাস, ইঙ্গিত, সহায়তা ও প্রচুর উৎসাহ পাইয়া তাহারা শালগাছ, করবী, লেবুগাছ, ঘাসের পাতার মধ্য হইতে বিচিত্ররকমের গুটিপোকা সংগ্রহ করে, তাদের খাদ্য দেয়, প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাইতে দেখে। এই-সব

তাহারা তাহাদের পত্রিকায় লেখে— সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধ পড়ে।

'ইংলন্ডে nature study বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়।... আমাদের দেশে এ বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া জানি না এবং এরূপ পর্যবেক্ষণের স্পৃহাও আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একান্ত অভাব।' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এইটি লিখিত হয় ১৮৩৪ শকে (১৯১২ সনে)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কিছু-কিছু পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই গবেষণা স্পৃহা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় নাই বলিয়া কোনো স্থায়ী ফলও রাখিয়া যায় নাই এবং উহার ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলে নাই। সোবিয়েত রুশদেশে ছাত্ররা কীভাবে ঋতুভেদে পাখির যাওয়া-আসা লক্ষ করে, তাহার বর্ণনা অধ্যাপক হল্‌ডেনের এক গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনে সেই পর্যবেক্ষণ ধাবা যদি চালু থাকিত, তবে হয়তো *Natural History of Selbourne*-এর ন্যায় বই লেখা সম্ভব হইত।

৩৮

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের চাকুরিতে আমি বহাল হইবার ঠিক দুই বৎসর পরে, ১৯১২ সনের ২৪ মে (১৩১৯, জ্যৈষ্ঠে) রবীন্দ্রনাথ সপুত্র-পুত্রবধূ বিলাত যাত্রা করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৩ সনের ৬ অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের এগারো তারিখে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশিত হয়।

কবি বিদেশে ছিলেন ষোলো মাস। এই পর্বে বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন জগদানন্দ রায়। আর্থিক ব্যবস্থার ভার ছিল দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর— ইহার কথা পূর্বে আমরা কিছু বলিয়াছি। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কোনো কাজে বা ব্যবস্থায় তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না।

শান্তিনিকেতনে তখন দারুণ অর্থকষ্ট। মনে আছে ১৩১৬ সালের অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্পাদক বিধুশেখর লিখিতেছেন—'বিদ্যালয়ে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া ঘাটতি পড়িতেছে— বৎসরে ছয়শত টাকা ঘাটতি হইবে— এইভাবে বিদ্যালয় কতদিন চলিবে।'

ছাত্রদত্ত বেতন, ত্রিপুরা মহারাজার বাৎসরিক দান হাজার টাকা, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের টাকার কিছুটা— এই ছিল স্থায়ী আয়। সমস্ত ঘাটতি রবীন্দ্রনাথকে পূরণ করিতে হইত।

আশ্রমের মাসকাবারি খাদ্যাদি আসিত বোলপুরের নিত্যবাবুর দোকান হইতে। নিত্যবাবু উকিলও ছিলেন। দ্বিপুবাবুর বৈকালিক মজলিস বসিত তাঁহার বৈঠকখানায়। দ্বিপুবাবুর ঘোড়ার গাড়ি ছিল— সেরকমের গাড়ি এ অঞ্চলে কাহারো ছিল না। আমরা দেখিতাম, প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাঁহার কোচম্যান সাজিয়া-গুজিয়া গাড়িতে দ্বিপুবাবুকে লইয়া বোলপুর যাইতেছে; গাড়ির পিছনে দুইজন সহিস।

বোলপুরে নিত্যবাবুর সহিত দ্বিপুবাবুর এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও, একদিন তাহারা বিদ্যালয়ের গোরুর গাড়ি ফেরত দিলেন— অনেক টাকা ধার হইয়া গিয়াছে বলিয়া। বোধ হয় সেটি

দোকানের কর্মচারীরাই করিয়া থাকিবেন, কারণ পরে যদি মালপত্র না আসিত, তবে বিদ্যালয়ের সকলকে উপবাস করিতে হইত। বিলাত হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে টাকা পাঠান (৯০ পাউণ্ড), তাহার দ্বারা সব প্রথম নিত্যবাবুর ঋণ পরিশোধিত হয়।

অফিসে মাঝে-মাঝে নগদ টাকার চরম অভাব হইত; এমন-কি, বাজার করার টাকা থাকিত না। তখন আমাদের মতো দরিদ্র শিক্ষকদের নিকট হইতেও টাকা ধার করিয়া বাজার করিতে হইত।

বোলপুর হইতে যে-সব মালপত্র আসিত, তাহা জমা হইত নাট্যঘরের উত্তরে পুরাতন জুজুৎসু ঘবে; তাহাকে ভাণ্ডাব বলা হইত। রান্নাঘরের দৈনিক প্রয়োজনীয় রসদ রান্নাঘরের ম্যানেজার ও দুইজন ছাত্র-ম্যানেজাব বুঝিয়া বাহির করিয়া লইত। বহুকাল— এইরূপে দুইজন ছাত্র পালাক্রমে রান্নাঘবের কাজ দেখা, অতিথি সেবা প্রভৃতি কবিত। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা নূতন বাড়ি বা অন্যত্র পরিবার লইয়া থাকিতেন, তাঁহারাও 'ভাণ্ডার' হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের কাছ হইতে সময়মতো টাকা আদায় না হওয়াতে ভাণ্ডাবের সমস্যা দেখা দিত, সেইজন্য ১৯১৮ সনে ইহাকে 'সমবায় ভাণ্ডাব' বা কো-অপারেটিভ স্টোর্স-এ পরিণত কবা হয়। ববীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কবিতেন যে সমবায় ব্যতীত দেশের মুক্তি নাই। সেই সমবায়নীতি ছাত্রজীবন হইতেই শিক্ষণীয়। আমরা গভীর আন্তরিকতার সহিত 'সমবায় ভাণ্ডারে'র কর্মে ব্রতী হই। কিন্তু কোনো কাজই নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখিবার, স্বার্থহীন দৃষ্টিতে সেবা করিবার শক্তি যেন আমাদের নাই; তাই অখণ্ড বাংলার বাবোশত 'ভাণ্ডারে'র একটিও টিকিয়া নাই। শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার ৩৮ বৎসর পরে উঠিয়া গেল। আরো পরিহাসের সংবাদ এই যে, সেই বৎসরেই বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের ১০০তম গ্রন্থরূপে রবীন্দ্রনাথের 'সমবায়নীতি' প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনেব অন্যতম মন্ত্র হইতেছে এই সমবায়নীতি। শ্রীনিকেতনেও সমবায় ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল— কিন্তু শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডারের সহিত তাহাও উঠিয়া যায়।

৩৯

১৯১২ সনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়। বিধুশেখর বিদ্যালয়ের কার্য ছাড়িয়া মালদহে নিজগ্রামে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে গুরুগৃহ স্থাপনের ভরসায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসেন রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য যিনি কবির নির্দেশে 'রামায়ণ' সংক্ষিপ্তাকারে সম্পাদন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রায় আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা আয়ত্তের জন্য। কালীমোহন ঘোষ শিশু শিক্ষাবিধি অধ্যয়নের জন্য ইংলন্ডে যান।

নূতনদের মধ্যে আসিয়াছেন সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন জোয়ারদার, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, রমণীকান্ত রায় প্রভৃতি। সত্যজ্ঞান সংস্কৃতের অধ্যাপক— এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙালি। ইনি তাঁহার বালবিধবা কন্যা ও দৌহিত্র শিশুপুত্র সূর্যকে লইয়া নূতন বাড়িতে আশ্রয় পাইলেন। সত্যজ্ঞান ছাত্রদের লইয়া আশ্রমের বাগান করা, রাস্তা তৈয়ারি প্রভৃতি

কার্যে যত্নশীল ছিলেন। আশ্রমের পূর্তবিভাগ বলিতে পারা যায় তাঁহার সময় হইতে পত্তন হয়। ছাত্রদের লইয়া তিনি পুরাতন হাসপাতাল ও নূতন বাড়িব মাঝ দিয়া যে রাস্তা নির্মাণ করেন, তাহাই ছিল আশ্রম-প্রবেশের প্রথম পথ। সত্যজ্ঞান কয়েক বৎসর পরে অসুস্থ হইয়া পড়েন ও কলিকাতায় মেয়ো হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে সময়ে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্ররা তাঁহার সেবাশুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করে। ছাত্রদের মধ্যে সে ধারা এখনো বিদ্যমান।

কিশোরীমোহন জোয়ারদার ইতিহাসে এম. এ., তিনি বেশিদিন আশ্রমে ছিলেন না। পরে কটকে ওকালতি করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৬ সনে।

সুধাকান্ত বালককালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র ছিলেন। পুনরায় আসিয়া কিছুকাল স্কুলে পড়েন; কিন্তু পড়াশুনায় বিশেষভাবে গণিতে কোনো সুবিধা করিতে না পারায় পড়া ছাড়িয়া শিশুদেব দেখাশুনা ও পড়ানোর কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি সতীশচন্দ্র রায়ের ভাগিনেয। ইঁহার পিতা ছিলেন উত্তরপ্রদেশের উনাও শহবের উকিল। সুধাকান্ত আশ্রমে নানা কাজ করিয়াছেন— কখনো প্রেসের ম্যানেজার, কখনো বান্নাঘরের পরিদর্শক। প্রেসে কাজ করিবার সময়ে তিনি 'সরণী' নামে মাসিকপত্র সম্পাদন করেন— নবীন ও অজ্ঞাত লেখকদের উৎসাহ দানই ছিল সেই পত্রিকার উদ্দেশ্য। তবে দীর্ঘকাল এই কাগজ চলে নাই। বিশ্বভারতী পর্বেও তিনি নানা কাজে ব্রতী ছিলেন, কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন অতিথি সংবর্ধক। তাঁহার অফুরন্ত গল্পের সঞ্চয় ও গল্প বলিবার ভঙ্গি সকলকে আকৃষ্ট করে। বাংলা রচনায় তাঁহার হাত ছিল, কিন্তু চর্চার অভাবে তিনি তাঁহার স্থান সুনিশ্চিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। উর্দু, হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি অনর্গল বলিতে পাবেন বলিয়া অতিথিদের মনহরণ বিষয়ে তাঁহার জুড়ি আর নাই।

৪০

আশ্রমের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগের সূত্রপাত হইল কবির বিলাত প্রবাসকালে। ইংলন্ডে কবি স্থানীয় শিক্ষাবিধি ও কয়েকটি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন; নিজ বিদ্যালয়ে কীভাবে সে-সব প্রয়োগ করা যায়, সে কথা সর্বদাই ভাবেন। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বিষয়ে ব্যবহারিকতার কথা যেমন ভাবিতেছেন, উহার আদর্শগত অভিব্যক্তির কথাও তেমনই আলোচনা করিতেছেন। বিলাতবাসকালে (১৯১২) তিনি সুরুলের কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন— এ তথ্য কবির জীবনী-পাঠকদের অবিদিত নয়। কবি ভাবিতেছেন সুরুলে কুঠিবাড়িতে ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া ও চারি পাশে জমি সংগ্রহ করিয়া রথীন্দ্রনাথকে সেখানে গবেষণাকার্যে ব্রতী করিবেন। রথীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিলে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হন— এইভাবে পত্র লিখিতে দেখিতেছি। দশ বৎসর পরে কবির স্বপ্ন আংশিকভাবে রূপ গ্রহণ করে— তথায় শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগ স্থাপিত হইলে— সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

আমেরিকা হইতে ১৯১৩ সনের গোড়ায় কবি লিখিতেছেন— 'আমার ইচ্ছা ওখানে

দুই-একজন যোগ্য লোক একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তা হলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে।'

বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হইতে পারে কিনা বা সে ব্যবস্থা করা উচিত কিনা —সে বিষয়ে আলোচনা মাঝে মাঝে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি জানিতেন ভারতীয়দের মনঃশিক্ষা বিজ্ঞানচর্চার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে দেশের মুক্তি নাই। এইখানে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়ে'র ভূমিকা স্মরণীয়।

৪১

বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্যাপ্টেন পেটাভেল নামে এক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারি ইঞ্জিনিয়রের পরিচয় হয়। লোকটির শিক্ষা-উপনিবেশ বা educational colony সম্বন্ধে অনেক আইডিয়া ছিল; এ বিষয়ে বই ও পুস্তিকাও লেখেন। কীভাবে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যায়, এই সম্বন্ধে তিনি বহু বিস্তারে প্ল্যান করেন।

রবীন্দ্রনাথের সহজ বিশ্বাসপ্রবণ মন এই আদর্শবাদ তথা বাস্তববাদে মুগ্ধ হয়। তিনি পেটাভেল ও তাঁহার পত্নীকে খরচ দিয়া বোলপুর পাঠাইয়া দিলেন; তাঁহারা আসিয়া নূতন বাড়ির সামনের ঘরটিতে আশ্রয় লইলেন। পেটাভেল আসিয়া ইংরেজি পড়ান ছোটো ছেলেদের; প্রবন্ধ লেখেন আপন মনে; কিন্তু কীভাবে হাতে-কলমে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যায়, তাহার কার্যকরী মূর্তি দিতে পারিলেন না। পরিবেশের অনুকূলতায় হউক, অথবা অভিজ্ঞতার অভাবে হউক পেটাভেলের আদর্শ বাস্তবরূপ লইল না। বৎসর-খানেক পরে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যান; সেখানে কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার আদর্শবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং আরো কিছুকাল পরে দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে 'পলিটেকনিক' নামে বিদ্যায়তন খোলেন। শান্তিনিকেতনের সহিত তাঁহার আর কোনো যোগ ছিল না।

৪২

১৯১২ সনে লন্ডনে কবির সহিত সি. এফ. এন্ড্রুজ নামে এক পাদ্রি-অধ্যাপকের পরিচয় হয়। এই পাদ্রি ভদ্রলোকটি দিল্লী সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক ও দীক্ষিত মিশনারি। ইনি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ শুনিয়া ও কবির সহিত কথাবার্তা কহিয়া এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ১৯১৪ সনে সমস্ত ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করিলেন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক পদ ত্যাগ করা তত কঠিন কাজ নয়; কিন্তু তিনি দীক্ষিত পাদ্রি— নানা সম্ভ্রান্ত ধর্মসংস্থার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত; সে-সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া একটি অ-খৃস্টান

প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়ার মধ্যে যে কী সংগ্রাম— তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। মিস সাইক্ লিখিত এন্ড্রুজ-জীবনী পাঠ করিলে এ বিষয়ে সমগ্রভাবে জানা যায়।

এন্ড্রুজের শান্তিনিকেতনে যোগদানের পূর্বে আসিলেন পিয়ার্সন নামে আর একজন ইংরেজ। পিয়ার্সনের নাম শান্তিনিকেতনবাসীর নিকট সুপরিচিত— কারণ সাঁওতালদের একটি পাড়ার নাম পিয়ার্সনপল্লী; সেখানে এখন বিশ্বভারতীর অধুনাতম প্রতিষ্ঠান Agro-Economic Institute স্থাপিত হইয়াছে (১৯৫৯)। আর শান্তিনিকেতন হাসপাতালের নাম 'পিয়ার্সন হসপিটাল'। এই পল্লী ও প্রতিষ্ঠান যে-লোকের নামের সহিত যুক্ত, সেই পিয়ার্সন ছিলেন কলিকাতার লন্ডন মিশনারি কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পাদ্রি। খৃস্টানী কলেজে অ-খৃস্টান ভেদাভেদটা তাঁহাকে পীড়া দিত। অবশেষে কলেজের কাজ ও পাদ্রির পদ ত্যাগ করেন। পরে তিনি দিল্লী চলিয়া যান তাঁহার বন্ধু এন্ড্রুজের কাছে। সেখানে এন্ড্রুজ তাঁহাকে নগরের অন্যতম ধনীশ্রেষ্ঠ সুলতান সিংহের বালকপুত্র রঘুবীর সিংহের গৃহশিক্ষকের কাজ জুটাইয়া দেন। এখন রঘুবীর সিংহের মডেল স্কুল দিল্লীর বিশিষ্ট বিদ্যালয়। ১৯১৩ সনের গোড়ায়— কবি তখন বিদেশে— পিয়ার্সন শান্তিনিকেতন ভ্রমণে আসেন। মনে আছে, শান্তিনিকেতনের দ্বিতল গৃহে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। অজিতকুমার গান করেন 'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয় নি হারা'— পিয়ার্সনের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে— নিজের ভাবাবেগ রুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শান্তিনিকেতন তাঁহাকে এতই মুগ্ধ করিল যে তিনি এখানে জীবন উৎসর্গ কবিবেন বলিয়া সংকল্প গ্রহণ করিলেন। সুলতান সিংহ এই কথা জানিতে পারিয়া বলেন যে তুমি শান্তিনিকেতনে অর্থ সাহায্য করিতে চাও তাহা আমি দিতেছি। কিন্তু পিয়ার্সন অর্থ দিতে চান না তিনি জীবনদানের জন্য উৎসুক।

কবি আমেরিকার বস্টন হইতে একপত্রে (১৯১৩, ফেব্রুয়ারি ১৭) লিখিলেন 'পিয়ার্সন যে শান্তিনিকেতনে জীবন সমর্পণ করবেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই কারণ ওঁদের চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ট।' রবীন্দ্রনাথ লন্ডন হইতে পিয়ার্সনকে লিখিলেন (১৯১৩, অগস্ট ৬), 'আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।'

এই দুইজন ইংরেজের আগমন শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে বিশেষ ঘটনা বলিয়া মনে করি; কারণ এখন হইতে আশ্রম তাহার ক্ষুদ্র নীড়ের বাহিরের বৃহত্তর জগতের নানা স্পন্দনের স্পর্শ লাভ করিতে আরম্ভ করে। সেইরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি তথাকার গবর্নমেন্ট নানাভাবে নির্যাতন করিতেছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে এক গুজরাটি ব্যারিস্টার ভারতীয়দের পক্ষ লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এন্ড্রুজ স্বচক্ষে এই আন্দোলন দেখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। পিয়ার্সন তখন দিল্লীতে; তিনিও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। উভয়ে কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিনিকেতনে এক বিদায় সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় পিয়ার্সন বলিয়াছিলেন, 'আমি এবং আমার বন্ধু এন্ড্রুজ-এর পক্ষ হইতে একটিমাত্র কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই

শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যে আমাদিগকে সাহায্য করিবে।' এন্ড্রুজ তখনো দীক্ষিত পাদ্রি সংঘভুক্ত আছেন, কবি তাঁহাকে লিখিলেন— 'You know our best love was with you, while you were fighting our cause in Africa along with Mr. Gandhi and others.'এই ঘটনাই পরে গান্ধীজিকে শান্তিনিকেতনের সহিত চিরদিনের মতো যুক্ত করিল।

১৯১৪ সনের ৩১ মার্চ পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকপদ গ্রহণ করিলেন। নূতন বাড়ির সামনের ঘরে তিনি উঠিলেন— পেটাভেলরা চলিয়া গিয়াছেন— সে ঘব খালি ছিল। ইহার কয়েকদিন পরে এন্ড্রুজ আসিলেন; তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলন্ডে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ফিরিলেন। ১৯ এপ্রিল (১৯১৪) শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে কবি তাঁহাকে স্বাগত করিলেন। তাঁহাকে অভিনন্দন জানান এই কবিতায়—

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি করি নমস্কাব।

এইবার এন্ড্রুজ বিলাতে গিয়া খৃস্টীয় চার্চের সহিত তাঁহার যে বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিল, তাহা ছিন্ন করিয়া আসিয়াছেন— এখন সম্পূর্ণভাবে আশ্রমের কাজে যুক্ত হইবার আর কোনো বাধা নাই। কিন্তু পাঞ্জাবে তাঁহাব নানা অপবাদ; সরকারি মহল মনে করে এন্ড্রুজ ভারতের বিপ্লবীদলের প্রতি সহানুভূতিশীল আর হিন্দুরা মনে কবে তিনি সরকাবি 'স্পাই'। এই অপবাদ তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে আসিয়াও সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই মানুষটি কোনোদিন কোনো অভিযোগ না করিয়া আপন অন্তর জীবনেব আলোকে পথ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কবি তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'উৎসর্গ' কাব্যখণ্ড এন্ড্রুজকে উৎসর্গ করেন (১৯১৪, এপ্রিল) নববর্ষের দিন।

এন্ড্রুজকে অভিনন্দিত করিবার কয়েকদিন পরে উদীয়মান তরুণশিল্পী নন্দলাল বসুকে শান্তিনিকেতনে কবি স্বাগত করেন। এই ঘটনাটি শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই ব্যক্তির সহিত ক্রমে বিদ্যালয়ের ও বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যবন্ধনে গ্রন্থিত হইয়া যায়।

৪৩

১৯১৪ সনের অগস্ট মাসে য়ুরোপেব একাংশে যে যুদ্ধ দেখা দিল, তাহা কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। উগ্র জাতীয়তাবোধ বা ন্যাশনালিজমের আদর্শ মানুষের কী সর্বনাশ করিতেছে, তাহাই আজ ভাবুকদের চিন্তাব বিষয়। কবি শান্তিনিকেতনেব মন্দিবে একদিন বলিয়াছিলেন যে মানুষের মিলন তপস্যাকে ভঙ্গ করিবার জন্য শয়তান জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করিয়া কী বিরোধ, কী আঘাত, কী ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেছে। সেই অপধর্ম হইতে আত্মাকে রক্ষা করার জন্য কবি একদিন বলিলেন—

'শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ, জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে অধর্ম চলছে, মানুষকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে— আমরা আশ্রমে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।'

১৯১৪ সনে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কবির ভাষণের মধ্যে এই কথা স্পষ্টতর হয়। কবি বলিলেন, য়ুরোপে শান্তিবৈঠকে শান্তিস্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে?

আজ কবির ভাবনার মধ্যে পূর্বের 'স্বদেশী যুগে'র বাণী নাই। একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন স্বদেশকে অতিরিক্তভাবে দেখিলেও দোষ নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছেন এই স্বাদেশিক আতিশয্য হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইবে। এক ভাষণে তিনি বলিলেন 'মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নাই— সমস্ত মানুষ যে এক।' The world is one— এই কথাই সেদিন শান্তিনিকেতনবাসীদের নিকট মন্দিরে বলিয়াছিলেন। ১৯১৪ সনে যীশুখৃস্টের জন্মদিনে মন্দিরে কবি বলেন, 'আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃস্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব; খৃস্টানের জিনিস বলে নয়, মানুষের জিনিস বলে।'

৪৪

১৯১৪ সনের শেষদিকে আশ্রমের একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। পাঠকের স্মরণ আছে, এক বৎসর পূর্বে পিয়ার্সন ও এন্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সেই সময়ে গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সমস্যা ডারবানস্থ ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া। গান্ধী-স্মাটস চুক্তি সিদ্ধ হইলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থগিত করিয়া গান্ধী ভারতীয়দের সমস্যা সমাধানের জন্য ইংলন্ড যাত্রা করেন। ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভারতে আনিতে চান। কিন্তু তাহাদের ভারতে কোথায় রাখিবেন জানেন না। তখন তিনি ভাবতের সাধারণের নিকট অজ্ঞাত, অখ্যাত।

ইতিমধ্যে এন্ড্রুজের মধ্যস্থতায়, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পাইয়া ডারবানের ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইদলে ছাত্র ছিল কুড়িজন— গান্ধীজির কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধী তাহাদের অন্যতম। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল, যাহারা ভারতবর্ষ চোখেই দেখে নাই— দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহাদের জন্মস্থান। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মগনলাল গান্ধী গুজরাটি, কোটোল মহারাষ্ট্রীয় ও রাজঙ্গম তামিল। মগনলাল পরজীবনে গান্ধীজির গ্রাম-সেবাকার্যে দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হন; তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর ওয়ার্ধা শহরের নিকট মগনওয়াড়ি উপনিবেশ ও শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়। দত্তাত্রেয় ছিলেন মহারাষ্ট্রীয়। তিনি ইতিপূর্বেই শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দল আসার পর তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। দত্তাত্রেয় পরে কাকা কালেলকার নামে দেশবিশ্রুত হন— তাঁহার তালিমী সংঘ সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান।

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ নূতন বাড়িতে আশ্রয় পাইলেন। তাঁহাদের

কঠোর নিয়মনিষ্ঠ জীবন আশ্রমে নূতন প্রাণ আনিল। তাঁহাদের শ্রমসহিষ্ণু জীবনধারা সকলেরই অনুকরণের বিষয় হয়। এই-সব ছাত্ররা পোলোক (Polok), কালেনবাক প্রভৃতি আদর্শবাদীর নিকট হইতে নানারূপ কার্য শিখিয়াছিল; সুতাকাটা, কাপড়বোনা, জুতা-মেরামতি প্রভৃতি কাজেও ছাত্ররা পটু ছিল। শ্রমসহিষ্ণু ছাত্ররা প্রস্তাব করিল যে মন্দিরের পাশে যে পুষ্করিণী আছে, তাহা তাহারা খনন করিবে। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া তখনি অনেকগুলি কোদাল, গাঁইতি, ফাউড়া, ঝুড়ি আনাইয়া দিলেন; ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সহিত আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকরা এই কার্য আরম্ভ করেন। কিছুদিন খোঁড়াখুঁড়ির পর দেখা গেল আরো অন্তত কুড়ি ফুট না খুঁড়িলে জল পাওয়ার আশা নাই। তখন এই কাজ বন্ধ করা হইল। ১৯৬১ সনে এই পুকুর মাটি ভরিয়া সমান করা হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন ১৯১৫ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি— সেদিন গান্ধীজি ও তাঁহার পত্নী কস্তুরবাঈ তাঁহাদের পুত্র, পরিজন ও ছাত্রদের দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিলেন। ইংলন্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজি জানিতে পারেন যে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। শান্তিনিকেতনে শালবীথিতে ইঁহাদের অভ্যর্থনা হইল আশ্রমোচিত আদর্শে। গান্ধীজিকে যে রাস্তা দিয়া আশ্রমে প্রবেশ করানো হয় সেই রাস্তাটি অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে আশ্রমের ছাত্ররা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া নির্মাণ করে। পবে এই রাস্তাটির নাম হইয়া যায় নেপাল রোড। দুইদিন পরেই গান্ধীজিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনা যাইতে হইল। গোখলের মৃত্যু হইয়াছে। গোখলেই ছিলেন বিদেশে সংগ্রামরত ভারতীয়দের একনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন না বলিযা এবার তাঁহার সহিত গান্ধীজির সাক্ষাৎ হইল না।

অতঃপর ৬ মার্চ গান্ধীজি পুনরায় আশ্রমে আসিলেন। সেই সময়ে কবি শ্রীনিকেতনের বাড়িতে আছেন, 'ফাল্গুনী' নাটিকা লিখিতেছেন। এইবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল। গান্ধীজির আত্মজীবনীর অনুবাদ হইতে সমসাময়িক ঘটনাগুলি বিবৃত হইতেছে; 'আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সহিত মিলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকরা নিজেই রান্না করেন তবে ভালো হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদের হাতে আসে। বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজহাতে পাক করিবার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই-সকল কথা আমি শিক্ষকদের জানাইলাম। দুই-একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন; কাহারো কাহাবো এই পরীক্ষা ভালো মনে হইল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকরা যদি অনুকূল হন, তবে ও পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভালো লাগিবে। বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন, ইহাতেই স্বরাজ্যের চাবি রহিয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পাইয়া ছাত্ররা স্বেচ্ছাব্রতী হইয়া আশ্রমের সকলপ্রকার কর্ম করিবার দায় গ্রহণ করিল। এখন যেখানে টেলিফোন অফিস হইয়াছে তাহার কাছে পায়খানা ঘরটি ছিল। সেইটি ছাত্ররা ভাঙিয়া ফেলিল; মেথরদের কাজ কমিয়া গেল। পাচক, ভৃত্য, জলতোলারা বিদায় হইল। ছাত্র ও শিক্ষকরা সকাল হইতে জলতোলা, রান্নাকরা, তরকারিকাটা, আশ্রম পরিষ্কার করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ মহানন্দে শুরু করিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র, এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন, নেপালচন্দ্র, অসিতকুমার, প্রমোদরঞ্জন, নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি ও

লেখক প্রভৃতি তরুণ দলের উৎসাহ বেশি। বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষবোধ সম্পন্ন, কয়েকজন ইহাতে যোগ দেন নাই— যেমন জগদানন্দ রায়, শরৎকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি। তাঁহারা দীর্ঘকাল রন্ধনশালার ব্যবহারিকতার সহিত সুপরিচিত; তাঁহারা জানিতেন এই কাজ দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। বাস্তবতা বোধশূন্য শিক্ষকদের একজনের উপর ভার পড়িল কলিকাতা হইতে ছাতু আনিবার। তিনি কলিকাতায় গেলেন— গলদঘর্ম হইয়া একমন ছাতু কিনিয়া আনিলেন— কিন্তু আহার করিতে গিয়া দেখা গেল— উহা ছাতু নহে, বেসন। বর্ধমানে গিয়া পাউরুটির অর্ডার দিয়া আসা গেল; রুটি আসেই না— দিন যায়। রুটির রসিদ যে গার্ডের সঙ্গে আসে এবং সেই দিনই মাল পাওয়া যায়, সে জ্ঞান না থাকায় রুটি যখন সাতদিন পরে পাওয়া গেল, তখন রুটির গায়ে ছাতা জমিয়া অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। মনে আছে একদিন চাকা-চাকা করিয়া লাউ কাটিয়া কড়াইয়ে সিদ্ধ করিতে দিয়াছি— লাউ আর ডোবে না। বিরাট খুন্তি দিয়া চাপিয়া ধরি— খুন্তি উঠাইবামাত্র লাউ খণ্ড ভাসিযা উঠিল। সাধারণ রান্নাঘরে বাঙালি ধরনেই রান্নাদি হইত। কিন্তু ফিনিক্স দল পৃথক ভোজন করিত। তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষক জুটিলেন। সন্তোষচন্দ্র ও প্রমদাবঞ্জন অগ্রণী হন। প্রমদাবাবু লিখিতেছেন, 'এখানে কেবল আদা হলুদ সংযোগে তৈয়াবি খিচুড়ি, ফল, কাঁচা তরকাবি আর চাপাটি ছিল এঁদের প্রধান খাদ্য। গান্ধীজির দলে চা খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। চাযেব বদলে নিমপাতা মোলায়েম কবে বেটে জলে খাওয়া হত পুবা একবাটি।' শান্তিনিকেতনে এই স্বাবলম্বন অধ্যায় আরম্ভ হইল ১০ মার্চ, ১৯১৫ (২৬ ফাল্গুন, ১৩২১)। এখনো শান্তিনিকেতনে সেই দিনটি 'গান্ধীদিবস' বলিয়া পালিত হয়। সেদিন বিদ্যালয়েব আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকগণ আশ্রমের ভৃত্য-পাচকদের ছুটি দিয়া একবেলা সকল কাজ নিজেরাই কবেন।

স্বাবলম্বন নীতি প্রবর্তনের পরদিন গান্ধীজি আশ্রমত্যাগ করেন ও কুড়িদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ছাত্রদেব লইয়া কুম্ভমেলা দেখিতে চলিযা যান। দক্ষিণ আফ্রিকাব ছাত্রগণ চাবমাসকাল শান্তিনিকেতনে বাস করে।

গ্রীষ্মাবকাশেব পূর্ব-পর্যন্ত এই স্বাবলম্বননীতি চলিয়াছিল, কিন্তু পড়াইতে পড়াইতে বা পড়িতে পড়িতে রুটিনমতো রান্নাঘরে গিযা কাজ করা, বাসন মাজা প্রভৃতি করিতে গিয়া পড়াশুনাব অবস্থা যে কী হইতেছিল, তাহা কেহ ভাবিতেছিলেন না।

স্বাবলম্বন পর্বে নানা সমস্যা চারি দিকে; একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে আশ্রমের ভোজনশালার জীর্ণ টিনের চাল উড়িয়া গেল। অপবদিকে 'ফাল্গুনী'ব অভিনয়ের মহড়া চলিতেছে। যাদব নামে একটি বালকের টাইফয়েড— তাহাব জন্য পালাক্রমে ছাত্র-শিক্ষকগণ 'ডিউটি' দিতেছেন। নেপালচন্দ্র রায় বাতের ব্যথা সাবাইবার জন্য উপবাস-চিকিৎসা গ্রহণ করিয়া সমস্যা সৃষ্টি কবিয়াছেন। এই অবস্থাব মধ্যে যাদবের মৃত্যু হইল। পিয়ার্সনেব প্রিয়পাত্র ছিল এই সুদর্শন বালকটি। ইহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা হইতে প্রবীণ চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ আচার্য দুইবার আসেন এবং কযেকদিন থাকিয়াও যান। একটি বালকেব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেদিন সকলের কী চেষ্টা!

তখন শান্তিনিকেতনের আবাসিক চিকিৎসক ছিলেন বিনোদবিহারী রায়; ইনি বিধানচন্দ্র বায়ের সহপাঠী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া কলেজে খ্যাতি ছিল। পরীক্ষাব শেষ বৎসর

তাঁহার ধর্মভাব এমনি তীব্রভাবে দেখা দিল যে তিনি শেষ এম. বি. পরীক্ষা দিলেন না; তাঁহার ভয় পাছে সংসার তাঁহাকে টানে। পরে তিনি গৃহী হইয়াও অর্থার্জনে মন দেন নাই; তিনি আসেন শান্তিনিকেতনে সেবার আদর্শ লইয়া। সত্যই তাঁহার সেবা করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। বিনোদবিহারী কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সুপরিচিত দার্শনিক সীতানাথ তত্ত্বভূষণের জ্যেষ্ঠাকন্যা লীলাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় (১৯১৫) বিনোদবিহারী সস্ত্রীক আশ্রমে বাস করিতেন। ইঁহারা শচীন বসুর যে বাড়িতে থাকিতেন, তাহা এখন নাই। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে এতদিন শান্তিনিকেতনে ডাক্তার ছিল, সেবক ছিল না— বিনোদবিহারী সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন।

যাদবের মৃত্যুর পর পিয়ার্সন *Santiniketan* নামে একখানি সুন্দর বই লেখেন; তাহা তিনি উৎসর্গ করেন 'যাদব'কে। ঐ গ্রন্থের লভ্যাংশ হাসপাতালের জন্য তিনি দান করিলেন। *Santiniketan* বইখানির দুইটি অংশ— একটি আশ্রমের কথা, অপরটি সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা'র অনুবাদ। এই গ্রন্থখানি য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছিল।

এন্ড্রুজ পিয়ার্সন দুই প্রকৃতির লোক। এন্ড্রুজ ভারতের বাহিরে ভারতীয় শ্রমিকদের সমস্যা, ভারতের নানাপ্রকার শ্রমিক অশান্তি নিরাকরণ ব্যবস্থা লইয়া চিন্তা করেন, প্রবন্ধ ও পত্র লেখেন ও অক্লান্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতে পারেন। পিয়ার্সন ধীর শান্ত— আশ্রমে বসিয়া নিকটস্থ সাঁওতালপল্লী, আশ্রমের দুঃস্থ ছাত্রদের সমস্যা লইয়া চিন্তা করেন, অর্থও দেন। সাঁওতাল গ্রামের একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইত; পিয়ার্সনের যোগ হইল ইহাদের সহিত। সাঁওতাল গ্রামের এই বিদ্যালয়টি আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র দ্বারা স্থাপিত হয়। ছাত্ররাই নিয়মিতভাবে যাইয়া পাঠ দিতেন ও সাঁওতাল বালকদের সহিত খেলা করিতেন। আশ্রমের একটি ছাত্র সুহৃৎকুমার সেনগুপ্ত এই গ্রাম-সেবা কার্য আরম্ভ করেন; তাঁহার আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুর পব আশ্রমের বড়ো ছাত্ররা বিদ্যালয়টির নাম দেয় 'সুহৃৎ নৈশ বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ে আশ্রমস্থ ছাত্রকর্মীদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের কলিদাস দত্ত, লেখকের ভ্রাতা সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সিবিলসার্জন বরদাকান্ত রায়ের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র রায় (এখন বিখ্যাত ডাক্তাব), বিহারের এক ডাক্তারের পুত্র কৃষ্ণদাস পাল। সাঁওতাল বিদ্যালয়টি নির্মাণে ইহারা দৈহিক সহায়তা ও অর্থদান করিয়া ছিল। বর্তমানে সে গৃহ নাই; অদূরে ইষ্টকনির্মিত পাকা বুনিয়াদী বিদ্যালয় নির্মিত হইয়াছে; আশ্রমেব ছাত্রদের সহিত এখন ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

১৯১৩ সনের শেষ দিকে র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতে আসেন; তখন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য। পাবলিক-সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ও এই সাঁওতাল গ্রামের বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি শ্রমিকপুত্র; তিনি আশা করেন, একদিন এইখান হইতে শ্রমিক নেতার অভ্যুদয় হইবে। দেশে ফিরিয়া গিয়া *Daily Chronicle* কাগজে (1914, Jan 14) তিনি শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রবন্ধ লেখেন।

৪৫

আমাদের স্বাবলম্বী পর্বের আর-একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিয়াছিলেন। এতকাল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সরকারি কর্মচারীদের বিবেচনায় আবাঞ্ছিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯১২ সনে পূর্ববঙ্গ সরকারের এক গোপন ইস্তাহারে বলা হয় যে সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন অবাঞ্ছনীয়। শিক্ষক হীরালাল সেন ও কালীমোহন ঘোষকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য কবির উপর দীর্ঘকাল নানাভাবে চাপ চলিয়াছিল। শেষকালে হীরালালকে বিদায় করিতে হয়। কালীমোহন বিলাতে শিক্ষালাভের জন্য চলিয়া গেলে সমস্যা অন্যভাবে নিরাকৃত হয়। তার পর ১৯১৩ সনের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইলে ও দুইজন ইংরেজ অধ্যাপক ১৯১৪ সনে কবির প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলে, রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্বের সাহিত্যিক ও মনীষীদের দৃষ্টি পড়িলে ভারতে পুলিসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি শমিত হয়। কবির বিশ্বখ্যাতি স্বীকৃতি লাভের পর ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আর তুষ্ণীভাব রক্ষা বা বিরূপ ব্যবহার শোভন হয় না— এইটি কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পাবিলেন। এইজন্যই বোধ হয় বঙ্গদেশের গভর্নর শান্তিনিকেতনে আসিলেন (২০ মার্চ, ১৯১৫)। আশ্রমে গান্ধী প্রণোদিত স্বাবলম্বন শুরু হইয়াছিল দশদিন পূর্বে। কারমাইকেলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষভাবে মন্দিরের অনেক-কিছু অদল-বদল হইয়াছিল। আম্রকুঞ্জে একটি অর্ধবৃত্তাকার ইষ্টক আসন এখনো কারমাইকেল বেদী নামে পরিচিত, ঐ বেদী-'পরে গভর্নরের অভ্যর্থনা হয়। বেদীর পশ্চাতে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' খোদিত ক্ষুদ্র তোরণটি ছাতিমতলা হইতে উঠাইয়া আনিয়া প্রোথিত করা হয়। পরে সেইটি ভাঙিয়া যায়। কখন যে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' বেদীচ্যুত হইলেন, তাহা কাহারো দৃষ্টিভূত হইল না।

৪৬

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন চিরদিন থাকিয়া থাকিয়া হইয়া আসিতেছে; এইটি যে শান্তিনিকেতনেরই বৈশিষ্ট্য, তাহা নয়। কারণ, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অধ্যাপক আসে যায়।

শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর আশ্রম ত্যাগ এই শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষকগণের আসা-যাওয়া হইতে একটু পৃথকই বলিব। কারণ, আঠারো বৎসর বয়সে যে কিশোর ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়া মাত্র বিশ টাকা বেতনে কাজ করিতে আসেন, যিনি গত দশ বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রমের এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিদ্যালয় ও সর্বোপরি তাঁহার সাহিত্যের অনন্যমনা সেবক ও সমালোচকরূপে নিষ্ঠার সহিত কার্য করিয়াছিলেন তিনি কবির বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গেলেন কেন— এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হইতে পারে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে অজিতকুমারকে 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী' লিখিবার জন্য এক বৎসরের ছুটি দেওয়া হইয়াছিল; সে সময়ে তিনি মাসিক একশত টাকা বৃত্তি পাইতেন। সেই কার্য শেষ হইয়া গেলে অজিতকুমার বিদ্যালয়ের কার্যে ফিরিয়া আসেন মাসিক ষাট টাকা বেতনে। এতকাল তাহাতেই চলিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সংসার পরিজন বাড়িতেছে; তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার ১৯১৩ সনে এম.এস.সি পাস করিয়া পাটনা কলেজে অধ্যাপনার কার্য পান। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তিনি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। সুতরাং ভ্রাতার সাহায্য তো বন্ধ হইলই, তাহার উপর তাঁহার রোগের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন তাঁহাকেই করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় অজিতকুমারের অধিক অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাহাতে অধিক অর্থ দেওয়া সম্ভব নয়। দারুণ অর্থ-সংকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অজিতকুমার কাজেব চেষ্টায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কখনো অর্থের জন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু অর্থাভাবই অজিতকুমারের আশ্রম ত্যাগের একমাত্র কারণ নহে। শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও হয়তো অজিতকুমারের আশ্রমত্যাগ ত্বরান্বিত করে বলিয়া আমাদের সন্দেহ। শিক্ষকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাহার পরামর্শ অধিক গ্রহণ করিবেন— তাহা লইয়া রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার, এমন-কি, নগেন্দ্রনাথ আইচও এই শক্তিদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিতেন। নূতনতমদের মধ্যে এখন এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সন কবির বিশেষ প্রিয়। এন্ড্রুজের ভাবপ্রবণ জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি স্থান অধিকার করেন। অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভালো করিয়া জানিতেন। গত একবৎসর কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সহিত পরিচিত হওয়ায় তিনি কবিকে এখন পূর্বের অন্ধভক্তি মিশ্রিত আবেগের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না । এখন নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে কবিকে বিচার করিতেছেন । তিনি এন্ড্রুজকে একপত্রে লেখেন, কবির প্রকৃতির মধ্যে personal attachment কম। এন্ড্রুজ এক সময়ে কবিকে অজিতের এই পত্র দেখান। শুনিয়াছি এই পত্র পড়িয়া কবি খুশি হন নাই। এইরূপ বিচিত্র কারণের অভিঘাতে অজিত আশ্রম ত্যাগ করিলেন কি না জানি না। অজিতকুমার আশ্রম ত্যাগ করিয়া কখনো আশ্রম বা কবি সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেন নাই। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জীবনের শেষ-পর্যন্ত অটুট ছিল। কবিরও অজিতকুমারের প্রতি স্নেহের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অজিতকুমার সুকণ্ঠ ছিলেন; রবীন্দ্র-সংগীত আপন মনে, অপার আনন্দে গাহিয়াই চলিয়াছেন, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। অজিতকুমারের মতো সাহিত্যগত-প্রাণ শিক্ষাগুরুর স্থান পূরণ হয় নাই।

১৯১৫ সনে শরৎকুমার রায়, ডাক্তার বিনোদবিহারী রায়, চুণীলাল মুখোপাধ্যায়, অনঙ্গমোহন রায় আশ্রম ছাড়িয়া যান। নূতন শিক্ষক আসিয়াছেন— দিল্লি হইতে অনিলকুমার মিত্র, এন্ড্রুজের ছাত্র; আসিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ও বি.এস.সি পাসকরা সুরেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিনোদবিহারী হাসপাতালের কাজ ছাড়িয়া গেলে প্রথম আসিলেন ক্যাম্পবেলের পাসকরা এক ডাক্তার, রামপুরহাটের কাছে বাড়ি। তিনি সদ্য বিবাহিত— ছুটির দিনে বাড়ি যাইতেন— তাহাতে কাজের কিছু অসুবিধা হইত। তাই অবশেষে এক তরুণী খৃস্টান ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার থাকিবার জন্য কবি দেহলি বাড়ি ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ তরুণীকে

নিযুক্ত করা কত বড়ো যে ভুল হইয়াছিল, তাহা পরে কবি ও এন্ড্রুজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এন্ড্রুজ তাঁহার স্বভাব-উদার দৃষ্টি ও খৃস্টীয় সেবাপরায়ণ মন হইতে যদি বিবিধ সমস্যার সমাধান না করিতেন, তবে একটি মহিলার জীবনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইত।

৪৭

১৯১৬ সনের মে হইতে ১৯১৭ সনের মার্চ পর্যন্ত দশমাস কবি জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। বিদেশে বাসকালে শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও ব্যর্থতার কথা ভুলিয়া গিয়া উহার বিরাট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্বের স্থানিক ইউরোপীয় যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জাপানে গিয়া ন্যাশনালিজমের যে মত্তরূপ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন খুবই পীড়িত হইল। শিক্ষাবিধির মধ্য দিয়া ন্যাশনালিজমের বিষ শিশুমনে যেভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাবীকালের ইতিহাসেব পক্ষে আদৌ নিরাপদ নয়— এ কথা কবি স্পষ্টভাবে যেন বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার মনে— ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে সর্বমানবেব আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্র সংস্থাপনের কল্পনা জাগিতেছে। আমেরিকায় পৌঁছিয়া দেখেন সেখানেও এই উগ্র জাতীয়তাবোধ সকল শ্রেণীর লোকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। আমেরিকা তখনো মহাযুদ্ধে যোগদান করে নাই— সত্য, কিন্তু তাহাদের লুব্ধমনে শান্তি নাই। এই-সব দেখিয়া ও শুনিয়া কবির মনে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কল্পনার উদয় হয়। তিনি একপত্রে লিখিতেছেন, 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র করে তুলতে হবে। ঐখানে সর্বজাতির মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্চে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন [International Co-operation] যজ্ঞেব প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আযোজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তেব অতীত করে তুলব— এই আমাব মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জযধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।' ('চিঠিপত্র', ২)।

দেশে ফিরিয়া কিন্তু কবি ভারতের নানা রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। মন দিয়া শান্তিনিকেতনে সর্বমানবিক শিক্ষা সংস্থা গডিয়া তুলিবার সুযোগ ও সময় পাইতেছেন না।

৪৮

১৯১৭ সনের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে মিসেস বেসান্ত মাদ্রাজের নিকট আদৈরে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে করিলেন উহার আচার্য বা চ্যান্সেলর। মিসেস বেসান্তের কল্পনা ছিল কলিকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত একযোগে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবে। বোম্বাইতে উহার বাণিজ্যিক বা ব্যাপারিক বিদ্যালয়, মাদ্রাজে কৃষি বিদ্যালয় ও কাশীতে নারী বিভাগ খোলা হইবে। এই ব্যাপক পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি চর্চার স্থান বোধ হয় স্থিরীকৃত হয় আদৈরে। রবীন্দ্রনাথ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়কে ইহার সহিত যুক্ত করেন নাই। কবির এইটুকু বাস্তব বুদ্ধি ছিল যে, এই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে হঠাৎ-সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে পারে না। বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের অভিঘাতে ১৯০৬ সনে স্থাপিত কলিকাতাব জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কী দশা, তাহা তিনি দেখিযাছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই শিক্ষা আন্দোলন ব্যর্থ হইল না। তিনি ভারতীয় বা জাতীয় শিক্ষা বলিতে কী বুঝায়— তাহা আব-একবার ভাবিবার অবসর পাইলেন। ১৯০৫-০৬ সনে বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার তবঙ্গ আসিলে একবার সে সম্বন্ধে গভীব ও বিস্তাবিতভাবে এই জাতীয় শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এইবার ভারতের নূতন পরিস্থিতিতে ও নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জাতীয় শিক্ষাকে নূতনভাবে দেখিলেন।

৪৯

১৯১৮ সনে শান্তিনিকেতন বিদ্যালযে অনেকগুলি গুজরাটি ছাত্র আসিল। ইহারা কলিকাতা ও কয়লা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের পুত্র। কিছুকাল হইতে এন্ড্রুজ ভারতের নানা-প্রকার শ্রমিক সমস্যা ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপেব ভারতীয় 'কুলি' ও বাসিন্দাদের সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। এই সূত্রে ভারতীয় নানা শ্রেণীর লোকের স্পর্শে তিনি আসেন এবং তাঁহার অকৃত্রিম কল্যাণ প্রচেষ্টায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। ১৯১৪ সন হইতে গান্ধীজির সহিত এন্ড্রুজের ঘনিষ্ঠতা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে খুবই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য গুজরাটিবা এন্ড্রুজকে তাহাদের আপনজন বলিযাই মনে করে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এতগুলি অবাঙালি বিদ্যার্থী উপস্থিত হইলে কবির মনে হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানকে তাহার বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমানা ভাঙিয়া বৃহত্তর ভারতীয় পটভূমে স্থাপিত করিতে হইবে।

অবাঙালি ছাত্র এইবারই যে শান্তিনিকেতনে আসিল তাহা নহে; আশ্রম বিদ্যালয়ের আদিপর্বে মহারাষ্ট্রীয়-বর্মী ছাত্র নারায়ণ কাশীনাথ দেবল আসেন। তার পর ১৯১২ সনে আসে বরদার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সরদেশাইয়ের পুত্র শ্যামকান্ত ও তাহার আত্মীয়

জয়রাম। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সহিত সরদেশাইয়ের সখ্য ছিল; যদুনাথ তখন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। সেই সূত্রে তিনিই দুই মহারাষ্ট্রীয় বালককে আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। মালাবারের এক গ্রাম্য কবিরাজ স্বয়ং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া নিজপুত্র বিজয়কৃষ্ণকে উত্তমরূপে বাংলা শিখাইয়া শান্তিনিকেতনে ভরতি করিয়া যান। ইহারা সকলেই বাংলা লইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। আচার্য কৃপালনীর সিন্ধি আত্মীয় গিরিধারী এখানকার ছাত্র ছিল। নেপালি নরভূপ ও চারু দীর্ঘকাল ছাত্ররূপে বাস করে। সকলেই বাংলা ভালো করিয়াই শিখিয়াছিল।

নরভূপ ও চারু দুইজনই দার্জিলিং হইতে আসে। এই নরভূপের বাঘ শিকার কাহিনী শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে অপরূপ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। খাসিয়া ছাত্র ফ্রিন্টন আসে শিলং পাহাড় হইতে। এইরূপ অবাঙালি ছাত্র-কয়েকটি আশ্রমে আসিয়াছিল। আশ্রমের আদিযুগে হোরি সান নামে জাপানি ছাত্র ছিলেন, তিনি সংস্কৃত পড়িতেন। এইবার অনেক কয়টি গুজরাটি ছাত্র আসাতে কবির মনে বিদ্যালয়টিকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপদান করিবার কথা উঠিতেছে। তবে কবির ও ভাবনা ইতিপূর্বেই ১৯১৬ সনে আমেরিকা হইতে লিখিত পত্রমধ্যে ব্যক্ত হইয়াছিল— সে পত্র ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৯১৮ সনের পূজাবকাশের পূর্বে একদিন কবি এন্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথের কাছে তাঁহার বিদ্যালয়কে ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তুলিবার কথা ব্যক্ত করিলেন।

কবি কলিকাতায় আসিলে এন্ড্রুজের চেষ্টায় স্থানীয় গুজরাটি ব্যবসায়ীরা জোড়াসাঁকোয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কবি তাঁহাদের নিকট সর্বপ্রথম তাঁহার 'বিশ্বভারতী' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন (৫ অক্টোবর, ১৯১৮)। অতঃপর ডিসেম্বরে— সাতই পৌষের পরদিন (৮ পৌষ) শান্তিনিকেতনের দক্ষিণে মহাসমারোহে নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হইল। যে স্থানে ভিত্তি স্থাপন করা হইল সেখানে কোনো গৃহ নির্মিত হয় নাই। কালে সেখানে টেনিস কোর্ট করা হয়। এখন সেখানে স্কুলের (পাঠভবনের) ছাত্রদের বোর্ডিং বাড়ি হইয়াছে। 'বিশ্বভারতী'র জন্য যে অর্থ গুজরাটিরা দিলেন, তাহা দিয়া শিশুবিভাগের ঘরটি নির্মিত হয়— তাহার নাম পরে 'সন্তোষালয়' দেওয়া হইয়াছে।

এই সময় কবির পুত্র ও পুত্রবধূ— রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাস উঠাইয়া শান্তিনিকেতনে আসিলেন। তখন শান্তিনিকেতনে ঘরবাড়ি খুব কম। 'বেণুকুঞ্জ' নামে একখানি ঘর কয়েক বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। রথীন্দ্রনাথরা সেই খড়ের চালের ঘরে আশ্রয় লইলেন।

রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তি ছিল; তিনি তাহা বিদ্যালয়ের বিবিধ কার্যে নিয়োগ করেন। ১৯১৮ হইতে ১৯৫২ সন পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল তিনি অনন্যমনা হইয়া বিশ্বভারতীকে নানাদিক দিয়া গড়িয়া উঠিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

৫০

১৯১৮ সনে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ও প্রশাসন বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯১৬ সনে সর্বাধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। সর্বাধ্যক্ষ ছাড়া তিনজন বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদ ১৯১২ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। এই বৎসর নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষা, ছাত্র পরিচালনা, আয়ব্যয়, ছাপাখানা ও বাগান প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের জন্য কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথম বৎসরে (১৯১৮) শিক্ষাবিভাগে প্রমদারঞ্জন, ছাত্র পরিচালনায় সন্তোষচন্দ্র, পূর্তকার্যাদি ব্যাপারে বোধ হয় রথীন্দ্রনাথ নিযুক্ত হন। প্রমদারঞ্জন ঘোষ ১৯১৪ সনের জুন মাসে বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন।

১৯১৭ সনে সুরেন্দ্রনাথ কর আর্টের শিক্ষকরূপে ও গৌরগোপাল ঘোষ ১৯১৮ সনে গণিতের শিক্ষকরূপে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ আজ ভারতে স্থাপত্য শিল্পীরূপে সুপরিচিত। গৌরগোপাল আশ্রমের পুরাতন ছাত্র; শিশুকাল হইতে ম্যাট্রিক পর্যন্ত এখানেই পড়েন। তার পর কলিকাতা হইতে বি.এস.সি. পাস করিয়া আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। কলিকাতায় ছাত্রজীবনে তিনি মোহনবাগানের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। রথীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও গৌরগোপাল— এই তিনজন আশ্রমের বিবিধ উন্নয়ন-কার্যে মন দিলেন। ১৯১৮ সনের শেষ দিকে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার নামে বাহির হইতে অর্থাগম শুরু হয়। সেই হইতে এই তিনজনের সহজবুদ্ধি পরিকল্পিত গৃহাদি নির্মাণ ও পূর্ত বিভাগীয় বিবিধ কার্য নানা রূপ লইতে আরম্ভ করিল। ইহাদের কাহারো কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না— ঠকিয়া, ভুল করিয়া, ভুল সংশোধন করিয়া তাঁহারা আশ্রমকে নূতনভাবে গড়িতে লাগিলেন।

১৯১৮ সনে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। কুষ্ঠিয়াতে ঠাকুর কোম্পানির একটি অন্তর্দাহী মোটা তৈল-ইঞ্জিন ছিল, সেটি আনাইয়া ডাইনামো প্রভৃতি কিনিয়া বিদ্যুৎ আলো উৎপাদন শুরু হইল।

সেদিন আশ্রমে বিধুশেখর প্রমুখ কয়েকজনের ইহা আশ্রমোচিত নহে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবির যুক্তি অস্ট্রিয়া হইতে ডিট্‌মার কোম্পানির ঝুলানো-আলো ও নিউইয়র্ক হইতে আনীত ডিট্‌জ হাতলণ্ঠন দিয়া গৃহ আলোকিত করিলে আশ্রমের আশ্রমত্ব যদি এতকাল ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকে, তবে ট্যান্‌জি-ইঞ্জিন ও বিলাতি ডাইনামো-উদ্ভূত বিদ্যুৎ-আলোকেও আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হইবে না।

১৯১৬ সনে কবি যখন মার্কিনদেশে সফরে যান, সেই সময় লিঙ্কন শহরবাসীরা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি ছোটো মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেন। পর বৎসর 'শান্তিনিকেতন প্রেস' পত্তন হইল— ছোটো সেই ট্রেডল মেশিন লইয়া। এখন যেখানে 'শান্তিনিকেতন প্রেস'— সেই অঞ্চলেই বিদ্যুৎ সরবরাহকেন্দ্র ও মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়।

ছাপাখানার পশ্চিমে যে টিনের ঘরগুলি দেখা যায় সেগুলি 'কারখানা' হইবে বলিয়া নির্মিত হইয়াছিল। কীসের কারখানা, কী উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন হইবে— সে-সব প্রশ্ন সেদিন কাহারো মনে স্পষ্ট ছিল না। আমেরিকা হইতে কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন শান্তিনিকেতনে একটি ভালোরকমের হাসপাতাল এবং টেকনিক্যাল বিভাগ খুলিবার ইচ্ছা

আছে। বোধ হয় সেই কথায় তাঁহারা পার্সি বোমানজি প্রদত্ত অর্থ হইতে কয়েকটি বিরাট টিনের ঘর নির্মাণ করান। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিকভাবে বা সুপরিকল্পিত প্ল্যানে নির্মিত হয় নাই। এই ঘরগুলির দক্ষিণতমটিতে ১৯১৮ সনে 'শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার' স্থাপিত হইল। সমবায় ভাণ্ডারের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সমবায় ভাণ্ডারে প্রত্যেক শিক্ষক, ছাত্র সদস্য হইলেন। আশ্রমের যাবতীয় সামগ্রী— কী রন্ধনশালার, কী দপ্তরখানা, গ্রন্থাগারের সকলপ্রকার সামগ্রী সমবায় ভাণ্ডারের মাধ্যমে সরববাহের ব্যবস্থা হইল। বিলাত হইতে লুজাক কোম্পানির বই লাইব্রেরিতে আসিত সমবায় ভাণ্ডারের নামে। সমবায় ভাণ্ডার যেন আশ্রমজীবনের অপরিহার্য অংশ হইয়া উঠিল।

কারখানাঘবের একটিতে একটি কলুর ঘানি বসানো হইল। কিন্তু তেলের চাহিদা কীরূপ, বাজার দরের সঙ্গে কীরূপ পড়তা পড়িবে— এ-সব বিবেচনা কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। খাঁটি তৈল হইল প্রচুর কিন্তু খরিদ্দার মিলিল না। কাহার পরামর্শে গোরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া ইলামবাজারে তৈল লইয়া যাওয়া হইল— পরদিন তৈল সমেত গাড়ি ফিরিয়া আসিল, খরিদ্দার নাই সেখানেও।

কারখানা ঘরে তাঁতের কাজ শুরু হয়। তাঁতি আসিল শ্রীরামপুব হইতে। মেয়েদের তাঁত শিখাইবার জন্য এক অসমিয়া তাঁতিনীকে আনানো হয়। সোৎসাহে শুরু হয় কাজ; তার পর কিছুকাল যাইতে না-যাইতে অসংখ্য ত্রুটি আবিষ্কৃত ও পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

পূর্তবিভাগে পরীক্ষা চলিতেছে। গ্রন্থাগারের দক্ষিণে সত্যকুটির, মোহিতকুটির ও সতীশকুটির নির্মিত হইয়াছিল; ঘরগুলি দোচালা খড়ের। এইবার শমীন্দ্রকুটির নির্মিত হইল। পাঠকের মনে আছে এখানে একটা ডোবা ছিল; সেটি ভরাট করিয়া টালির ঘর উঠিল। এ ছাড়া ছাত্রদের স্থানাভাব হইতেছে বলিয়া সত্যকুটির ও মোহিতকুটিরের মধ্যে এবং সতীশ ও শমীন্দ্রকুটিরের মধ্যে স্থান দুইটিতে দোতলা ঘর নির্মিত হয়। উপরে টালি দিয়া ছাওয়া ঘবের পরিবর্তন হইতে হইতে এখন যে তোরণ দেখা যায়, সেই রূপটি লইল। কুটিরগুলির মধ্যে যে তোরণ দুইটি নির্মিত হয়, তাহাই সুরেন্দ্রনাথের স্থাপত্যের হাতেখড়ি; ইহার পর সিংহসদন নির্মিত হয় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের প্রদত্ত দান হইতে। কোনো ইঞ্জিনীয়ার ইহার প্ল্যান করিলেন না; সহজ শৌখিনতা বা amateurishness হইতে ইহা পরিকল্পিত হইল। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র বীরেন্দ্রমোহন সেনেরও বড়ো কাজের হাতেখড়ি এইখানেই হয়। কবির মাথায় নানা খেয়াল— তাহারও পরীক্ষা চলিতেছে। স্টীমারে দেখিয়া আসেন— লোকে বাঙ্কে শোয়। কবি স্থির করিলেন একখানি খাটে যে স্থান অধিকার করে— সেখানে উপরি-উপরি দুইটি বাঙ্ক করিলে দ্বিগুণ ছাত্র থাকিতে পারে। তজ্জন্য প্রথমে চার খাটওয়ালা এক বিরাট বাঙ্ক হইল। কিন্তু শুইতে গিয়া ছেলেরা দেখে পাশ ফিরিলেই খাট ঘুরিয়া যায়। বরবাদ করা হইল সেটিকে। পরে সেটি মেরামত করাইয়া আমি লাইব্রেরিতে তিব্বতি পুঁথি রাখার ব্যবস্থা করি।

ইহার পর শমীন্দ্রকুটিরে বাঙ্ক হইল— কাঠের ফ্রেমে দড়ির ছাউনি। কিছুকাল পরে দেখা গেল ঘরজোড়া সেই অদ্ভুত খাটের দড়ি গেছে ঝুলিয়া, ছিঁড়িয়া। ঘর সাফ করা যায় না ভালো করিয়া— চারি দিকে খুঁটি ও পিল্‌পো! বরবাদ হইল সেই ব্যবস্থা।

বীথিকা ঘরে খাট উঠাইয়া ঢালা সিমেন্টের পাকা খাট বানানো হইল— মাঝে মাঝে

বই রাখিবার ইষ্টক-নির্মিত জলচৌকি। খড়ের চালের লম্বা ঘরে লাল রঙের সিমেন্ট দেওয়া ঘর-জোড়া খাট— মাঝে সরু পথ। তার পর মেঝে ভাঙিতে শুরু করিল; সময়মতো মেরামত হয় না বা সিমেন্ট মেরামতি বেশিদিন টেকে না বলিয়া গৃহের ক্ষতস্থানগুলি ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে। সে পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইল, আবার সেগুলি ভাঙা হইল— আবার খাট আসিল। এবার আসিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নির্মিত স্প্রিঙের খাট— বোধ হয় কয়েক শতই কেনা হইয়াছিল। হাসপাতালে রোগীর জন্য বা রাত্রে তাঁবুর মধ্যে কেবলমাত্র শুইবার জন্য যে স্প্রিং-খাট নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ছাত্রদের রাতদিন ধাম্‌সানিতে টিকিবে কেন? কয়েকমাস পরেই স্প্রিং গেল ছিঁড়িয়া— বসিলে উঠা যায় না, শুইলে বসা যায় না সে খাটে। তখন যদুনন্দন মিস্ত্রি লোহার পাত আনিয়া সেগুলিকে নূতন করিয়া তৈয়ারি করিতে লাগিল।

এইভাবে কতরকমের পরীক্ষা চলিতেছে তাহার তালিকা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। কিন্তু এইরকম এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা করিয়া, অনেক ঠেকিয়া, অনেক ঠকিয়া এই প্রতিষ্ঠান আগাইয়া চলিয়াছে। কবি যদি কোনো ছককাটা, ফর্মবাঁধা বিদ্যায়তনের সংবিধান ও কর্মপদ্ধতি অনুকরণ করিতেন, তবে হয়তো এখানকার কৃতকার্যতার তালিকা স্ফীত হইত; কিন্তু তাহা জৈব কলেবরের সৌন্দর্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইত না। কাল বদলের হাওয়ায় জৈবশক্তি হইতে কলীয় বিধির উপর মানুষের আস্থা বাড়িয়াছে।

৫১

১৯১৮ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে কবি আছেন দেহলিতে, রথীন্দ্রনাথরা আছেন বেণুকুঞ্জে। কবি এখন 'স্কুলমাস্টার'; প্রাতে তিনটি ক্লাস লন, সেগুলি ইংরেজির ক্লাস। তিনি কীভাবে ইংরেজি পড়ান, তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অষ্টমমান বা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য হইয়াছে রাস্‌কিনের সিলেক্‌টেড প্যাসেজ ও ম্যাথু আর্নল্ডের সোরাবরোস্তাম কাব্য। কবির অধ্যাপন পদ্ধতিকে অনুবাদ পদ্ধতিই বলিব। তিনি পাঠ্যগ্রন্থের পাঠ্যাংশটি ছাত্রদের সমক্ষে প্রথমে ধরেন না; বাংলায় ছোটো ছোটো বাক্য ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ মুখে মুখে দ্রুত করান। অনেকগুলি এই ধরনের বাক্য অনুবাদ করিতে করিতে ছাত্রের শব্দ সম্পদ ও বাক্যের গঠনপ্রণালী আয়ত্তে আসে; এইভাবে বাংলার বাক্যগঠন বিধি ও ইংরেজি সিনট্যাক্সের মূলগত পার্থক্য সম্বন্ধে বালকের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। তার পর শব্দগুলিতে বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও clauses যোগ করিয়া বাক্যটিকে দীর্ঘ, দীর্ঘতর ও জটিল করিয়া যাইতেছেন। কালে সরল বাক্যটি কখন যে জটিল বাক্যে পরিণত হইয়া গেল তাহা বালক বুঝিতেই পারিল না, সে বেশ-একটি বড়ো জটিল বাক্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এই পঠন খুব দ্রুত করাইতেন, যাহাতে বালকদের মনোযোগ পূর্ণভাবে পাঠে নিবিষ্ট রাখা যায়। ছাত্রদের মন সম্পূর্ণ সজাগ রাখা পঠনবিধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে পাঠ্যগ্রন্থের মূল বাক্যটির মধ্যে আসিয়া পড়িতেন,

সেই বাক্যটি হইত তাহাদের পাঠ্যগ্রন্থাংশ বা text, তাহারা খাতায় সেইটি লিখিয়া লইত; এতক্ষণ যাহা করিয়াছে, তাহা মুখে-মুখে। আমরা অন্য খণ্ডে ইহার ব্যাপক আলোচনা করিব।

এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পাঠের অগ্রসর কম হইত; সেইজন্য ইহার পাশাপাশি চলিত দ্রুতপঠন বা rapid reading। কবি বলিতেন যে বইয়ের সমস্ত শব্দ বুঝিতেই হইবে— তাহার কোনো অর্থ নাই; দ্রুত পাঠ অভ্যাস দ্বারা সমগ্রের বোধ যাহাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার; সেইজন্য খুব নীচের ক্লাস হইতে দুই-তিনখানা বই বৎসরের মধ্যে পড়াইয়া দেওয়া হইত। ম্যাকমিলান কোম্পানির চিলড্রেন্স ক্লাসিক্স নামে একটি গ্রন্থমালা ছিল— নানা বয়সের উপোযোগী করিয়া সেগুলি লিখিত। দ্রুতপঠনের জন্য সেই গ্রন্থমালা হইতে পাঠ্য নির্বাচিত হইত ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শান্তিনিকেতনে একটি মুদ্রাযন্ত্র আসিয়াছে, ছাত্রেরা নিজেরা কম্পোজ করিয়া তাহাদের textগুলি ছাপাইয়া লইত। দুইটি অ-মেধাবী ছাত্র কালে কম্পোজিটর হইয়াছিল।

ইংরেজি শিখাইতে গিয়া কবি লক্ষ করিতেছেন, বাংলা ও ইংরেজি দুইটি ভাষার বাক্যগঠনবিধি বা syntax সম্পূর্ণ পৃথক। ইংরেজি ও বাংলা একই সময়ে কীভাবে নির্ভুল করিয়া ভাষান্তর করা যায়— তাহাই একটা বড়ো সমস্যা । আজকাল ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষা হইতে বাংলায় গ্রন্থাদির তরজমা হইতেছে— অনেক সময়ে তাহা ভাবানুবাদ মাত্র এবং যেখানে মূলের সহিত মিল রাখিবার চেষ্টা হয়, সেখানে প্রায়ই দেখা যায় বাংলা অনুবাদটি সাহিত্যে আসর পাইবার অধিকার লাভ করে নাই। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ দুই ভাষার উপর অনুবাদকের সমান অধিকারের অভাব; অর্থাৎ দুই ভাষার শব্দ ও বাক্যের মূলগত অর্থবোধের অস্পষ্টতা।

সেইজন্য কবি নানাস্থান হইতে ইংরেজি অংশ সংগ্রহ করিয়া, তাহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে সেবার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যারা শান্তিনিকেতনে আছেন; কবি শান্তা ও সীতাদেবী এবং অন্য অনেককে ইংরেজি অংশ দিয়া তাহার অনুবাদ করিতে বলিলেন; তার পর প্রত্যেকটি অনুবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিতেন যাহাতে ইংরেজির কোনো শব্দ অননূদিত না থাকে এবং বাংলা শব্দগুলি মূলের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করে, অর্থাৎ ভাবানুবাদও নহে, শাব্দিক অনুবাদও না হয়— উহা যথার্থভাবে বাংলাসাহিত্যের ভাষা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িতেছে। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি জার্মান ভাষায় ১৯ শতকের গোড়ায় তরজমা করেন বিখ্যাত জার্মান কবি ও সাহিত্যিক শ্লেগেল। শতাধিক বৎসর পরে জার্মান সাহিত্যিকরা আজ বিচার করিয়া দেখিতেছেন যে শ্লেগেল নিজে কবি ছিলেন বলিয়া শেক্সপীয়রের অনুবাদে তাঁহার নিজ কাব্য প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে— মূল শেক্সপীয়র আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ। তাই তাঁহারা মনে করেন শেক্সপীয়রের নূতন করিয়া অনুবাদ হওয়া দরকার। আজ আমাদের দেশেও সেই সমস্যা; ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনাদি গ্রন্থের অনুবাদের কথা উঠিতেছে এবং সাহিত্য অকাদেমি এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ বিষয়ে কী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। প্রথম বর্ষের 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে।

৫২

১৯১৯ সনের এপ্রিল মাস— ১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে 'শান্তিনিকেতন' নামে চার পাতার এক পত্রিকা জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন প্রেসেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কবি এই পত্রিকার জন্য লিখিয়া দেন এই গানটি—

পাখি আমার নীড়ের পাখি,
অধীর হল কেন জানি।
আকাশ কোণে যায় শোনা কি
ভোরের আলোর কানাকানি।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত সফরকালে Centre of Indian Culture সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন আদৈরে ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটির চ্যান্সেলররূপে। দক্ষিণ ভারতের নানা শহরে কবি তাঁহার পরিকল্পিত নববিশ্ববিদ্যালয় যাহার নাম দেন 'বিশ্বভারতী' সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া বসুবিজ্ঞান মন্দিরে ইংরেজিতে ভাষণ পাঠ করেন। এই-সব বক্তৃতার সারমর্ম স্বয়ং লিখিয়া 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় "বিশ্বভারতী" নামে বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন (বৈশাখ, ১৩২৬)। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে এই প্রথম রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

'আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি।... সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি—

'মনের-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

'এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে তাহা কলের দ্বারা ঘটিতে পারে।

'ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে, তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল— এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।... অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যেমন আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন,

শিখ, মুসলমান, খৃস্টানদের মধ্যে বিভক্ত ও বিশিষ্ট হইয়া আছে, সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার বেলায়ও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে ; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানাবিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষাব মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিকায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পাবে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানেই, যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মণীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টিব কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন, সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারাব নির্ঝারিণী-তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল হইবে না।

'তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদেব দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে-প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যাবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লির মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।'

৫৩

১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল তাহার অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথ মে মাসের শেষে ব্রিটিশ সম্রাট প্রদত্ত স্যর উপাধি পরিত্যাগ করেন। এই-সব ঘটনার তরঙ্গ শান্তিনিকেতনকে স্পর্শ করে নাই। আশ্রম তাহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য-মধ্যে নিবিষ্ট ছিল।

গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রম ছাত্রশূন্য। শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন 'নূতন বাড়িতে' সপরিবারে। আমি বিবাহ করিয়া ২৯ মে শান্তিনিকেতনে আসিলাম; উঠিলাম পূর্বের 'সিগ্রিগেশনের' খড়ের বাড়িতে। আমাদের আনিবার জন্য দ্বিপুবাবুর ঘোড়ার গাড়ি স্টেশনে যায়। আসিয়া দেখি অভ্যর্থনার জন্য গভীর রাত্রে আশ্রম জননীরা ও বালিকারা অপেক্ষা করিয়া আছেন। এই-যে হৃদ্যতা, তাহা বিদ্যালয়ের বাহিরে যে আশ্রম-জীবন আছে, তাহারই প্রকাশ। আশ্রম তখন ক্ষুদ্র ছিল, যে কয়ঘর গৃহী-শিক্ষক ও কর্মী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। মনে আছে, দিনেন্দ্রনাথ আমাদের খড়ের ঘরের অত্যন্ত নিচু চালের দাওয়ায় বসিয়া মেয়েদের গান শিখাইতেন— সে-সব ফর্ম্যাল ক্লাস নহে— আনন্দের প্রকাশ মাত্র।

কলিকাতার সমস্ত উত্তেজনা অন্তে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ১৮ জুন, ১৯১৯; বিদ্যালয় খুলিল ২৪ জুন। আশ্রম বালকদের কলকোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল।

কবির ইঙ্গিত ভারতীয় বিষয়ের চর্চার জন্য 'বিশ্বভারতী'র কার্য আরম্ভ হইল ১৮ জুলাই। নূতন অধ্যাপকদের মধ্যে আসিয়াছেন সিংহল হইতে ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির নামে এক বৃদ্ধ ভিক্ষু; তাহার সঙ্গে দুইজন সিংহলী ছাত্র ধর্মদাস ও বুদ্ধদাস। পাণিনি ব্যাকরণে সুপণ্ডিত মৈথিলী কপিলেশ্বর মিশ্র আসিয়াছেন। বিধুশেখর কিছুকাল পূর্বে মালদহ হইতে ফিরিয়াছেন— ইনিই হইলেন বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ। আশ্রম ত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩৪) তিনি ষোলো বৎসর এই অধ্যক্ষতা করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ-দিনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে বলিলেন, 'কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হইয়াছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য-সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়।... শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।... এই অধ্যাবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে [স্কুলের] ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন।... এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।' ('বিশ্বভারতী', পৃ. ১৬-১৭)।

কবি তখন মনে করিতেন বহিরাগত সাময়িক ছাত্র-দ্বারা স্থায়ী বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র গড়িতে পারা যায় না; তাঁহার ধারণা আশ্রমের শিক্ষক ও অন্যান্য আশ্রমবাসী ও বাসিনীদের মধ্যে

জ্ঞানচেতনা উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিলে বিদ্যা এখানে স্থায়ী ফলপ্রসূ হইবে। শিক্ষকদের পক্ষে কেবলমাত্র 'স্কুলমাস্টার' হইয়া থাকিলে চলিবে না; তাঁহাদিগকে জ্ঞানান্বেষী হইতে হইবে, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ সাধ্য ও রুচিমতো এক-একটি করিয়া বিষয় নির্বাচন করিয়া লইয়া-অধ্যায়নরত ও গবেষণা-ব্রতী হইবেন— ইহাই ছিল বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনা। তখন আশ্রমে স্কুলই ছিল— সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষক শ্রেণী অধ্যাপনা করিতেন, কলেজের 'অধ্যাপক' শ্রেণীর লোক তখনো আমদানি হয় নাই। কবির ইচ্ছায় শিক্ষকরাই পড়াশুনায় মন দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাহিত্য পড়ান; ব্রাউনিং-এর দুরূহ কাব্য পাঠ ও ব্যাখ্যা তাঁহার কাছে এই প্রথম শোনা। এন্ড্রুজ পড়ান সমালোচনা সাহিত্য; ম্যাথু আর্নল্ডের-এর প্রবন্ধাবলী কেন্দ্র করিয়া ইংরেজি সাহিত্য আলোচনা হয়। বিধুশেখর হিন্দুদর্শন পড়ান। আমরা পড়ি তর্কসংগ্রহ। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অন্যান্য পাষণ্ড (heretic) মত আলোচনা করিয়া ছাত্রছাত্রীদের সেই-সব বিষয়ে গবেষণাদি করিতে প্রবৃত্ত করেন।

সিংহলী মহাস্থবির বৌদ্ধ দর্শন পড়ান। তিনি আধা-হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেন— আমাদের বোধগম্য হয় না সে-সব কথা। মহাস্থবির পড়াইবার সময়ে একখানি হাতপাখা রাখিতেন— মেয়েরা যেদিকে বসেন— সেইদিকে হাতপাখাটা ধরিয়া থাকেন— পাছে মেয়েদের মুখ দর্শন করিতে হয়। মনে আছে আমরা সকলেই ক্লাসে ভঙ্গ দিলাম। একদিন দেখি সেখানে বসিয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ ও বিধুশেখর।

মৈথিলী পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র পড়ান পাণিনি; অনেকেই 'অ ই উ ণ ঋ ৯ ক্' শুরু করিলেন— কিন্তু বড়ো বয়সে এভাবে ব্যাকরণ পড়িয়া সংস্কৃত আয়ত্ত করা যায় না— তাহা কিছুকালের মধ্যে সকলেই বুঝিলেন। স্কুলের ছাত্রদেরও লঘুকৌমুদী ধরানো হইল; কিন্তু মিশ্রজির মৈথিলীবাংলায় ব্যাখ্যা ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিল— ব্যর্থ হইল সে প্রচেষ্টা। রথীন্দ্রনাথ 'হলঘরে' (আদি কুটির) জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন— সেগুলি শুনিতে বেশ লোক হইত। অল্প কিছুকাল পূর্বে নরসিংভাই পাটেল নামে এক গুজরাটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন জার্মান-আফ্রিকা হইতে। তিনি জার্মান ভাষা জানিতেন— শিখাইতে আরম্ভ করিলেন ঐ ভাষা। বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন হিরজিভাই পেস্তোনজি মরিসওয়ালা নামে এক পার্সি যুবক। ইনি মরিস নামে চলিত ছিলেন। তিনি ফরাসি ভাষা জানিতেন— তিনি শুরু করিলেন ফরাসি পড়াইতে। মাঝে কিছুকাল পল রিশার নামে এক ফরাসি ভাবুক আশ্রমে আসিয়া বাস করিয়া যান। ইঁহার সহিত পিয়ার্সনের পরিচয় হয় জাপানে। তাঁহার লিখিত *To the nations* নামে এক বই-এর ভূমিকা কবি লিখিয়া দেন পিয়ার্সনের অনুরোধে। ইনি ফরাসী পণ্ডিচেরীতে ছিলেন অরবিন্দের সহিত যুক্ত; ইঁহার স্ত্রী মীরা রিশার এখন পণ্ডিচেরী আশ্রমে 'মাদার' নামে পরিচিত। পল রিশার শান্তিনিকেতনে বাসকালে কিছুদিন ফরাসি ভাষার ক্লাস লন।

এইরূপে ১৯১৯ সনে শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ উপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাশাস্ত্রীরূপে বিদ্যায়তন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মুখ্যত কবি ও শিল্পী— জীবনকে দেখেন সমগ্রের দৃষ্টিতে। তিনি জানেন জ্ঞানচর্চার সহিত যদি রসচর্চা জীবনে

অনুসৃত না হয়, তবে রসবর্জিত-জ্ঞান হইবে বন্ধ্যা। তাই বিশ্বভারতীর জ্ঞানচর্চার দীন আয়োজনের সহিত, দীনভাবেই কলাভবনের পত্তন, এবং সংগীতভবনেরও সূত্রপাত হইল।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে ড্রয়িং শিখাইবার জন্য আসেন ভার্নাকুলার ট্রেনিং-পাস নগেন্দ্রনাথ আইচ; তার পর আসেন ঢাকা জেলার ওঁকারানন্দ বা পাঁচু গোপাল। মুকুলদের চিত্রে হাতে খড়ি তাঁহার কাছেই হয়। শিশুদের ছবি ও ড্রয়িং শিখাইবার জন্য আসিলেন সন্তোষকুমার মিত্র প্রায় বালকবয়সে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল চিত্রবিদ্যায়। অতঃপর ১৯১৭ সনের জুলাই মাসে সুরেন্দ্রনাথ কর নামে এক যুবক শিল্পী আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কোনো আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন না। নন্দলাল বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ইনি; তাঁহার সুপারিশে অবনীন্দ্রনাথের কাছে বসিয়া তাঁহার শিল্পশিক্ষার সূত্রপাত হয়।

১৯১৯ সনে পূজার ছুটির পর নন্দলাল বসু আসিয়া শান্তিনিকেতনের কার্যে যোগ দেওয়াতে ছাত্রদের আর্টচর্চার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। বিশ্বভারতীর কলাভবনের সূচনা দেখা গেল।

বিশ্বভারতী আরম্ভের কিছুকাল পূর্বে নারায়ণ কাশীনাথ দেবল শান্তিনিকেতনে আসেন আর্টচর্চার জন্য। দেবলের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ১৯১০ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতায় বৎসর-দুই কলেজে পড়িয়া তিনি বিলাত যান ও সেখানে ভাস্কর্য-কলা অভ্যাস করিয়া কৃতিমান হন। শান্তিনিকেতনে আসিয়া নিচু-বাংলা অঞ্চলে একটি খড়ের ঘরে তিনি আশ্রয় লন। সেখানেই মূর্তি ভাঙেন, মূর্তি গড়েন— আপন মনে কাজ করেন। ১৯১৬ সনে আমেরিকা হইতে এক পত্রে কবি লেখেন, 'দেবলের কথা আমার সর্বদাই মনে হয়— তার কীরকম চলছে কে জানে। এখানকার Polish sculptor যদি ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে দেবলের খুব উপকার হবে।'

১৯১৮ সনে দেবল আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান— তার পর সেই প্রতিভাগ্নি কোথায় কীভাবে নির্বাপিত হইল, তাহার সন্ধান আর কেহ রাখিলেন না। অথচ, পরযুগে রামকিংকর এইস্থানে থাকিয়া আপনার শিল্পপ্রতিভাকে কী উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ যাহার মধ্যে প্রতিভা বা পরিশ্রমশক্তির সামান্য বিকাশ দেখিতেন, তাহাকে তাহারই পথে অগ্রসর হইবার সকলপ্রকার সুযোগসুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ রচনায় তাঁহার সাধ্যমতো সহায়তা দান করিতে কৃপণতা করিতেন না— তাহা সাক্ষ্য দিবার মতো লোক এখনো আছেন।

নন্দলাল বসু কয়েক মাস পরেই কলিকাতায় চলিয়া যান। অতঃপর ১৯১৯ সনের গোড়ার দিকে অসিতকুমার হালদার আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে তিনজন যুবক ছাত্র আসিলেন— একজন জৈন, তাঁহার নাম হীরাচাঁদ ডুগার— আজিমগঞ্জে বাড়ি। অপর দুইজন— অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ রায়।

"কলাবিদ্যা" প্রবন্ধে কবি লেখেন, 'ইংরেজ তো ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান সবই শিখিতেছে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখিতেছে। এই-সকল ললিতকলা শিক্ষাদ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব হইতেছে, এমন প্রমাণ হয় না। সংগীত নিপুণ বলিয়া জর্মান জাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চায় পিছপাও এ কথা কে বলিবে?... আনন্দকে আমাদের দেশেই বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্য ভোগকে

তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহাতে আমাদের প্রকৃত কর্মশক্তিকেই দুর্বল করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথের সংকল্প 'বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে।'

৫৪

শান্তিনিকেতনের আদিপর্ব হইতেই ছাত্রদের গান শিখাইবার ব্যবস্থা মাঝে-মাঝে হইয়াছিল! শিক্ষায় সংগীতের স্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পষ্ট মতামত তখনো কোথাও লিপিবদ্ধ পাই নাই, তবে গানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিধা কখনো দেখা যায় নাই। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি' এইটি হইতেছে কবি-জীবনের গানের প্রতি তাঁহার নির্গলিত বাণীর চরম রূপ। ছাত্রদের মধ্যে সেইটি সংক্রমিত করিবার চেষ্টা করিতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। একটি বড়ো অর্গ্যান বাজাইয়া অজিতকুমার ও বিপুল এক এসরাজ লইয়া দিনেন্দ্রনাথ ছাত্রদের গান শিখাইতেন। বোধ হয় ১৯১২ সনে মার্গসংগীত শিখাইবার জন্য দুইজন মুসলমান ওস্তাদ আসেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল আশ্রমে ছিলেন না— তাঁহারা মামুলি ওস্তাদ— বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিখাইবার কৌশলাদি তাঁহারা জানিতেন না বলিয়া মনে হয়। মনে আছে বিরাট এক তানপুরা লইয়া আধা উবু হইয়া বসিয়া বিকট মুখব্যাদন করিয়া গাহিতেছেন 'ভরভাতে উঠি আলবেলি'— আর সে কী অঙ্গভঙ্গি!

১৯১৪ সনে আসেন মহারাষ্ট্র দেশীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ ভীমরাও হসুরকর; ইনি গোয়ালিয়র গান্ধর্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র; সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—. মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা ও তেজের মূর্তি। তিনি স্বপাক খান, মাসের মধ্যে চার-পাঁচ দিন উপবাস করেন— চতুর্থী, একাদশী ইত্যাদি। মার্গসংগীত চর্চা ছাড়া, তিনি রবীন্দ্রসংগীত আয়ত্ত করেন নিপুণভাবে। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় অন্ধ্রদেশের পিঠাপুরমের রাজার দরবারের বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুকাল শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। ভীমরাও তাঁহার নিকট হইতে বীণবাদ্য শিক্ষা করেন— দক্ষিণী রুদ্রবীণ তখন এ অঞ্চলে প্রায় অজ্ঞাত। কী নিষ্ঠার সহিত, কী পরিশ্রম সহকারে ভীমরাও এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি! একবার গ্রীষ্মাবকাশে দেশে না গিয়া ভীমরাও পিঠাপুরমে সঙ্গমেশ্বরের কাছে মাসাধিক কাল কাটাইয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অনেকেই সেদিন গানের ক্লাসে ভরতি হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলের কণ্ঠে তো সুর দেবীর আবির্ভাব হয় না; ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভালো করিয়া শিখিল অনাদিকুমার দস্তিদার ও রমাদেবী বা নুটু, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী। বিশ্বভারতীর আরম্ভ-মুখে আসিলেন সুকণ্ঠ নকুলেশ্বর গোস্বামী; ইনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাগায়ক বিখ্যাত রাধিকামোহন গোস্বামীর ভ্রাতা। রাধিকামোহনও কয়েকবার আসেন— তাঁহার গান শুনিবার

সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। বাংলাদেশের মার্গ সংগীতধারা ও পশ্চিমভাবতের 'হিন্দুস্থানি' সংগীতধারা, দুইটি এখানে মিলিত হইল। এ ছাড়া আছে রবীন্দ্রসংগীত।

কবি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে জ্ঞানচর্চার জ৪ন্য আশ্রমের শিক্ষক ও বাসিন্দারাই বিশ্বভারতীর ছাত্র হইবেন; কিন্তু ১৯২৬ সনে জ্যৈষ্ঠমাসে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় লিখিত হইল যে যাঁহারা সংস্কৃত, 'বৌদ্ধদর্শন, চিত্রকলা বা সংগীতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করিতে চান, তাঁহাদেরই জন্য এরূপ আয়োজন করা যাইতেছে। এই-সকল ছাত্ররা যাহাতে নিজ-নিজ শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে পারেন তাহার অনুকূল ব্যবস্থা করা যাইবে। 'আহার, বাস, শিক্ষা, ঔষধ, ডাক্তার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি বাবদ ছাত্রদের মাসে কুড়ি টাকা খরচ লাগিবে।'

পরমাসে (আষাঢ়, ১৩২৬) 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় এই মর্মে বিজ্ঞাপনী-সংবাদ প্রকাশিত হইল— 'যাঁহারা সংগীত শিক্ষাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়াছেন, এপ্রকার ছাত্র আমরা আজও পাই নাই। আমরা জানি, কয়েকটি ব্যবসায়-গায়ক... প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন।.. কিন্তু কেবল ঐ কয়েকটি ব্যবসায়-গায়কের দ্বারা লোকের অভাব মোচন হইতেছে না।... কেবল সংগীত শিক্ষার জন্য ছাত্রেরা আশ্রমে আসিলে, দুই বৎসর বা তাহারো অল্প সময়ে রবীন্দ্রনাথের সকলপ্রকাব সংগীতে তাঁহাদিগকে পারদর্শী করা যাইতে পাবে।'

ব্যবসায়ী সংগীত-শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য এই যে আহ্বান, তাহা দ্বারা শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইল কি না, সেদিন উৎসাহের আতিশয্যে কবির মনে হয় নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। আশ্রম বিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রবেশ সম্বন্ধে বয়সের যে কঠোরতা ছিল, তাহা উঠিয়া গেল অন্যান্য বিভাগে। এই-সব ছাত্রদের জীবনে আশ্রম-আদর্শের প্রভাব কতখানি পড়ে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

সংগীতের সঙ্গে নৃত্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত; শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। 'বিসর্জন', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা' নাটক অভিনয় কালে গানের সময় নৃত্য স্বাভাবিক প্রাচুর্যে উছলিয়া উঠিত। সে নৃত্য শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না।

'শারদোৎসব' নাটকের অন্তর্গত 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' গানটিব সঙ্গে যে সামান্য নাচের তাল আছে, তাহা রিহার্সালেব সময় কবি স্বয়ং ছেলেদের দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' গানের সঙ্গেও যে পদচালনা ছিল, তাহা কবি স্বয়ং তাল দিয়া বালকদের শিখাইয়াছিলেন।

'ফাল্গুনী' অভিনয়ের সময় পদচালনা ও হাতের ভঙ্গি কিছুদূর অগ্রসর হয়; ইহাকে কিছুটা action song বলা যাইতে পারে; তবে তাহা নৃত্য নহে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে পূজাবকাশের পর (নভেম্বর, ১৯১৯) ত্রিপুরার আগরতলা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিংহ নামে এক মণিপুরি নৃত্যশিল্পী ও কারুকর শান্তিনিকেতনে আসেন, বালক ছাত্ররা তাঁহার নিকট খোলের বোলের সঙ্গে একপ্রকার ছন্দোময় নৃত্যশিক্ষা করে। ব্যায়াম ও নৃত্যের সমবায়ে ইহাকে rythmic dance বলা যায়; রবীন্দ্রনাথের একান্ত ইচ্ছা বাঙালির ছেলের দেহের আড়ষ্টভাব এই নৃত্যব্যায়ামের সাধনায় কাটিয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত সিংহ অল্পকাল পরেই ত্রিপুরায় ফিরিয়া যান এবং সেইসঙ্গে এই ব্যায়ামনৃত্যের অবসান হয়; নৃত্য স্বাভাবিকভাবে দেখা দিল 'নটীর পূজা'র সময়ে; সে কথায় আরো পরে আসিব।

৫৫

শান্তিনিকেতন বোর্ডিং স্কুলের খাদ্যসমস্যা স্থানিক সমস্যা নহে; এইটি নিখিল ভারতের সমস্যা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সমস্যাতে চিরন্তন, হিন্দুদের মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে খাদ্যের কোনো সাধারণ সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধর্মগত, সম্প্রদায়গত, প্রদেশগত, পরিবারগত অসংখ্য সংস্কারে মন আচ্ছন্ন। এই অবস্থায় একটি সর্বলোকগ্রাহ্য খাদ্যসূচী প্রণয়ন করা কঠিন।

শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিরামিষ আহার ছিল সার্বজনিক। শোনা যায়, মোহিতচন্দ্র সেন যখন বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন, তখন এখানে কিছুকাল আমিষ ভোজন প্রবর্তিত হয়; তার পর ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের সময় হইতে প্রাচীন আশ্রম আদর্শে নিবামিষ আহার চালু হইয়াছিল। ১৯০৫ হইতে ১৯১৮ সন পর্যন্ত নিরামিষ আহার প্রচলিত ছিল। রান্নাঘর ও ভোজনশালা শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের জমির বাহিরে নির্মিত; সুতরাং সেখানে আমিষ রন্ধনে ট্রাস্টের নিয়মভঙ্গ হয় না।

গুজরাটি ছাত্র আসিলে পাকশালায় নিরামিষ ব্যবস্থা পৃথকভাবেই করিতে হয়— তাহাদের নিজস্ব পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল— বাঙালি ব্রাহ্মণ তাহাদের কাছে অচল। গুজরাটিরা রুটি ও ভাত খায়— ঘিও খায়। বাঙালির ছেলে রুটি খাবে না; ভাত খায় মাড় বা কাঞ্জি ফেলিয়া। ঘৃত বা দুগ্ধের দাম বেশি ও বিশুদ্ধ জিনিস দুষ্প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার পাকশালার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কারণ অভ্যাস-দোষে কোনো পরিবর্তনই ছাত্র-শিক্ষকদের মনঃপূত হইত না। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'র (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৬) এই বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন 'পোষণগুণ (nutritive) বিচার করিয়া আহার ব্যবস্থা বাঁধিয়া দিবার প্রধান অন্তরায় রসনার গোঁড়ামি।... এই... গোঁড়ামি বাঙালির ছেলের অত্যন্ত প্রবল।' য়ুরোপে মোটামুটিভাবে খাদ্যবস্তুর একটা মান স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে; প্রায় সকল দেশের হোটেলেই এমন খাদ্য পরিবেশন হয়, যাহা প্রায় সর্ব য়ুরোপীয় বলা যাইতে পারে। ভারতে সর্বজাতীয় লোকের উপযুক্ত, রুচিসম্মত, পোষণগুণসম্পন্ন খাদ্য এখনো নির্ণীত হয় নাই।

আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যচেতনা জাগ্রত করিবার জন্য এইবার ৮ পৌষ আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য-বিশারদ ডাক্তার চুনীলাল বসুকে সভাপতি করিয়া আনা হইল। তিনি পোষণগুণযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে ভাষণ দান করিলেন। রবীন্দ্রনাথও সভাশেষে এই বিষয়ে কিছু বলেন—

'সমস্ত দেশের হইয়া এখন ভাবিতে হইবে কী করিলে আমাদের এই বর্তমান খাদ্যাভাবের মধ্যেও ব্যবস্থা করিয়া দেশের লোককে আমরা উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারি। দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা সহজলভ্য, এমন সমস্ত নূতন নূতন পুষ্টিকর খাদ্য আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, যে-সব খাদ্য সুলভ অথচ সারবান, সেগুলি আহার করিবার অভ্যাস করা আমাদের পক্ষে গুরুতর কর্তব্য। চীনেবাদাম, ছাতু, নারিকেল প্রভৃতি জিনিসকে আমাদের প্রধান খাদ্যশ্রেণীতে পরিণত করার সাধনা সমস্ত জাতির আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা মনে রাখিয়া খাদ্য

সম্বন্ধে আমাদের রুচিকে নূতন শিক্ষাদান করার সময় আসিয়াছে।' ('শান্তিনিকেতন পত্রিকা', মাঘ, ১৩২৬)।

কবির আশা শান্তিনিকেতনে যদি খাদ্যসংস্কার সম্ভব হয়, তবে ইহা একদিন নিখিল ভারতীয় খাদ্যসমস্যাকে সমাধানের পথে লইয়া যাইতে পারিবে।

বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য খাদ্যসমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় বুঝিয়া কবির অনুরোধে হেমলতাদেবী ও কমলাদেবী (দিনেন্দ্রনাথের পত্নী) নিচু-বাংলার বাড়িতে শিশুদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু দীর্ঘকাল তাহা চলে নাই। এ ছাড়া স্কুলের নিজস্ব ব্যবস্থায় ভদ্রঘরের মেয়েদের নিযুক্ত করিয়া শিশুদের খাদ্যোন্নতির চেষ্টা হয়। কিন্তু এ-সব ব্যবস্থায় ঠিক পোষণগুণসম্পন্ন খাদ্য ও balanced diet প্রদান করা হইত না— ভোজ্যপদার্থ মুখরোচক করিয়া অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাওয়া বৃদ্ধি করা হইত— খাদ্য সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে— নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন, উন্মুক্ত স্থানে বাস করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। আমাদের ফুটবল টিম ছিল অজেয়। এখানকার ছাত্ররা সিউড়ির বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অধিকাংশ পুরস্কারগুলি লুটিয়া আনিত। পরিশ্রমের কাজ করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ হইত না।

৫৬

শান্তিনিকেতন বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের সময় কবি শিক্ষার বৃহত্তর পটভূমি সম্বন্ধে পত্র ও প্রবন্ধ লিখিয়া নিজের মনের কাছে ও অপরের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন— এবারও বিশ্বভারতী-পরিকল্পনা লইয়া সেইরূপ পত্র ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন— খানিকটা নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া ও খানিকটা অন্যদের নিজের মত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিবার আগ্রহ। 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। "অসন্তোষের কারণ", "বিদ্যার যাচাই", "বিদ্যাসমবায়", "মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়" প্রভৃতি প্রবন্ধে কবি স্বীয়মত ব্যক্ত করেন।

১৯০১ সনে বালক রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাসমস্যা হইতে কবি শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনে উঠাইয়া আনিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়-রূপ দান করিয়াছিলেন; এবার যুবক রথীন্দ্রনাথকে কলিকাতার ব্যাবসার ব্যর্থতা হইতে মুক্ত করিয়া শান্তিনিকেতনের সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রে সহায়তা করিবার জন্য আনিলেন।

রথীন্দ্রনাথ আসিয়া উঠিলেন বেণুকুঞ্জের খড়ের ঘরে। কবি তখন থাকেন দেহলিতে। দেহলির সম্মুখে পিয়ার্সন একটি একতলা বাড়ি করাইয়াছিলেন। সেই বাড়িতে আছেন দিনেন্দ্রনাথ, তখন চায়ের মজলিশ জমে এই বাড়িতে। এই বাড়ির নাম হয় 'দ্বারিক'। বাড়িটি ১৯৫৬ সনে ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়। এখন উহার চিহ্নমাত্র নাই।

৫৭

১৯১৯ সনে পূজাবকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ আসাম সফরের পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া দেহলির বাড়িতে উঠিলেন না— আশ্রমের উত্তরে প্রান্তরের মধ্যে তাঁহার বিশেষ ফরমাইশে যে পর্ণকুটির নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে উঠিলেন। কালে এই পর্ণকুটিরকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরায়ণের অট্টালিকা নির্মিত হয়।

সেই পর্ণকুটিরে কবি সন্ধ্যার সময় ক্লাস লইতেন— হুইটম্যান, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার, ব্রাউনিং, জাপানি কবিদের কবিতা ও লেসিং-এর 'নাথান দি ওয়াইজ'-এর অনুবাদ পড়িয়া শোনান; এ ছাড়া আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা 'Personality' হইতেও কিছু পড়েন ও আলোচনা করেন।

এ বৎসর সাতই পৌষের পরদিন শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক সংঘের বা প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য নির্মিত কুটিরের উদ্বোধন হইল; এবারকার বার্ষিক সভায় কবিই সভাপতি। এই কুটিরের কোনো চিহ্ন এখন নাই— ইহা বর্তমানে চীনাভবনের অন্তর্গত হইয়াছে। প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য আর-একটি গৃহ পরে শ্রীনিকেতন যাইবার পথে নির্মিত হয়।

১৯১৯ সনে বিশ্বভারতী-পরিকল্পনা গ্রহণ হইতে আশ্রম-বিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিভাগীয় কার্য পরিদর্শন ও পরিচালনার জন্য ক্ষিতিমোহন সেনকে সর্বাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করা হয়। ব্যবস্থাপক সভার (কর্মসমিতি) সদস্যদের উপর এক-একটি বিষয় তথা বিভাগের ভার অর্পিত হইল। প্রমদারঞ্জন ঘোষ শিক্ষাবিভাগের, রথীন্দ্রনাথ পূর্ত ও শিল্পবিভাগের, জগদানন্দ রায় উদ্যান ও শান্তিনিকেতন প্রেস, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সমবায়-ভাণ্ডার ও গোশালা, গৌরগোপাল ঘোষ ছাত্রপরিচালনা, নেপালচন্দ্র রায় আয়-ব্যয় বা ফিনান্সের ভার গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রেসের ভারপ্রাপ্ত হন।

ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১৩৫ জন বাঙালি, কচ্ছি ও গুজরাটি ২৩, সিন্ধি ২, বিহারি ২, সিংহলি ২, মহীশূরি, নেপালি, খাসিয়া একজন করিয়া। সুতরাং বিদ্যালয়ের খানিকটা সর্বভারতীয় রূপ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। শিক্ষকদের সংখ্যা ২৩। গুজরাটি শিখাইবার জন্য একজন শিক্ষক আসেন— ইঁহার নাম নরসিংভাই পাটেল— ইঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

আমাদের আলোচ্যপর্বে চিত্রশিক্ষা ও সংগীতশিক্ষা পৃথক বিভাগরূপে গঠিত হয় নাই। চিত্র-শিক্ষাবিভাগ সুরেন্দ্রনাথ কর ও নন্দলাল বসুকে দিয়া আরম্ভ হয় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু অল্পকাল পরে নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আহ্বান করিয়া লইয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ একাই ছাত্রদের শিক্ষা দিতে থাকেন, তবে কয়েক মাস পরে অসিতকুমার হালদার বিশ্বভারতীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া আসেন (১৯১৯)। নন্দলালও ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আশ্রমের কার্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সংগীতবিভাগের কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। 'বিশ্বভারতী' বলিতে তখন উচ্চ জ্ঞানচর্চার জন্য যে বিভাগ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাকে বুঝাইত। ১৯১৮ সনের ৮ পৌষ (১৩২৫ সাল) বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হইলেও ১৯১৯ সনের জুলাই মাসের পূর্বে ইহার অধ্যায়ন-অধ্যাপনা কার্য আরম্ভ হয় নাই। এই বিভাগের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্ত হন বিধুশেখর,

তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বিশ্বভারতীর প্রথম কর্মকর্তাদের নাম প্রদত্ত হইতেছে—

বিধুশেখর শাস্ত্রী— সভাপতি; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সম্পাদক; অন্যান্য সদস্য— নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ভীমরাও শাস্ত্রী ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর হিসাবপত্র ১৩২৬ আষাঢ় হইতে পৌষ (জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯১৯) পর্যন্ত ও ছয় মাসের প্রতিবেদন পৃথকভাবে প্রদত্ত হয়। পর বৎসর ১৯২০ সনের প্রতিবেদন পৃথকভাবে মুদ্রিত হয় বটে, তবে হিসাব শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের সহিত একত্রই দেখানো হয়।

শান্তিনিকেতন ব্যবস্থাপক সভা বা কার্যনির্বাহক সভায় বিশ্বভারতী হইতে মনোনীত ব্যক্তি সদস্যরূপে উপস্থিত হইতেন। তেমনি শান্তিনিকেতন সমিতিতে আশ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ১৯১৬ সন হইতে প্রবর্তিত হয়। ১৯২০ সনে সংঘের শেষ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া আসে। তাহার পর বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হইলে সংবিধানও নূতনভাবে গঠিত হয়— তখন নির্বাচনবিধির পরিবর্তন হয়; সে কথা পরে আসিবে।

আশ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি ১৯১৬ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত যাঁহারা শান্তিনিকেতন সমিতিতে নির্বাচিত হইয়া আসেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দিতেছি— বিশ্বেশ্বর বসু (১৯১৬); সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৯১৭); নারায়ণ কাশীনাথ দেবল (১৯১৮); সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৯১৯); সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২০)।

৫৮

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে শিক্ষকদের জন্য গৃহনির্মাণের প্রশ্ন উঠে নাই; কারণ তৎকালীন নিয়মানুসারে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের সহিত তাহাদের আবাসে বাস করা ছিল আবশ্যিক। শিক্ষকদের মধ্যে জগদানন্দ রায় শালতলার এক মাটির বাড়িতে সপরিবারে বাস করিতেন; তাহার কারণ অকালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়; শিশুদের লইয়া খুবই বিব্রত হইয়া পড়িলে তাঁহার জন্য ঐ ঘরের ব্যবস্থা হয়। হরিচরণ, রাজেন্দ্র, হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি থাকেন গাবতলার কুয়ার ধারে একটি খড়ের ঘরে। অতঃপর 'নূতন বাড়িতে' নেপালচন্দ্র, ক্ষিতিমোহন, সুধাকান্ত সপরিবারে বাস করেন। কোনো সময়ে আমরাও ছিলাম। এইভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্ব কাটিয়া যায়। গুরুপল্লীর এক কুটিরে বিশ্বভারতী পর্ব সূচিত হইলে গৃহ-শিক্ষকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। সেই সময়ে আজ যেখানে পূর্বপল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে— উহা ছিল সীমাহীন প্রান্তর। ঐ অঞ্চলে ছিল একখানি ঘর— সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের একটি কোঠাবাড়ি ও তাঁহার শতাধিক বিঘা ডাঙা-জমি। সন্তোষচন্দ্রের জমির বাহিরে প্রান্তর-মাঝে রথীন্দ্রনাথ এক লেবুবাগান পত্তন করিলেন। স্থানটি বিশ্বভারতী হইতে কেনা হয় বলিয়া প্রকাশ। বাগানের জন্য বিরাট এক ইঁদারা নির্মিত হইল। বাগান দেখিবার জন্য মণিপুরি মালী আসিল। মণিপুরিরা যে বাংলা পড়ে এবং 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের খোঁজ করে, তাহা এই প্রথম জানিলাম। বোলপুরের ডাঙা-জমিতে

লেবুগাছ যে হয় না— সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে বেশ কিছু টাকা ব্যয়িত হয়। কালে উহা পরিত্যক্ত হয়। বিরাট কূপটি ও তৎসংলগ্ন জমি— বিশ্বভারতী যখন পূর্বপল্লীর জমি বিলি করেন— তখন সুকুমার দাসগুপ্তের অংশে পড়ে। এখন সেই অঞ্চলে রথীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত উদ্যান-নগরীর বা গার্ডেন সিটি গড়িয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

শিক্ষকদের জন্য গৃহ নির্মাণের কথা কর্তৃপক্ষের মধ্যে চলিতেছে। একদিন দেখা গেল রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্র কর আশ্রমের দক্ষিণ প্রান্তে, ধানখেতের কাছে 'গুরুপল্লী'র পত্তনের জন্য মাপজোক করিতেছেন। এই-সব জমি ছিল দ্বিপেন্দ্রনাথের। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহাদের বৈষয়িক বিলি-ব্যবস্থায় এই দক্ষিণ অঞ্চল রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত হন। এখন যেখানে চীনাভবন ও হিন্দিভবন, এ-সব নিচু-বাংলার এলেকাভুক্ত ছিল— ইহার মালিক ছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথ। আমরা বিবাহের পর ছোটো একখানি খড়ের ঘর তৈয়ারি করিবার জন্য দ্বিপেন্দ্রনাথের কাছ হইতে একটুকরা জমি চাই। তিনি আমাকে জমি দান করিয়া বলেন 'প্রভাত এ জমি বহুলোক চাহিয়াছেন কাহাকেও দিই নাই; তোমায় দিলাম— কারণ তোমরা কর্তামশায়কে (মহর্ষিকে) শ্রদ্ধা কর।' এই জমিতে ঘর করিবার ব্যবস্থা করিতেছি— এমন সময় শুনিলাম গুরুপল্লী পত্তন হইতেছে এবং সেখানে ভাড়া দিয়া বাড়ি কিনিবার (hire purchase) ব্যবস্থা হইতেছে। আমি তখন দ্বিপুবাবুর জমি ছাড়িয়া দিলাম। গুরুপল্লীতে দক্ষিণগামী পথের উপর আমার প্লট নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল বিদ্যালয় হইতে ৫০০ টাকা আগাম দেওয়া হইবে— পরে আবও ৩০০ টাকা কবিয়া প্রদত্ত হয়। এই ৮০০ টাকার সুদ ও আসল শোধের জন্য মাসিক ৮ টাকা হিসাবে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইল। আমরা তিন-ঘর— আমি, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসে মাসে আট টাকা এক বৎসর দিই এই ভরসায় যে এই বাড়ি কয়েক বৎসর পরে আমাদের নিজস্ব গৃহ হইবে। বাড়ি শেষ হইল ১৯২১ সনে। এক বৎসর পরে শুনিলাম যে পূর্বের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে— এখন হইতে বাড়ি ভাড়া ৫ টাকা করিয়া দিতে হইবে। সেইসঙ্গে আরো নিয়ম হইল রান্নাঘর হইতে শিক্ষকরা যে খাদ্য পাইতেন— তাহাও বন্ধ হইবে— তবে তাঁহাদের বেতন ১৫ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে হাসপাতালের জন্য গৃহস্থদের মাসিক আট আনা প্রদানেব ব্যবস্থা হইয়াছিল। অর্থাৎ শিক্ষকদের সুখ-সুবিধা (amenities) কমাইয়া বেতন বৃদ্ধি করা হইল।

গুরুপল্লীর পূর্বপ্রান্তে এখন যেখানে কলের-জলের ইমারত নির্মিত দেখা যায়— সেখানে ১৯১৭ সনে গিরিডিবাসিনী সরসীবালা দেবী নামে এক সাহিত্যিক মহিলা একখানি মাটির ঘর তৈয়ারির অনুমতি পান। কিয়দ্দুর ঘর নির্মাণের পর তাঁহাকে উহা বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ হয়। কেন-যে তাঁহাকে ঘর নির্মাণের অনুমতি দেওয়া এবং কেনই-বা তাহা নিষিদ্ধ হয় জানি না। তার পর দারা নামে এক পার্সি ছাত্র নিজ ব্যয়ে ঘরটি বাসোপযোগী করিয়া লয়। শুনিয়াছি দারার পিতা ফরমদজি মনচারজি দাদিনা দাদাভাই নৌরজির দূর আত্মীয়। বোম্বাই-এ পুত্রের লেখাপড়া হইতেছিল না— ভাবিলেন শান্তিনিকেতনে দিলে তাহার পাঠোন্নতি হইবে। দারা আপনমনে নিজ ব্যয়ে পৃথক বাড়িতে থাকে, তাহার সঙ্গী একটি বানর; পড়াশুনার দিকে তাহার কোনো উৎসাহই ছিল না। আবাসিক বিদ্যালয়ে এভাবে পৃথক গৃহে স্বাধীনভাবে ছাত্রকে থাকিতে দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ চিন্তা

করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, দারা কিছুকাল পরে চলিয়া গেলে ঐ পরিত্যক্ত বাড়ি মেরামত কবিয়া নন্দলাল বসু সপরিবাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে গুরুপল্লী রচনার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক অনুমোদিত হওযায় সাতখানি ঘর অল্পকাল-মধ্যে নির্মিত হইয়া গেল (১৯২১)।

এই কুটিরগুলিতে প্রথমে কাহারা বাস করিতেন, তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। পূর্বতম কুটিরে নন্দলাল বসু। তার পর ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ধীমু), তৃতীয়টিতে সুধাকান্ত, পরে সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় (এখন সে-কুটির নিশ্চিহ্ন), পরবর্তীটিতে আমরা (বর্তমানে গোঁসাইজি); পঞ্চমটি নির্মাণ করেন প্রমদারঞ্জন ঘোষ। কিন্তু তিনি মাঝে কয়েক বৎসর (১৯২০-২২) কোচবিহারে চলিয়া গেলে সেখানে আসেন গুজরাটি শিক্ষক নরসিংহ ভাই পাটেল। তৎপরবর্তী কুটিরে হবিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পাশের বাড়িতে ক্ষিতিমোহন সেন এবং তৎপার্শ্ববর্তী গৃহে নেপালচন্দ্র রায়। পশ্চিমদিকে একটি বড়ো ঘরে দুইটি পরিবাব বাস করিত— একটিতে বীরেশ্বর নাগ ও অপরটিতে কালিদাস দত্ত, পুরাতন ছাত্র— তখন সমবায় ভাণ্ডারে কিংবা অফিসে কাজ করিত। এই বাড়ির পশ্চিমে পরে অজিতকুমার চক্রবর্তীব বিধবাপত্নী লাবণ্যলেখাকে নিজখাতে প্রাইভেট বাড়ি করার অনুমতি দেওয়া হয। আমিও আমার বাডির পিছনে আমার ভগ্নীর থাকিবার জন্য গৃহ-নির্মাণের অনুমতি পাইয়া একটি কুটির নির্মাণ করি। নগেন্দ্রনাথ আইচকে নিচু-বাংলার নিকট প্রাইভেট বাড়ি নির্মাণ করাব অনুমতি দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ কব খড়ের যে ঘরটি নির্মাণ করেন তাহাও বিশ্বভারতীর জমির মধ্যে ছিল। প্রাইভেট বাড়ি নির্মাণ কবিতে দিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা হয নাই বলিয়া মনে হয়।

১৯২০ সনে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে কাঠিয়াবাড়েব রাজমহারাজাদেব নিকট হইতে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সাহায্য পান। লিমডিব মহাবাজ বিশ্বভারতীর কর্মীদের স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের জন্য দশহাজার টাকা দান করেন। এই টাকার সুদ হইতে কর্মীদের শৈলবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। আমি দার্জিলিং যাইবার জন্য অনেক লেখালেখি করিয়া কুড়ি টাকা আদায় করিয়াছিলাম; আর কেহ পাইয়াছিলেন কি না জানি না।

অবশেষে সেই দশহাজার টাকা সাধারণ তহবিলের (General fund) অন্তর্গত হয়। দাতার ইচ্ছার অনুরূপ কাজ হয় নাই এরূপ ঘটনা একাধিক ঘটে। হিরজীবাঈ পান্থশালা কিছুদিন পিওন, দারোয়ান ও নাপিতদের বাসস্থান হইয়াছিল। বর্তমানে N.C.C. অফিস। কাদুরজি ওযাটার ওয়ার্কসের নামে আজ কে জানে? জীবনলাল কোম্পানির জিমনেসিয়াম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সে-সব ইতিহাস শুনাইয়া লাভ কী?

৫৯

বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভের বৎসরকাল পূর্ণ হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথ ও তদীয় পত্নী প্রতিমা দেবীকে লইয়া য়ুরোপ যাত্রা করিলেন (মে, ১৯২০)। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপ তাহার পুনর্গঠন কীভাবে করিতেছে, তথাকার মনীষীগণ জাগতিক সমস্যা সম্বন্ধে কী চিন্তা করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার ও বুঝিবার ইচ্ছায় এবারকার য়ুরোপ যাত্রা।

য়ুরোপ-আমেরিকা সফর করিয়া চৌদ্দমাস পরে ১৯২১ সনের জুলাই মাসে কবি দেশে ফিরিলেন। এই বৎসরটি ভারত ইতিহাসে গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের জন্য সুবিদিত। ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে— ২ জুন, ১৯১৯ কবি 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন— এ কথা অনেকেই জানেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দেড় বৎসর পরে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর, ১৯২০) অসহযোগ আন্দোলন গ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কী রাজনৈতিক কারণে এই আন্দোলনের অভ্যুদয় সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে স্থির হইল যে ইংরেজের শাসনকার্যে কোনোরূপ সহয়তা করা আর চলিবে না। ছাত্রদের বলা হয় স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া গ্রামে গিয়া কাজ করিতে; চাকুরেদের বলা হয় সরকারি কর্ম ছাড়িতে; উপাধিধারীদের অনুরোধ করা হয় সরকারি উপাধি ফিরাইয়া দিতে।

কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর গান্ধীজি কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলেন; এই-সব ব্যবস্থা এন্ড্রুজই করিতেছেন।

গান্ধীজি যখন আশ্রমে আছেন, তখন খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা সৌকত আলি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ, এতদিন এখানে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে গোঁড়ামি ছিল হঠাৎ তার পরিবর্তন হইল রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে। বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বয়ং সৌকত আলিকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া গিয়া আহার-স্থানে বসাইলেন। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা-আগরতলার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ডাক্তার কাজি সাহেবের পুত্র রবি কাজিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে রাখার প্রস্তাবে কত প্রশ্নই উঠে— এক আচ্ছাদনের নিম্নে হিন্দুমুসলমান কেমন করিয়া আহার করিবে— পরিবেশনের পর মুসলমানকে খাদ্য দিয়া উদ্‌বৃত্ত খাবার কোথায় রাখা যাইবে, এ-সব উৎকট সমস্যার উদ্‌ভাবক ছিলেন ব্রাহ্মণ শিক্ষকগণই।

কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস অধিশেনের সংবাদে শান্তিনিকেতনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা গান্ধীজির আগমনে বহুগুণিত হইয়া উঠিল। অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিভৃত কোণে আপন মনে জ্ঞানালোচনায় নিমজ্জিত; গান্ধীজি এক বৎসরের মধ্যে দেশে 'স্বরাজ' আনিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন জানিতে পারিয়া খুবই উত্তেজিত হইয়া উঠেন ও গান্ধীজিকে মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করেন। গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসিয়া 'বড়দাদা'র (দ্বিজেন্দ্রনাথের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

পূজাবকাশের পরেই ম্যাট্রিকুলেশন প্রার্থীদের 'টেস্ট'। তখন 'টেস্ট' দিতে হইত কোনো জিলা স্কুলে অথবা ইন্সপেক্টরের অফিসে। পরীক্ষার্থীকে লিখিতে হইত যে গত বারো মাস সে কোনো বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে নাই— তবেই সে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী বলিয়া শিক্ষাবিভাগের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করিত। এতদিন পরে not read in any school এই কথাটি লেখার মধ্যে মিথ্যার সহিত আপসের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইল। এন্ড্রুজ আদর্শবাদ হইতে অসহযোগ আন্দোলনকে দেখিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এতকাল ছাত্রের আবেদনপত্রে 'সে বিদ্যালয়ে পড়ে নাই' বলিয়া মন্তব্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন ইহার মধ্যে যে 'মিথ্যা' উক্তি দেখিতেছেন— ইহাকে আমরা বলিব Second thought। গান্ধীজি বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি আওতা হইতে বাহিরে আনিবার জন্য আহ্বান দিয়াছেন— শান্তিনিকেতনকে সেই আহ্বানে জড়িত করিবার জন্য আন্দোলনকারীরা উদ্‌গ্রীব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়া স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজের নিকট হইতে আশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পাইতেছেন। তিনি বারে বারে লিখিতেছেন যে আশ্রমকে রাজনীতির তপ্ত হাওয়া হইতে দূরে রাখিতে হইবে— সেখানে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ প্রতিষ্ঠিত— কোনো সাময়িক উত্তেজনা যেন ইহার মূলকে আঘাত না করে।

ম্যাট্রিকুলেশনের উপর কবির মনোভাব কখনো প্রসন্ন ছিল না; তাই তিনি একবার আমেরিকা হইতে লেখেন— 'Let it go; I have no tenderness for it.'

কিন্তু কবির মনে দ্বিধা যাইতেছে না। তিনি বাস্তববাদী। তিনি জানেন সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া বিদ্যা অর্থশূন্য। তাই একখানি পত্রে লিখিতেছেন— 'ম্যাট্রিক আমার মনেরমতো জিনিস নয়— কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক যখন এটা চায়, তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত করতে আমি এ পর্যন্ত পারি নি। আমার ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ পাকা করে তুলে মাত্রিক এবং অমাত্রিক এই দুই ধারা রক্ষা করব, শেষকালে দুই ধারা যথাসময়ে একে একে মিলবে। আমি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই কোনো ছাত্রকে কাঁদিয়ে বিদায় করতে পারতুম না। এ সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করি নে কারণ ওটা ভূতের মতোই আমাদের বিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপেছিল— গেছে আপদ গেছে। কিন্তু আমার আপত্তি বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হল না, এটা হল নন্-কোঅপারেশন পর্বের একটা অধ্যায়রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে, সেইসঙ্গে তার অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েছে— তার ব্যথা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।'

ভবিষ্যতে ম্যাট্রিকুলেশন থাকা-না-থাকা লইয়া যখন শিক্ষকরা কলহে মত্ত সেই সময়ে ঐ বৎসরে যে-সব ছাত্র ইন্সপেক্টর অফিসে টেস্ট দিয়াছিল তাহাদের একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ বা allowed হওয়ার পত্র না পাইয়া আত্মঘাতী হয়। ত্রিপুরা জেলা-আগত দ্বিজেন্দ্র পাল ও মাখন পাল দুই ভাই টেস্ট দেয়। প্রথম দিনের ডাকে কনিষ্ঠের উত্তীর্ণ হবার সংবাদ আসিলে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র মনে করিল সে ফেল করিয়াছে; সেই লজ্জায় সে রেলের তলায় মাথা দিয়া মরিল। পরদিন প্রাতের ডাকে তার পাসের খবরের পত্র আসিল। সে সংবাদ সে আর পাইল না। এই ঘটনায় সকলেই পরীক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং পরীক্ষা

লোপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

১৯২১ সনের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের জন্য পঠন-পাঠন পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু বিকল্প পাঠক্রম রচিত হইল না। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে অসহযোগের প্রশ্ন লইয়া দুইটি দল হইয়া গিয়াছে। এন্ড্রুজ, বিধুশেখর, অনিল মিত্র, সিন্ধি ডাক্তার চিমনলাল প্রভৃতিরা অসহযোগী; অপর পক্ষে জগদানন্দ রায়, প্রাক্তন ছাত্র যাঁহারা এখন শিক্ষক ও আমি। সভা-সমিতিতে প্রতিরোধ করিতাম আমি— মুখরতার কুখ্যাতি ছিল আমার। একদিন নিচু-বাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখে এই-সব কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। আমি বলিলাম— আশ্রমে রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে পারে না— ইহা কাশীর ন্যায় পৃথিবীর বাহিরে; এখানে 'বেনো' জল ঢুকিতে দিতে পারা যায় না। 'বেনো' জল কথাটি যে দুই অর্থ হইতে পারে, তাহা ভাবি নাই— কারণ গান্ধীজি বেনিয়া। দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার এই মন্তব্যে খুবই বিরক্ত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু আমি জানিতাম আমি যে প্রতিরোধিতা করিতেছি, তাহা রবীন্দ্রনাথের আদর্শের অনুকূলে। মনে আছে দ্বারিকের উপরতলায় অধ্যাপকমণ্ডলীর সভা হইতেছে, আমি অসহযোগীদের প্রতিবাদ করিতেছি। এন্ড্রুজ তাঁহার স্বাভাবিক ধৈর্য বক্ষা করিতে না পারিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'Probhat, you are driving me, Shastry mahasay and others from the School'। আমি তাঁহার কথায় হাসিয়া উঠিলাম; বলিলাম 'সেও কি সম্ভব মি. এন্ড্রুজ।'

বিদ্যালয়ের কার্য চলিতেছে যথাযথভাবে। উপরের দুইটি ক্লাসকে 'বিশ্বভারতী'র অন্তর্গত করা হইল। ম্যাট্রিকুলেশন উঠানো হইল; কিন্তু তাহার স্থলে কী হইবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কাহারো নাই বলিলেই হয়। তবে Andrews কবিকে লিখিলেন Oxford-এর All Souls' College-এর মতো গবেষণার জন্য বিশ্বভারতীকে গঠন করিতে পারিলে ভালো হয়— 'a college purely for research and where the conventional student who wishes to take degree etc. is not encouraged' (8 Dec., 1920)। সুতরাং বিশ্বভারতীতে 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চা'র পরিবেশ সৃষ্টির কথা উঠিল— ডিগ্রির প্রতি মোহশূন্য ছাত্রদের গবেষণাকেন্দ্র রচনার কল্পনা। কিন্তু ম্যাট্রিক ও গবেষণা কার্যের মধ্যে যে প্রস্তুতি-পর্ব আছে সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা আসিবে।

অন্যান্য ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য হইতেছে— কলাভবনের শিক্ষকদের গোয়ালিয়র স্টেটের আহ্বানে 'বাগগুহা'র চিত্রকপি করিবার জন্য সেখানে গমন। নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন হইতে বাগগুহার চিত্রকপি করিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেই প্রাচীর চিত্রকপি কলাভবনে এখনো আছে।

শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কার্য করিবার জন্য কলিকাতা হইতে অসহযোগী ছাত্রদল আসিয়াছেন— নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে। এই আন্দোলন উপস্থিত হইলে আশ্রমের তিনজন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন, নেপালচন্দ্র ও কালীমোহন ঘোষ— যাঁহারা স্বদেশীযুগের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন— তাঁহারা আশ্রম হইতে সরিয়া গিয়া এই নূতন আন্দোলনের নানাকর্মের মধ্যে জড়িত হইয়া

পড়েন। ইঁহাদের মধ্যে নেপালচন্দ্র কলিকাতার ছাত্রদের লইয়া আসিলেন শ্রীনিকেতনে। সেই সময়ে শ্রীনিকেতনে কিছু কিছু চাষের কাজ হয়— গোশালাও চলে। ক্ষিতিমোহনের নিকট আহ্বান আসে চিত্তরঞ্জন দাসের, আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। সেই সময়ে ক্ষিতিমোহন নাকি চিত্তরঞ্জনকে বলেন 'কবিরাজি করতে পারি— যদি কবি রাজি হন।' বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে এই দুঃসাহসিকতা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

১৯২১ সনে জগদানন্দ রায় সর্বাধ্যক্ষ হইলেও এণ্ড্রুজের উপর কবি অনেকখানি দায়িত্ব দিয়া গিয়াছিলেন— বিশেভাবে আর্থিক। যুদ্ধোত্তর পর্বে দুর্মূল্যতাহেতু আশ্রম-কর্মীদের খুবই কষ্টে দিন যাইতেছিল; এণ্ড্রুজ নিজের দায়িত্বে সকল কর্মীর দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এণ্ড্রুজের চেষ্টায় এই সময়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারত হইতে ১৬,২৮৫ টাকা দানরূপে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া বিশ্বভারতীর তহবিলেই দিতেন; নিজে কপর্দকশূন্যভাবেই থাকিতেন। তবে তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরোধে যে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

৬০

রবীন্দ্রনাথ দূব হইতে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যে শান্তিনিকেতন ঠিক পথে চলিতেছে না। তাই কখনো লিখিতেছেন, 'Santiniketan must be saved from the whirlwind of dusty politics.

'Keep Santiniketan away from the turmoils of politics.... We must not forget that our mission is not politics.... Where I have my politics, I do not belong to Santiniketan.

'We must make room for MAN the quest of this age and let not the NATION of this age obstruct his path.'

দৈববাণীরূপে লিখিয়াছিলেন— 'Money may remove many of the wants it suffers from, but also may remove its shrine of the Santam Sivam Advaitam– transferring it into an office, presided over by an efficient accountant.' 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় আইন দিল্লির রাষ্ট্রপরিষদে পাস হইবার সময়ে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' পরিত্যক্ত হয়।

য়ুরোপ ভ্রমণকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের উত্তরাংশ স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে মানুষের এই হিংস্রভাব কীভাবে দূর করা যায়। লীগ অব নেশন্স গঠিত হইয়াছে; কিন্তু উহার দ্বারা মানুষের চিত্ত ও বিবেক পরিশ্রুত হইবে না। কবি ভাবিতেছেন, শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলনসাধনের দ্বারা নানা জাতি নানা সম্প্রদায় আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। য়ুরোপের মনীষীদের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন— সকলেই মহত্তর জীবনযাপনের আদর্শের সন্ধান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে কেবল ভারতীয়

সংস্কৃতির কেন্দ্র করিয়া রাখিবার কথা আর ভাবিতে পারিতেছেন না; তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে বলিতেছেন International University। তাঁহার মনে হইতেছে য়ুরোপ হইতে জ্ঞানীদের আহ্বান করিয়া আনিবেন শান্তিনিকেতনে— পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটিবে এই সহযোগিতার উপর। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে কবির বহুদিনের ভাবনা এতকাল পরে মূর্ত হইতে চলিল।

৬১

দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে; আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র 'বিশ্বভারতী'তে অধ্যয়ন শুরু করিয়াছে; বাহির হইতেও যে-সব ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়াছে তাহারা বেসরকাবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানালোচনার জন্য আসিতেছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কয়েকজন ছাত্র পাওযা গেল— তাহারা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল না— যেমন সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, আশ্রমের হিসাবরক্ষক রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়— বালককাল হইতেই এখানকার ছাত্র; সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের দুই ভগ্নী রমা (নুটু) ও রেখা; ত্রিপুরা-কালিকচ্ছের মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র সাধকচন্দ্র ম্যাট্রিক পাস করিয়া যোগদান করিল, আর করিল অনাদিকুমার দস্তিদার ও প্রমথনাথ বিশী। কলিকাতা হইতে প্রাক্তন ছাত্র আসিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (কুশু), জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (লবু), মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শশধর সিংহ।

কলাভবনের অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল বসু। তাঁহাদের ছাত্র হইলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা ও মণীন্দ্র গুপ্ত। বহিরাগত ছাত্র আসিলেন হীরাচাঁদ ডুগার, অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিপদ রায়। সিলেট হইতে আসিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি, পঞ্জাব-লাহোর হইতে: জিয়াউদ্দীন প্রভৃতি। অল্পকাল মধ্যে ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে ছাত্র আসিতে আরম্ভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দমাস পরে ১৯২১ সনের জুলাই মাসে দেশে ফিরিলেন। শান্তিনিকেতনে বিচিত্র বিদ্যাচর্চার জন্য ছাত্র আসিতে দেখিয়া মন তৃপ্ত; কিন্তু দেশব্যাপী অসহযোগ-আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধতি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। দেশবাসীও তাঁহার কথা ও যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নয়। কবি বিশ্বভারতীর কর্মে মন দিলেন।

১৯২১ সনের পূজাবকাশের পর সমগ্র বিদ্যায়তনের নাম হইল বিশ্বভারতী— উত্তর বিভাগ বলিতে বুঝাইল বিদ্যাভবন ও পূর্ব বিভাগ বলিতে পাঠভবন বা স্কুল। উত্তর বিভাগ বা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর থাকিলেন— পূর্ব বিভাগের জন্য প্রমদারঞ্জন ঘোষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। প্রমদারঞ্জন কোচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন— সেখানে তাঁহার মন টিকিল না। স্কুলে এখন ১৭৯ জন ছাত্র, তন্মধ্যে ২২ জন বালিকা; আবাসিকছাত্র ১৩৮, অনাবাসিকের সংখ্যা ৪১।

বিশ্বভারতী উত্তর বিভাগ এখনো সংগঠিত হয় নাই— এন্ড্রুজ উপস্থিত থাকিলে ইংরেজি পড়ান; মরিসের কাছে ফরাসি, নরসিংহভাই পাটেলের নিকট জার্মান, বিধুশেখরের

নিকট পালি, সংস্কৃত— যে যেমন পারে শিখিতেছে। তরুণ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু পূর্ব বিভাগ ও উত্তর বিভাগে ইতিহাস পড়ান। পাঠভবনে প্রথম হইতে সপ্তম মান পর্যন্ত আশ্রমের পুরাতন ধারায় অধ্যাপনা চলিতেছে। অষ্টম মান হইতে যাহারা কলিকাতার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে— তাহাদিগকে প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করা হইল; আর যাহারা বিশ্বভারতী 'কোর্স' লইবে তাহারা পৃথক ধারায় চলিল।

১৯২১ সনে পূজার ছুটির পর ফ্রান্স হইতে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসিলেন। গত বৎসর ফ্রান্সে কবির সহিত অধ্যাপকের পরিচয় হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কবিকে মুগ্ধ করে। তখনি তিনি ইঁহাকে বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপক-রূপে শান্তিনিকেতনে আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন (১০ নভেম্বর, ১৯২০)। লেভিরা আসিয়া উঠিলেন সুরপুরীতে। এই বাড়িটি নির্মাণ করান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে এই বাড়ির মালিক হন দিনেন্দ্রনাথ; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় সঞ্জীব চৌধুরী এই বাড়ির মালিক। বাড়িটি বিশ্বভারতী এলাকার বাহিরে অবস্থিত।

লেভি বহুভাষাবিদ— গ্রীক, লাতিন ও মাতৃভাষা ফরাসি ছাড়া জার্মান, ইংরেজি জানিতেন; ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ব্যতীত চীনা ও তিব্বতি ভাষা জানিতেন; এ ছাড়া মধ্য এশিয়ার লুপ্ত ভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইনি ইতিপূর্বে ভারতে একবার আসেন ও নেপাল গিয়া তথাকার ইতিহাস তথ্যরাজি সংগ্রহ করিয়া *Le Nepal* নামে তিনখণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য; যৌবনে ডক্টরেট পান নাট্যমঞ্চ ও থিয়েটারের উপর গ্রন্থ লিখিয়া।

ভারতের ইতিহাসের উপাদান যে ভারতীয় ভাষার মধ্যে সীমিত— এই ধারণা সাধারণে পোষণ করেন। লেভি সাহেব ভারতের সাধারণের নিকট অজ্ঞাত চীনা ও তিব্বতি ভাষায় বচিত যে লুপ্ত রত্ন আছে— তাহারই চর্চা করিয়াছেন জীবন ভরিযা। বিশ্বভারতীতে আসিয়া তিনি চীনা ও তিব্বতি ভাষা শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা হইতে লেভির কাছে চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচি। ইনি কিছুটা চীনা ভাষা কলিকাতার জাপানি অধ্যাপক কিম্যুরার নিকট শিখিয়াছিলেন; তাই তিনি আমাদের সহিত পাঠ গ্রহণ করিতেন না; তিনি পৃথকভাবে পাঠ গ্রহণ করিতেন লেভি সাহেবের নিকট, ফরাসি শিখিতেন মাদাম লেভির নিকট । লেভির স্থানীয় ছাত্র জুটিলেন বিধুশেখর, প্রভাতকুমার ও ফণীন্দ্রনাথ বসু।

লেভি সাহেব তিব্বতি ভাষাও শিক্ষা দিতেন— সেখানেও আমরা ছাত্র— এ ছাড়াও আছেন হরিদাস মিত্র, অনাথনাথ বসু।

লেভির অধ্যাপনাগুণে সকলের আশ্চর্য পাঠোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি প্রথমে মোটামুটিভাবে চীনা হরপের বৈশিষ্ঠ্য, কীভাবে ২১৪টি মূলাক্ষরেব যোগাযোগে বহু সহস্র চীনা হরপ তথা শব্দ লিখিত হয়— তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াই একখানি চীনা বই আরম্ভ করিলেন। বইখানি 'সুখাবতীব্যূহ' জাপানে প্রকাশিত— উহাতে চীনা অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত মুদ্রিত ছিল। তিব্বতি আরম্ভ করেন উদানবর্গ-ধর্মপদের অপ্রমাদ বর্গের অনুবাদ দিয়া। ১৯১২ সনে ফরাসি পত্রিকা 'জুর্নাল আসিয়াটিক'-এ অধ্যাপকের অপ্রমাদবর্গের উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা ছিল— সেইটির তিব্বতি অংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিযা দিতেন ও তিব্বতি

অক্ষরের নীচে নীচে দেবনাগরী হরফ বসাইয়া দিতেন। তিব্বতি অক্ষর গুপ্তলিপি হইতে গৃহীত— সুতরাং তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শে-রব দঙ্‌ বু' (নীতি সংগ্রহ) পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই-সব শ্লোকগুলির মূল সংস্কৃত, সেগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়া পুস্তক মধ্যে লিখিয়া রাখিতাম। সেই বইখানি এখনো আমার কাছে আছে। কী নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহার নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। এখানে একটি তথ্য বলা দরকার রবীন্দ্রনাথ ১৯২০-২১ সনে যখন য়ুরোপ সফরে যান, সেই সময় ফ্রান্সের ভারতবন্ধুরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন; সেই অর্থ দিয়া ফরাসি ক্লাসিক্স ও প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক পত্রিকা 'জুর্নাল আসিয়াটিক'-এর প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল বিশ্বভারতী লাইব্রেরির জন্য সংগৃহীত হয়। জার্মানি হইতেও অনুরূপ গ্রন্থ ও পত্রিকা আসিয়াছিল। এই সমৃদ্ধ সংগ্রহ আসায় অধ্যাপকগণের গবেষণাদির বিশেষ সুবিধা হয়।

ক্লাস লওয়া ছাড়া লেভি সাহেব প্রতি সপ্তাহে পশ্চিম জগতের সহিত প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন; এই বক্তৃতা হইত আম্রকুঞ্জে— কোনো ঘরে নহে। লেভির বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাকে বক্তৃতার নোট লইতে দেখিয়াছি। অধ্যাপকের বক্তৃতার সারমর্ম বাংলায় ফণীন্দ্রনাথ বসু 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় প্রকাশ করিতেন।

লেভি মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে নেপালে যান ও সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

চারি মাসেব মধ্যে লেভি শান্তিনিকেতনে দুইটি প্রাচ্য দেশের সংস্কৃতি— যাহার সহিত প্রাচীন ভারতের গভীর নাড়ির যোগ ছিল— সেই চীন তিব্বতের ভাষা ও সাহিত্য -চর্চার বুনিয়াদি পত্তন করিয়া গেলেন। ভারতে এই শ্রেণীর বিদ্যাচর্চা তখন কোথাও তেমনভাবে প্রবর্তিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। তিব্বতি ভাষা সম্বন্ধে বাঙালি পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র আচার্যের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বহুকাল পূর্বে পণ্ডিতপ্রবর হরিনাথ দে চীনা ভাষা হইতে একটি বৌদ্ধ পুস্তিকার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি পুরাতন কথা এখানে স্মরণ হইতেছে; ১৯০৩ সনে জগদীশচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুইটি প্রাচ্যদেশের সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে পত্র বিনিময় হয়। জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে লেখেন (১ জানুয়ারি, ১৯০৩); 'তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। ভবিষ্যতে ইহা হইতে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে। চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

'একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনো সময়সাপেক্ষ— আমার Plan এই— এমন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজিবিদ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibet-এর manuscript ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে— তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তার পর তোমার Mr. Horyকে [শান্তিনিকেতনের জাপানি বিদ্যার্থী, সংস্কৃত পড়িতে আসেন] সঙ্গে করিয়া চীনদেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাংলা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে।— জাপান ও চীনদেশের খ্যাতনাম লোকের সহিত আলাপের

সুবিধা এখন হইতে করিতে হইবে।' ('চিঠিপত্র ৬', পৃ ২১৪)।

বাংলাদেশের দুই মনীষী অতীত ভারতের গৌরব পুনরুজ্জ্বল করিবার এই অনুপ্রেরণা লাভ করেন জাপানি মনীষী ওকাকুরা ও মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে।

বিশ্বভারতীর এই পর্বে পূজাবকাশের পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'বলাকা' পড়াইতেছেন। আমাদেব পুবাতন বাড়ি ও জগদানন্দ বায়ের কুটিরের পাশে একটি বটগাছের তলায় একটি খড়ের ঘর বা 'উটজ' করা হয়; কবি বরাবর সেইখানে ক্লাস লইতেন। তিনি ঘরের মধ্যে ক্লাস লওয়া পছন্দ করিতেন না। বিদেশী অধ্যাপকগণের প্রায় সকলেই ঘরের বাইরেই ক্লাস লইতেন; এমন-কি, অনেকে মাটিতে আসন বিছাইয়া ছাত্রদের সঙ্গে বসিতেন। 'বিশ্বভাবতী'ব বর্তমান আচার্য শ্রীজহরলাল নেহেরু নানাস্থানে শিক্ষাবিষয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের আদর্শে উন্মুক্তস্থানে অধ্যাপনা করার কথা বলিয়া থাকেন।

৬২

পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৮ সনের ৮ পৌষ (১৩২৫) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর গৃহ নির্মাণের জন্য নানা মঙ্গলাচরণ দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১৯ সনের জুলাই মাসে বিশ্বভাবতীব পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের তিন বৎসর পরে ১৯২১ সনের ৮ পৌষ মহাসমারোহেব মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্যালয়কে সর্বসাধাবণের হস্তে উৎসর্গ করিলেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই সভার সভাপতি হন। ঐদিন 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত ও বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্য সংবিধানের খসড়া পেশ ও গৃহীত হয়।

এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তাহা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ হইতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত (১৩৫৮) 'বিশ্বভারতী' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণ শেষে বলিয়াছিলেন 'এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষেব জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।'

অতঃপর বিশ্বভারতীর সংবিধান বা কন্‌স্টিটিউশন ১৯২২ সনের ১৬ মে (২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) কলিকাতায় রেজিস্টারি হইল। ইহার পরক্রমে এই সংবিধান কীভাবে পরিবর্তিত হইতে হইতে অবশেষে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপ গ্রহণ করিল, তাহা যথাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে অসিয়া পড়িবে।

১৯২২ সনেব সংবিধান মতে বিশ্বভারতীর পরিচালনাব ভার ও দায়িত্ব গিয়া পড়িল বিশ্বভারতী পরিষদের সদস্যদের উপর। সদস্য দুই শ্রেণীর— সাধারণ ও জীবন সদস্য। সাধারণ সদস্যরা প্রবেশিকা তিন টাকা ও মাসিক এক টাকা বা বার্ষিক বারো টাকা চাঁদা এবং জীবন সদস্যবা এককালীন ২৫০ টাকা দিতেন। ১৯২২ সনে, সদস্যসংখ্যা ছিল ২০০ ও ৪০ জন।

সাধারণ ও জীবন সদস্যরা সংসদ বা পরিচালক সমিতি নির্বাচন করিতেন। প্রথম

সংসদের অধিবেশন হইল ১৯২২ সনের ২৩ জুলাই। অর্থ সমিতির প্রথম অর্থসচিব হইলেন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁহার মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থসচিব নিযুক্ত হইলেন।

১৯২২ সনের দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব; একটি হইতেছে শ্রীনিকেতন পল্লীসংস্কারবিভাগ গঠন ও শান্তিনিকেতনে নারীবিভাগ উন্মোচন। শ্রীনিকেতনের কথা আমরা অন্য খণ্ডে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে শান্তিনিকেতনের আদি পর্বে দুই বৎসর পরীক্ষার পর ১৯১০ সনে বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বারো বৎসর পরে পুনরায় বোর্ডিং-এ বহিরাগত বালিকা লওয়া হইল। মাঝে কয়েক বৎসর গৃহস্থ শিক্ষকদের আশ্রিত কন্যা ভগ্নী প্রভৃতিরা স্কুলে বালকদের সঙ্গেই পড়িয়া আসিতেছে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ও আমার ভগ্নীরা, ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যারা। প্রতিমাদেবীর আশ্রিতা একটি বালিকা (অন্নপূর্ণা— পরে সন্তোষচন্দ্র মিত্রের পত্নী)— ইহারাই এই পর্বের অনাবাসিক ছাত্রী।

এইবাব লেবুকুঞ্জের বাড়িতে বোর্ডিং খোলা হইল— ইহার ভার লইয়া আসিলেন স্নেহলতা সেন। লেবুকুঞ্জ নামে একটি বাড়ি নির্মিত হয় পিয়ার্সনের বাড়ি বা দ্বাবিকের পাশে; সেটি তৈয়ারি হয় রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীব জন্য। 'দ্বারিক' তখন কলাভবনরূপে ব্যবহৃত হইত— বর্তমান কলাভবনের গৃহাদি কয়েক বৎসর পরে হয়। বর্তমানে দ্বারিকের চিহ্ন নাই, লেবুকুঞ্জ গৃহ ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

নারীবিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন স্নেহলতা সেন— কবির শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা। স্নেহলতা কয়েকটি পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া বিধবা হন বহু বৎসর পূর্বে। পুত্রদের শান্তিনিকেতনে পাঠান। ইঁহার এক পুত্র সুহৃৎচন্দ্র সেন মাঘোৎসবে যাইবার সময়ে বর্ধমান স্টেশনে রেলে কাটা পড়েন। তাঁহার নামে সাঁওতাল পল্লীতে সুহৃৎ নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 'সুহৃৎ-কাপ' ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। স্নেহলতার অন্য পুত্র প্রদ্যোৎকুমার আশ্রমের ছাত্র, অপর পুত্র কুলপ্রসাদ (মটরু) শ্রীনিকেতনের ছাত্র ছিলেন।

স্নেহলতা নারীবিভাগের ভার লইয়া আসিলেন, সঙ্গে আনিলেন কন্যা মালতীকে। স্নেহলতা দেবী ছিলেন লোরেটোর ছাত্রী— সুশিক্ষিত; ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। ইঁহার মতো বুদ্ধিমতী, বর্ষীয়সী মহিলাকে পাওয়ায় কবি মেয়েদের বোর্ডিং বিষয়ে খুবই নিশ্চিন্ত হইলেন।

সে সময় বিদ্যালয়ে বা স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭৯; ইহার মধ্যে আবাসিক ও অনাবাসিকা বালিকা ২২ জন।

৬৩

১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বভারতী উত্তরবিভাগে য়ুরোপ হইতে অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে আসিলেন মরিস্ বিন্টারনিট্জ্। ইনি চেকোস্লোভাকিয়ার (পূর্বে অস্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত) প্রাগস্থিত জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য বিষয়েব অধ্যাপক। ইনি সংস্কৃত

ভাষায় পণ্ডিত— সংস্কৃত ও ভারতীয় সাহিত্যের বিরাট গ্রন্থ তিনখণ্ডে জার্মান ভাষায় লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কবি যখন ১৯২০ সনে মধ্যয়ুরোপে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রাগ্-এ অধ্যাপকের সহিত কবির পরিচয় হয়। ইঁহার পাণ্ডিত্য, সৌজন্য ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কবিকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল।

অধ্যাপক বিন্টারনিট্জের সহিত আসিলেন তাহার চেক্ ছাত্র ডক্টর লেসনী। ইনি তখন প্রাগ্ এর নূতন চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক। চেকোশ্লোভাকিয়া নূতন রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে— প্রথম মহাযুদ্ধের পর; এতকাল তাহারা অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত ছিল, তাহাদের ভাষা, সাহিত্য সবই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। নূতন জাগ্রত জাতির আত্মচেতনা ও জ্ঞানস্পৃহার প্রতীক ছিলেন লেসনী। তিনি আপনার মতো অধ্যায়নাদি করিতেন ও জার্মান ভাষা শিক্ষণের ক্লাস লইতেন— বিশ্বভারতী হইতে বেতন লইতেন না। বিন্টারনিট্জ্ লেভি সাহেবের ন্যায় মাসিক ৫০০ টাকা পাইতেন। লেসনীর জার্মান ভাষার ক্লাসে যাইতাম। তাঁহার পঠন-পদ্ধতি ছিল নূতন; অর্থাৎ তিনি জার্মান ভাষায় কথা বলিতেন, আমাদের ইংরেজি বলিতে দিতেন না। তাঁহার বক্তব্য ছিল— বস্তু বা বিষয়ের জার্মান প্রতিশব্দ সরাসরি মনের মধ্যে যাইবে; ইংরেজির মাধ্যমে গিয়া মনের মধ্যে বাংলায় তরজমা হইয়া বুঝিবার প্রয়োজন নাই; জার্মান হইতেই মনে প্রবেশ করুক। এই পদ্ধতিকে বলে Direct thinking method; প্রচলিত Direct method হইতে পৃথক। আর বয়স্কদের ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষাদানবিধি হইতে পৃথক— তাহাও দেখিলাম।

বিশ্বভারতীর স্থায়ী অধ্যাপক পদে আছেন বিদেশীদের মধ্যে বেনোয়া ও কলিন্স। ফার্দিনন্দ বেনোয়া সুইস-ফরাসি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন— যুদ্ধের সময়ে বাধ্যতামূলক সৈন্যপদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, অথচ মানুষটি অত্যন্ত নিরীহ-শান্তিবাদী। যখন আসেন, তখন তাঁহার ক্যাথলিক পাদ্রিদের ন্যায় লম্বাশ্মশ্রু। মনে আছে পিয়ার্সন— (যিনি ১৯২১ সনের শেষদিকে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন)— বেনোয়াকে শ্মশ্রুগুম্ফমুক্ত করিয়া আমাদের কাছে আসিয়া নূতন লোকরূপে পরিচিত করিতেছেন; যৌবনোজ্জ্বল মুখ কী মেঘাবৃত ছিল— তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই খুশি। এই বেনোয়া পরে বাঙালি ব্রাহ্মমেয়ে বিবাহ করেন। এখানে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, ইঁহারা থাকিতেন গুর্জরীতে। এই বাড়িটির নাম কবি গুর্জরী দেন, কারণ এই কুটিরটি নির্মাণ করেন আহমদাবাদের অন্যতম ধনী হাতি সিংহের কন্যা শ্রীমতী। শ্রীমতী দীর্ঘকাল কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন, এখন তিনি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। সেই গুর্জরী কুটিরে বেনোয়া ও পরে বাকে দম্পতিরা বহু বৎসর বাস করেন। ১৯৬১ সনে বেনোয়ার মৃত্যু হয়।

বেনোয়া ফরাসি ভাষা শিখাইতেন— জার্মান ভাষাও কিছুকাল পড়ান। হঠাৎ বাখ্মান নামে এক জার্মান কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। কবি তাঁহাকে মাসিক একশত টাকা বেতনে জার্মান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মনে আছে, আমি একটু প্রতিবাদ করি— কারণ বেনোয়া তো জার্মান ভাষা শিখাইতেছেন— নূতন নিয়োগের প্রয়োজন কী। কবি ধমক দিয়া বলিলেন, 'খাঁটি জার্মানের কাছে জার্মান শেখার মূল্য অনেক বেশি।' বাখ্মান কয়েক মাস থাকিয়া পাথেয় জোগাড় করিয়া উধাও হইলেন, সকলেই বুঝিলেন লোকটি নিতান্ত সাহসিক চরিত্রের, কবির বিশ্বমানবতার সুযোগ লইয়া পাথেয় সংগ্রহের জন্য আসে।

স্থায়ী অধ্যাপকদের মধ্যে ডক্টর মার্ক কলিন্স ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়াইতেন; ছাত্রেরা তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিল। কিন্তু একটা বিষয় লইয়া এত ভাবিতেন যে ভালো করিয়া প্রকাশের অবকাশ তাঁহার হইত না। তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত রচনা কিছুই রাখিয়া যান নাই। কলিন্স আইরিশ হইলেও ভিতরে ভিতরে খাঁটি বৃটিশের আভিজাত্যগর্ব বহন করিতেন। তিনি এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন, বেনোয়ার ন্যায় ভারতীয় পোশাক কোনো দিন পরেন নাই— সর্বদাই য়ুরোপীয় পোশাকপরিচ্ছদ পরিয়া থাকিতেন, মাথায় শক্ত টুপি।

৬৪

বিশ্বভারতী স্থাপনের চার বৎসর পরে ১৯২৩ সনে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম ভারত সফরকালে পোরবন্দর হইতে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই পত্র হইতে দেখা যাইবে বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে ধারণা কীভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। কবি লিখিতেছেন—

'উত্তরবিভাগের যে-সব ছাত্র এখন আছে— বিশ্বভারতীর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলতে হবে, সেইজন্য তাদের দুই বছর সময় দেওয়া যেতে পারে।...

'নারীবিভাগ একটি স্বতন্ত্রবিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা কর্তব্য। আমাদের সামর্থ্যমতো এদের ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় যথোচিত পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। যাতে আমাদের আশ্রমে নারীদের শিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় ভালো করে গড়ে ওঠে তার বিশেষ চেষ্টা করা চাই। এই নারীবিভাগের ছাত্রীরা কালক্রমে কেহ কেহ বিশ্বভারতীতে স্থান অধিকাব কবতে পারবে।'

'বিশ্বভারতীর কলাবিভাগ ও কারুবিভাগের নিয়ম স্বতন্ত্র।' রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রোফেসর ও লেকচারার— আচার্য ও অধ্যাপক নামাঙ্কিত হইতেছেন।

'অধ্যাপকদের প্রধান কর্তব্য হবে ছাত্রদের বিশ্বভারতীর জন্য তৈরি করে তোলা; আচার্যদের প্রধান কর্তব্য হবে তত্ত্বানুসন্ধান ও তত্ত্বপ্রচার।

'বিশ্বভারতীর উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যেও কাউকে কাউকে কোনো কোনো বিষয়ে গোড়ার দিক থেকে শেখানো দরকার হবে। কেউ হয়তো য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত, কিন্তু সংস্কৃত জানেন না বা অল্পই জানেন, এঁদের খেয়া পার করবার ভার অধ্যাপকদের উপর। বলা বাহুল্য বিশেষ প্রয়োজন স্থলে বা স্বেচ্ছাক্রমে আচার্যেরাও এই ভার গ্রহণ করতে পারবেন।'

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে পাঠ্যক্রমেরও একটা খসড়া করিয়া দেন। তিনি বলেন যে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দুই বা ততোধিক শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে—

বৈদিক সংস্কৃত	আয়ুর্বেদ,	ক্ষিতিবাবু
সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাকৃত	প্রাচীন হিন্দি সাহিত্য	
ভারতের পুরাতত্ত্ব	ফার্সি, আরবি সাধারণ হিন্দি ও হিন্দুস্থানী	(যদি অধ্যাপক জোটে)
বাংলা (বাংলার বাহিরের প্রদেশের ছাত্রদের জন্য)		
ফরাসি	দ্রাবিড় ভাষা	
জর্মন (যখন জর্মন পণ্ডিত পাওয়া যাবে)	য়ুরোপীয় ইতিহাস	(নেপালবাবু)

শব্দতত্ত্ব (Collins এর কাছে), ন্যায়সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি

য়ুরোপীয় দর্শন (সরোজবাবুর কাছে)

কবি লিখিতেছেন— 'তালিকা আমার আন্দাজমতো করি দিলুম। আপনারা বিচার করে এর থেকে পরিবর্জন, পবিবর্ধন, পরিবর্তন করে মনের মতো তালিকা তৈরি করে নেবেন।

'নূতন অধ্যাপক ও আচার্য নিয়োগের সামর্থ্য আমাদের বেশি নেই। কেবল আমার ইচ্ছা কালিদাস নাগকে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়— তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়েই আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করি।'

বিশ্বভারতীর আচার্য ও অধ্যাপকদের নাম কবি লিখিয়া পাঠান—

আচার্য	**অধ্যাপক**
বিধুশেখর শাস্ত্রী	নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার,
ক্ষিতিমোহন সেন	বেনোয়া, প্রেমচাঁদ লাল,
কলিন্স	কপিলেশ্বর মিশ্র,
কালিদাস নাগ	রমেশচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ
নন্দলাল বসু	ভীমরাও শাস্ত্রী
এল্‌ম্‌হার্স্ট	সুরেন্দ্রনাথ কর, সরোজকুমার দাস

পত্রশেষে কবি লিখিতেছেন 'সোনার মায়ামৃগের পিছনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেড়াচ্ছি, কবে ছুটি পাব কে জানে? তবে ছুটাছুটি এবার বৃথায় হয় নাই। কাথিয়াবাড় হইতে ভালোই অর্থ সংগ্রহ— পোরবন্দরের মহারাজা বিশ্বভারতীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।'

৬৫

১৯২৩ সনে দুইজন বিদেশী মহিলা শান্তিনিকেতনে আসেন— স্টেলা ক্রাম্‌রিশ ও মিস স্লোম ফ্লাউম্‌। ক্রাম্‌রিশের সহিত কবির পরিচয় ভিয়েনায়। মহিলার নৃত্যকুশলতা, তাঁহার মনস্বিতা কবিকে মুগ্ধ করে; তিনি তাঁহাকে বিশ্বভারতীতে আহ্বান করিয়া আসেন। ইনি ছিলেন আর্ট ক্রিটিক— বিশ্বভারতী কলাভবনে যাহার প্রয়োজন ছিল এবং এখনো আছে। শিল্পকলার সামুদায়িক চর্চায় টেকনিক ও ইতিহাস— দুইয়ের প্রয়োজন; যেমন সাহিত্যচর্চায় অলংকার, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ইতিহাস -জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আর্টে সৃষ্টির যেমন প্রয়োজন, সমজদারিত্বও তেমনি দরকার। তাই দরকার সমালোচক বা ক্রিটিকের। ক্রাম্‌রিশ আর্টের টেকনিক লইয়া আলোচনা করিতেন। কিছুকাল পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন; ভারতে বাসকালে তিনি হিন্দু স্থাপত্যকলার উপর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া অশেষ যশেব অধিকারিণী হন।

মিস ফ্লাউম্‌ ছিলেন ইহুদি; য়ুরোপ ও আমেরিকায় শিশুশিক্ষা বিষয়ে অধ্যায়নাদি শেষ কবিয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি এখানকার শিশুদের লইয়া পাশ্চাত্যপদ্ধতি অনুসারে action song, পুতুল করা, ছবি আঁকা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল নন্দলাল বসু প্রমুখ কলাবিদরা মিস ফ্লাউমের শিক্ষাপদ্ধতি অপছন্দ করিতেছেন; তাঁহাদের কাছে এই-সব পদ্ধতি অত্যন্ত মেকানিক্যাল মনে হয়। কথাটা হয়তো সত্য। কিছুকাল পরে ফ্লাউম্‌ শান্তিনিকেতন হইতে ইসরাইল দেশের ‘তেল আবীব’ (Tel Aviv) চলিয়া যান ও সেখানে শিশুদের শিক্ষাকার্যে ব্রতী হন। বহুকাল তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবি যখন দক্ষিণ আমেরিকা যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে নামিয়া তিনি প্যালেস্টাইনে যাইবার প্রস্তাব করেন। মিস ফ্লাউম্‌ তাঁহাকে স্বাগত করার জন্য পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত আসেন। কিন্তু কবির প্যালেস্টাইন দেখা হয় নাই।

অস্থায়ীভাবে যে-সব বিদেশী শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল বাস করেন, স্ট্যান্‌লি জোন্স নামে এক খৃস্টান পণ্ডিত তাঁহাদের অন্যতম। মালাবরের (কেরল) ছাত্র টমাস পানিক্কর জোন্সের নিকট খৃস্টধর্মতত্ত্ব গভীরভাবে অধ্যয়নের অবসর পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে খৃস্টীয় সাহিত্য-গ্রন্থ পর্যাপ্ত সংখ্যায় আছে; ইহার কারণ এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহ সেখানে আসিয়াছিল।

আগন্তুক অধ্যাপকদের মধ্যে আসেন লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও অর্থনীতির অধ্যাপক রাধাকমল; এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরথুস্ট্রীয় ধর্ম ও আবেস্তার পণ্ডিত ডক্টর তারাপুরওয়ালা। ইঁহারা নিজ-নিজ বিষয়-সম্বন্ধে কয়েকটি করিয়া বক্তৃতা করেন। এ ছাড়া কলেজের ছাত্রদের নিয়মিত পাঠদানের জন্য আসেন অধ্যাপক সরোজকুমার দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায়। সরোজকুমার দাস দর্শনশাস্ত্র, অশোক চট্টোপাধ্যায় অর্থনীতি পড়ান। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মাঝে-মাঝে আসিয়া উত্তর বিভাগের ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা করেন। অত্যন্ত দীনভাবে ‘কলেজ’ আরম্ভ হইল।

এইভাবে বিশ্বভারতীর কার্যের দ্বিতীয় বৎসর চলিয়াছিল। এই বৎসরের বিশেষ ঘটনা

হইতেছে পুণার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের সহিত একযোগে মহাভারতের বিবিধ পাঠ সমন্বিত (ভেরিওরাম) সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থায় বিশ্বভারতীর সহযোগিতা। পুণা হইতে অধ্যাপক উদ্দীকর আসিয়া বিন্‌টারনিট্‌জেব সহিত মহাভারতের আদিপর্বের একটি আদর্শ-পাঠযুক্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিলেন। ইতিপূর্বে উদ্দীকর বিরাট পর্বের একটি বিবিধ পাঠযুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনে মহাভারতের অভিনব সংস্করণ প্রস্তুতের অন্যতম কেন্দ্র স্থাপিত হইবার একটি বিশেষ কারণ হইল যে এই সময়ে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে 'পুঁথি বিভাগ' খোলা হয়।

অনন্ত শাস্ত্রী নামে দক্ষিণ দেশীয় এক পণ্ডিত সস্ত্রীক আশ্রমে অপ্রতিগ্রহরূপে কাজ করিবার জন্য আসিলেন। তিনি পূর্বে বরোদা প্রাচ্য গ্রন্থাগারে কাজ করিতেন— সেখানকার পুঁথিশালা গঠনে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। লোকটির অসাধারণ ক্ষমতা পুঁথি সংগ্রহের। প্রাতে স্নানাদি অন্তে কপালে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের চিহ্নভূষিত হইয়া বাহির হইয়া যাইতেন কখনো সাইকেল, কখনো পদব্রজে, কখনো একাকী, কখনো সস্ত্রীক। দেখিতে দেখিতে চারি পাশেব গ্রাম হইতে এমন-সব মূল্যবান পুঁথি আসিতে লাগিল, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। অল্পকালের মধ্যে শত-শত পুঁথি সংগৃহীত হইল। দক্ষিণ ভাবত হইতেও তিনি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই-সব সংগ্রহের মধ্যে সংস্কৃত মহাভারতের কয়েকখানি মূল্যবান পুঁথি ছিল; সেগুলি মহাভারতের বিবিধ পাঠযুক্ত সংস্করণ প্রস্তুতির সময়ে কাজে লাগিল। এই সংস্করণের জন্য পত্র ব্যবহার করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও কয়েকখানি পুঁথি (on loan) আনা হয়। মহাভারতের বিভিন্ন পাঠ সংকলনের জন্য শান্তিনিকেতন, লাহোর, মাদ্রাজ ও পুণা— এই কয়টি স্থান নির্বাচিত হয়। শান্তিনিকেতনে পূর্ব ভারতের পুঁথির পাঠ সংকলিত হইত; সেই পাঠ-সমন্বিত কাগজ লাহোর ও মাদ্রাজ ঘুরিয়া পুণায় যাইত— সেখানে শেষে সম্পাদন কার্য নিষ্পন্ন হইত। শান্তিনিকেতনে বহু বৎসর এই 'কোলেশন' কার্য চলিয়াছিল। বিধুশেখর ইহার স্থানিক কর্তারূপে কার্য পরিচালনা করিতেন— কয়েকজন অধ্যাপক নিয়মিত কাজ করিয়া প্রতি মাসে কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন।

অনন্ত শাস্ত্রী দক্ষিণ ভারত, ওড়িশা, কেরল প্রভৃতি দেশ সফর করিয়া কয়েক সহস্র পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে স্তূপ করিতে লাগিলেন। তিনি মোটামুটিভাবে তালিকা করিয়া দেন বটে, কিন্তু সে-সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও পাঠের জন্য লোকের প্রয়োজন সকলেই একান্তভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন; অনন্ত শাস্ত্রীর সুপারিশে আয়াস্বামী নামে এক তামিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পুঁথিশালার ভার অর্পণ করা হয়। এই আয়াস্বামী বহু বৎসর বিশ্বভারতীর তিব্বতি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬১ সনে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কালে এই নানা লিপিলিখিত পুঁথির যথাযথ যত্নগ্রহণ করা সম্ভব হইল না। অবশেষে ডা. প্রবোধ বাগচির উপাচার্যকালপর্বে দক্ষিণী লিপিতে লিখিত পুঁথিগুলি আদৈরে প্রদত্ত হয়। এখন যে পুঁথিশালা আছে, তাহা প্রধানত বাংলা পুঁথির সংগ্রহ। এই পুঁথি লইয়া অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন।

৬৬

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী এখন বিশ্বদরবারে চলিবার পথে; দেশ-বিদেশ হইতে অধ্যাপক, অভ্যাগত, অতিথি আসিতেছেন কবির শিক্ষাসম্বন্ধে পরীক্ষার কার্যপ্রণালী দেখিতে।

পৌষ উৎসবের পর (১৯২২) কলিকাতা হইতে আসিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন পরিক্রমায়; তিনি এখানে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আসেন। এবার তাঁহার শিষ্যবর্গ নন্দলাল, অসিতকুমাব, সুরেন্দ্র কর— শান্তিনিকেতন কলাভবনের কর্মী, তাঁহার প্রেরণা-উদ্‌বোধিত শিল্পের নবচেতনা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে কীভাবে হইতেছে— তাহাই দেখিতে আসিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড লিটন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন (জানুয়ারি, ১৯২৩)। তখনো বিধুশেখর প্রমুখ অনেকের মন হইতে অসহযোগের ঝাঁঝ কাটে নাই। একদল কর্মী লাটসাহেবের আমন্ত্রণের বিরোধী। দেহলির একতলার ঘরে তখন দিনেন্দ্রনাথ থাকেন। সেখানে অসিতকুমার, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কেহ-কেহ বসিয়া থাকিলেন লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে যাইবেন না। কবি আমাকে বলিলেন দেহলির পাশের ছোটো গেটের কাছে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। এ কথা বলিতে সংকোচ হয়— আমাকে গিয়া লর্ড লিটনকে স্বাগত কবিতে হইল; সেখান হইতে তাঁহাকে আম্রকুঞ্জের অভ্যর্থনা সভায় আনা হয়। লাটসাহেবের আগমনের আড়ম্বর দেখিয়া অধ্যাপক বিন্‌টর্‌নিট্‌জ্‌ খুবই বিস্মিত হন। তিনি ধীরে ধীরে বলেন আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট ছাড়া কেউ সেলুন-গাড়ি পান না এবং এমন জাঁকজমকও হয় না। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে এ প্রশ্ন স্বতই মনে হয়, বৃটিশ যুগে যাহা ছিল, তাহার কিছু কি হ্রাস পাইয়াছে?

অসহযোগ সম্বন্ধে গোঁড়ামি কিছুটা তখন শমিত হইয়াছে। নন কো-অপারেশনের প্রতিঘাতে নানাপ্রদেশ হইতে স্বাধীন 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যায়ন করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রী আসিতেছে— তাহাদের জন্য বিশ্বভারতী 'কোর্স' বা পাঠক্রম পৃথক কবা হইল; ইহারই পাশে সরকারি আদর্শে কলেজ পত্তনের সম্ভাবনা দেখা গেল। তখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পরীক্ষাবিধি স্বীকার করিয়া 'কলেজ' স্থাপিত হইবে— সে কথা কাহারো নিকট স্পষ্ট হয় নাই।

শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপনের কথা ইতিপূর্বে কবিব মনে একবার উদিত হইয়াছিল। বালকরা যে বয়সে ভাষার রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে প্রবেশের স্তরে উপনীত হয়, সেই কৈশোরের মুখেই তাহারা আশ্রম হইতে চলিয়া যায়। কবি মনে করিতেন এই ভাবগ্রহণের বয়সে তাহারা আশ্রমে থাকিতে পারিলে ভালো হইত। সেজন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইসচ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাতও করেন; কিন্তু যেরূপ ব্যয়ের ফর্দ পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর অগ্রসর হইবার সাহস হয় নাই। কিন্তু এবার সেই কলেজ স্বাভাবিকভাবে দেশের চাহিদায় শান্তিনিকেতনের মধ্যে আপনি গড়িয়া উঠিতে চলিল। ১৯২৩ সনে বীরভূম জেলার হেতমপুর কলেজ ছাড়া আর কলেজ ছিল না।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে বিদ্যালয়ের দপ্তরের যাবতীয় কাজকর্ম বাংলার মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড সোসাইটি হইলে উহার সংবিধানাদি ইংরেজিতে রচিত হইল। বিশ্বভারতীর আদর্শও কবি ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করেন। তখন হইতে শান্তিনিকেতনের অভ্যন্তরীণ কাজে-কর্মেও ইংরেজি ভাষার প্রচলনের সূত্রপাত; বিশ্বভারতীর সংসদ, পরিষদ্ ও অন্যান্য উপসমিতির প্রতিবেদন ইংরেজিতে লেখার রেওয়াজ হয়।

১৯২৩ সনের এপ্রিল মাস হইতে ইংরেজিতে 'বিশ্বভারতী কোয়ারটার্লি' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল; কিন্তু বাংলা 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' যেন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে আসিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে লোপ পাইযাই গেল— তাহার উপর বিশ্বভারতীর নূতন কর্তৃপক্ষের যেন আর দৃষ্টি নাই। এখানেও যেন সেই অতি পুরাতন কথা—

হেতা হতে যাও পুরাতন
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

কবির তিরোভাবের পর কর্তৃপক্ষ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন (১৯৪২)। এই পত্রিকা দ্বিতীয় বৎসর হইতে ত্রৈমাসিক করা হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি যে কেবল দপ্তরখানার ভাষা হইল তাহা নহে— উত্তরবিভাগের অধ্যাপনারও ভাষা হইল; ইহার কারণ অধিকাংশ ছাত্রই অ-বাঙালি। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষার গৌরব অর্জন করিয়াছে, ইহাকে অবহেলা করা যায় না।

৬৭

১৯২৩ খৃস্টাব্দে পঠন-পাঠনের মধ্যে বিদ্যাভবনে নূতন ধারা শুরু হইল— বগ্‌দানোফ (Bogdanov) নামে এক রুশীয় পণ্ডিতের আগমন হইতে। বগ্‌দানোফ পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, ফরাসি ভাষা ও ইংরেজি ভাষা খুবই ভালো জানিতেন— তা ছাড়া আরবিও। রুশের বিপ্লব আরম্ভ হইলে তিনি পারস্যের পথে দেশত্যাগ করেন ও বোম্বাই-এ আশ্রয় লন। ইনি কট্টর জারপন্থী ও অতি গোঁড়া গ্রীক চার্চের খৃস্টান। তিনি বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে ইসলামিক সংস্কৃতি আলোচনার ব্যবস্থা হইল। জিয়াউদ্দীন, মুজতবা আলি প্রভৃতি হইলেন তাঁহার ছাত্র। এতদিনে বিশ্বভারতী সত্যই জাতীয় তথা বিশ্বমানবীয় প্রতিষ্ঠান হইল; রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ লইতেছে।

৬৮

বিশ্বভারতী যেমন নানা বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে, তেমনই নূতন প্রয়োজনের তাগিদে গৃহাদির সংস্কার ও নূতন গৃহাদি নির্মাণেরও আয়োজন চলিতেছে। এইবার গ্রন্থাগারের কিছু পরিবর্তন হইল। পূর্বে পুরাতন 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' গৃহটির একটি কক্ষ ছিল গ্রন্থাগার। এই গৃহের উপর ১৯০৭ সনে একটি বিশাল চারচালার খড়ের ঘর নির্মিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত সেইটি ছিল ছাত্রাবাস। কিন্তু এদিকে লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা বাড়িতেছে— য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন হইতে গ্রন্থরাশি আসিতেছে। অত্যন্ত স্থানাভাব; তাই স্থির হইল উপরের খড়ের ঘর ভাঙিয়া সেখানে দ্বিতল গৃহ ও পুরাতন গৃহের উত্তরে একটি বড়ো ঘর নির্মিত হইবে। এই গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ পাওয়া গেল অন্ধ্রদেশের পিঠাপুরমের রাজার নিকট হইতে। ১৯২১ সনের জানুয়ারি মাসে পিঠাপুরমের রাজা শান্তিনিকেতন সফরে আসিয়াছিলেন। ইঁহার দেওয়ান স্যার বেঙ্কটরত্নম সে যুগের অন্ধ্রদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বাংলা জানিতেন ও মহর্ষির আত্মজীবনী ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ তেলুগু ভাষায় অনুবাদ করেন। তদ্দেশীয় লোক তাঁহাকে তাঁহাদের দেশের বিদ্যাসাগর বলিত। আমার শ্বশুর মহাশয় দার্শনিক সীতানাথ তত্ত্বভূষণকে তিনি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। সেই সূত্র ধরিয়া আমি দেওয়ানজির সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করি ও বিশ্বভারতীর জন্য মহারাজের নিকট হইতে সাহায্য চাই। তিনি দুই হাজার টাকা দান করেন। এই টাকা লাইব্রেরি পুনর্গঠনে ব্যয়িত হইল। তখনকার দুই হাজার টাকায় যে কাজ হইত, তাহা আজকাল দশ-বারো হাজার টাকায় হয় কি না সন্দেহ।

উপরে যখন মিস্ত্রির কাজ চলিতেছে, হঠাৎ বৃষ্টি আসিল; ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পুরাতন ছাদের উপর পনেরো বৎসর ছাত্রেরা বাস করিয়াছিল— ফলে, ছাদ বহুস্থানে জখম হইয়া যায়। সেই-সব জায়গা দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল। সারা বিকাল, রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রদের সহায়তায় হাজার হাজার বই শেলফ হইতে নামাইয়া চৌকি পাতিয়া স্তূপ করিলাম— শেলফের উপর করোগেট টিন দিলাম। সেই দারুণ পরিশ্রমের সময় মনেও হয় নাই যে অফিসের ঘণ্টার বাইরের এ কাজ; তখন মনে হইত এ কাজ আমাদের নিজের। অফিসে চিরকুট পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি নাই। পরবর্তীকালে কলাভবনের হ্যাভেল রুম হইতে যখন বুদ্ধের এক মূল্যবান মূর্তি অপহৃত হয়, তখন পুলিসে কে খবর দিবে— অধ্যক্ষ না সচিব— তাহা স্থিরীকৃত হইতে হইতে চোর দেশত্যাগী হইয়া গেল।

লাইব্রেরি ঘর সম্প্রসারণ আরম্ভ হইলে আমি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত করিবার কতকগুলি প্রস্তাব করি। গ্রন্থাগারের স্ট্যাক-রুম আর দেড় ফুট মাত্র উচ্চ করিলেই দুইটি স্তর বা টায়ার প্রস্তুত করা সম্ভব হইত। দক্ষিণ দিক হইতে ক্ষুদ্র বাতায়নের সাহায্যে আলো ও বাতাস ঘরে আসিতে পারিত। কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আজ পর্যন্ত প্রতিদিন লোকে অসুবিধা ভোগ করিতেছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং বারোশত টাকা ব্যয় করিয়া তাহার প্ল্যান, স্পেসিফিকেশন প্রভৃতি কোনো খ্যাতনামা (?) ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়া তৈয়ারি করান। সে প্ল্যান করিবার পূর্বে কোনোদিন গ্রন্থাগারিক আমার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন তাঁহারা মনে

করেন নাই। দৈবক্রমে প্ল্যান দেখিয়া যে নোট দিই, তাহা কর্মসমিতি সমীচীন বোধ করেন ও ঐ অদ্ভুত প্ল্যান বাতিল করিয়া দেন। ১৯৬২ পর্যন্ত কোনো প্ল্যানই কার্যকরী হয় নাই।

নূতন গৃহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'রতনকুঠি' নির্মাণ। বোম্বাই-এর বিখ্যাত টাটা পরিবারের স্যার রতন টাটা বিদেশী অতিথিদের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণকল্পে বিশ্বভারতীকে ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই গৃহের নাম 'রতনকুঠি'। ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও আবেস্তার অধ্যাপক ডক্টর তারাপুরওয়ালা কর্তৃক এই গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ পারসি দানপতির নিরাসক্ত, শর্তহীন দানেব ঔদার্যের কথা বলেন।

ববীন্দ্রনাথ আমেরিকা বাসকালে (১৯২০-২১) এন্ড্রুজকে যে পত্রধারা লিখিয়াছিলেন তাহার একটিতে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে নব প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী হয়তো শান্তিনিকেতনের পুরাতন বিদ্যালযকে কোণঠাসা করিয়া মারিবে— 'It will grow up into a bully of a brother, and browbeat the sweet elder sister into a cowering state of subjection.' কবির এই আশঙ্কা কাল্পনিক নহে। কর্তৃপক্ষের মনোযোগ এখন 'বিশ্বভারতী'র উচ্চ জ্ঞানচর্চা বিভাগেরই 'পরে বেশি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা স্কুলবিভাগের প্রতি মনোযোগ অনেকখানি বিভক্ত হইয়াছে।

৬৯

বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান হইবার পর যে সংবিধান রচিত হয়, তাহার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি। বিশ্বভারতীর কর্মভার শান্তিনিকেতনের কর্মীদের হাত হইতে সরিয়া বর্তাইল গিয়া পবিষদ ও সংসদের উপর। পরিষদ বৎসরে একবার সমবেত হয়; আসল কাজের ভার পড়ে সংসদের সদস্যদের উপর; সদস্যদের অধিকাংশই কলিকাতার লোক। কলিকাতার সহিত সংযোগ, তথাকার লোকদের সহযোগিতা লাভের ভরসায় বিশ্বভারতী পরিচালনার কর্মকেন্দ্র মুখ্যত কলিকাতায় ও গৌণত শান্তিনিকেতনে আসিয়া যায়। কলিকাতায় ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট যেখানে পূর্বে 'সংগীত সমাজ' ছিল— সেই বাড়ির ভিতর দিকে কলিকাতার অফিস বসিল। শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ নামে এক যুবক হইলেন উহার অধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক।[১]

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার এতদিন ছিল অধ্যাপকমণ্ডলী ও তাহার দ্বারা নির্বাচিত কর্মসমিতির উপর। এখন পরিচালক সমিতির নাম হইল আশ্রম সমিতি।

---

[১] শৈলেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অফিসে কাজ করেন। তার পর ঐ কাজ ছাড়িয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে কাজ লন। যেখানে দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া অবসর লইয়াছেন। কয়েকখানি বই লিখিয়া তিনি যশ অর্জন করিয়াছেন।

ইহার অধিকর্তা হইলেন 'আশ্রম সচিব'— সর্বাধ্যক্ষপদ রদ হইয়া গেল। সংবিধান অনুসারে আশ্রম সচিব সংসদের মনোনীত ও নিযুক্ত কর্মচারী। ইনি সংসদের নিকট দায়ী, অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট নহে। অধ্যাপকমণ্ডলী কিছুকাল টিকিয়াছিল, কিন্তু সেই হইতে উহার মর্যাদা আর সে ফিরাইয়া পায় নাই; ইহারই শেষরূপ কর্মীমণ্ডলী।

শান্তিনিকেতন কর্মসমিতি ও আশ্রমসচিবের উপর স্বভাবতই প্রচুর ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিয়া গেল। ১৯২২-এ শ্রীনিকেতন পল্লীসংস্কারবিভাগ উন্মোচিত হইলে সেখানকার ব্যবস্থার ভারও বিশ্বভারতী সংসদের উপর গিয়া বর্তায় এবং সেখানেও শ্রীনিকেতন সমিতি গঠিত হয়। এ ছাড়া ১৯২২ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল বাংলা পুস্তকের (১৯২২ সন পর্যন্ত লিখিত) মালিকানা স্বত্ব বিশ্বভারতীতে দেওয়াতে, প্রকাশনবিভাগের জন্য একটি পরিচালকসভা ও অধ্যক্ষ-নিয়োগের প্রয়োজন হইল।

কাগজে-কলমে লিখিয়া দান না করিলেও এতাবৎকাল কবির বাংলা গ্রন্থের রয়ালটি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমই পাইয়া আসিয়াছিল। ১৯০৭ সনে কবির গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রকাশনকালে ঐ গ্রন্থমধ্যে লেখা হয় যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উপস্বত্ব প্রদত্ত হইল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন এলাহাবাদেব ইন্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ। ১৯০৮ হইতে ইন্ডিয়ান প্রেসের সহিত কবির সম্বন্ধের সূত্রপাত। চিন্তামণি ঘোষ কবির যাবতীয় গ্রন্থের স্টক গ্রন্থমুদ্রণের ব্যয়মাত্র ধরিয়া ছাব্বিশ হাজার টাকায় বিশ্বভারতীতে হস্তান্তরিত করিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'মুক্তধারা' ছাপাইয়াছিলেন, তাহা তিনি একেবারে দান করিয়া দিলেন। এই-সবেব ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় 'বিশ্বভারতী প্রকাশনবিভাগ' স্থাপিত করিতে হইল। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এই বিষয়ে উৎসাহী।

মূল সংবিধান গঠিত হইবার সময়ে শান্তিনিকেতন শিক্ষা পরিষদ (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল) ও নারী পরিষদ নামে দুইটি সমিতি সৃষ্ট হয়। নারী বিদ্যালয়ের অঙ্কুর উদ্গত হইতে দেখিয়া কবি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে এইরূপ একটি স্থানিক সমিতির দ্বারা কিছু সহায়তা হইতে পারে। শান্তিনিকেতনের কয়েকজন মহিলা এই সমিতির সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু এক বৎসর যাইতে-না-যাইতে নারী পরিষদ রদ করিয়া দেওয়া হইল। কবির মনের স্বপ্ন ছিল আশ্রমবাসিনীরা শান্তিনিকেতনের সত্যকার অধিবাসিনী হইবেন। অন্যান্য স্থানের গৃহীরা যেমন আপন স্বার্থগণ্ডি ভেদ করিতে না পারিয়া পারিবারিক কূপমণ্ডুকতার মধ্যে জীবনযাপন করেন, সেরূপ আদর্শ আশ্রমে কখনোই হইতে পারে না। তাই কবি কতবার গুরুপত্নী আশ্রমবাসিনীদের বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে, ছাত্রদের আহার্য ব্যবস্থার মধ্যে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কতবার উৎসাহের আতিশয্যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু কোথায় আমাদের স্বভাবের মধ্যে অথবা সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন একটু দুর্বলতা ছিল, যাহার জন্য কোনো ব্যবস্থাই স্থায়ী হয় নাই।

৭০

১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত হইতে ফিরিবার সময় পিয়ার্সন ইতালিতে ট্রেন হইতে পড়িয়া মারা যান। গত বৎসর তিনি দেশে গিয়াছিলেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। এই মহাপ্রাণ ইংরেজের নাম আছে 'পিয়ার্সন হাসপাতাল' ও সাঁওতাল পিয়ার্সন-পল্লিতে। পিয়ার্সন সর্বজন-বন্ধু ছিলেন, সাঁওতাল পল্লির লদকা, সোগলা হইতে আশ্রমের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— সকলেরই বন্ধু, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি বিশ্বাস করিতেন আধুনিক ভারতের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাধনার প্রতীক রবীন্দ্র, অরবিন্দ ও গান্ধী। অববিন্দকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন— এ সংবাদ রবীন্দ্রনাথ রাখিতেন। এন্ড্রুজ জীবনভর রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে সেতুস্বরূপ কাজ করেন। কিন্তু পিয়ার্সন রবীন্দ্র-অরবিন্দের মধ্যে সে ধরনের কোনো চেষ্টা করেন নাই; তিনি নীরবে অরবিন্দের প্রতি তাঁহার ভক্তি নিবেদন করিতেন। পিয়ার্সনের এই রাহস্যিক ধর্মসাধনাব প্রতি আকর্ষণ কবিকে একটু বিস্মিত করিয়াছিল এবং হয়তো এই কারণে মনে একটু অভিমানের ও অশ্রদ্ধার ভাবের উদয় হয়। জাপানে ১৯১৭ সনে পল রিশার-এর গ্রন্থে কবি যে ভূমিকা লেখেন, তাহা পিয়ার্সনের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনিচ্ছার বশেই লিখিত হয়। তখন পল রিশার ও তাঁহার পত্নী মীরা রিশার উভয়েই শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগীমাত্র। শান্তিনিকেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় পিয়ার্সনের অকালমৃত্যু হয়; হয়তো তাহারই ফলে তিনি কবির চোখে আদর্শায়িত হইয়াছিলেন— না হইলে কী হইত তাহা স্পষ্টত বলা যায় না।

৭১

১৯২৪ সনে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ চীনসফরে যাত্রা করেন। এইটি তাঁহার জীবনকথা হইলেও বিশ্বভারতী ইহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত। কবি শান্তিনিকেতনের দুইজন অধ্যাপককে তাঁহার চীনসফরে সঙ্গী করিলেন— একজন কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু, অপরজন উত্তরবিভাগের অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন। দুই বৎসর পূর্বে অধ্যাপক লেভি চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগ্রত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা। চীনে ইতিপূর্বে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন— বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং জন ডিউই। এবার তাহারা আহ্বান করিয়াছে রবীন্দ্রনাথকে। শিক্ষাশাস্ত্রীরূপে জন ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের নাম অনেক স্থলে যুগ্মভাবেই উল্লিখিত হয়— কারণ উভয়েই দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। রাসেলও সকলপ্রকার পরম্পরাগত মত ও বিশ্বাসে আস্থাহীন, এবং শিক্ষাবিদ। সুতরাং চীনের পক্ষে এই তিনজন মনীষীকে আহ্বান নিশ্চয়ই অর্থপূর্ণ; অর্থাৎ চীনারা চাহিয়াছিল তাঁহাদের— যাঁহারা মুক্তমন শিক্ষাশাস্ত্রী ও আদর্শবাদী।

কবির দুইসঙ্গী নন্দলাল ও ক্ষিতিমোহন চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল বিশ্বভারতী কী লাভ করিয়াছিল, তাহার বিশ্লেষণ হয় নাই, এবং

বিদ্যাভবন কতখানি লাভবান হইয়াছিল, তাহা খুব স্পষ্ট নহে। তবে নন্দলালের চীন পরিক্রমণ তাঁহার শিল্পচেতনাকে ব্যাপকতর হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল— কিন্তু তাহাও অস্পষ্ট ও অবিশ্লিষ্ট।

কবি চীনযাত্রার পূর্বে মন্দিরে বলিয়াছিলেন— 'দেশের গণ্ডির মধ্যে আশ্রমের পরিচয় যতই মনোহর হোক, তার যথার্থ যে বড়ো চেহারা, তার ভিতরকার বড়ো শক্তির পরিচয় নেই। যদি শান্তিনিকেতনের দূত হয়ে ভারতবর্ষের বাইরে এখানকার বাণী বহন করে যেতে পারি, যদি কোনো বিশ্ববাণীকে অন্তরে বহন করে আনতে পারি তবে আশ্রমের বড়ো পরিচয়টি পাব।'

চীন-জাপান সফর হইতে কবি ফিরিলেন চার মাস পরে— ১৯২৪ সনের জুলাইতে। রেঙ্গুনের এক চীনা স্কুলের অধ্যক্ষ ঙো চিওঙ্ লিম্ (Ngo Cheong Lim) তথাকার কাজ ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে আসিলেন চীনা ভাষার অধ্যাপক হইয়া। ইনি বিশ্বভারতী হইতে কোনো অর্থ গ্রহণ করেন নাই। মি. লিম্ বিশ্বভারতীর প্রথম চীনা অধ্যাপক। আধুনিক উচ্চারণাদির শিক্ষা প্রথমে ইনিই দিয়াছিলেন।

লিম্ আসিবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে ১৯২২ সনে পৌষ মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রথম চীনা গ্রন্থরাজি আসে। অধ্যাপক লেভি কিংবা কাহারো কাছে শাংহাই নগরীর মিসেস হারদুন নামে নিষ্ঠাবতী দানশীলা মহিলার নাম শুনি; তাঁহাকে আমি বিশ্বভারতীতে চীনা ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চার কথা বিস্তারিত লিখি। তিনি সেই পত্র পাইয়া শাংহাই কমার্শিয়াল প্রেসে মুদ্রিত 'চীনা ত্রিপিটক' পাঠাইয়া দেন। পরে তিনি চীনা ইতিহাস— 'চব্বিশ রাজ-বংশের কাহিনী' নামে বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ পাঠান। এই মহিলা শাংহাই-এ কবিকে সম্মানিত করেন।

এইভাবে চীনা পুস্তক সংগ্রহের ও চীনা ভাষা চর্চার কাজ চলিল বিশ্বভারতীতে। তখন চীনা ভাষার ছাত্র বিধুশেখর, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট গোখলে, বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু ও লেখক।

পাঠকের স্মরণ আছে অধ্যাপক লেভি তিব্বতি ভাষা চর্চার সূত্রপাত করিয়া যান। বিধুশেখর তিব্বতি ভাষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন; কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিব্বতি গ্রন্থ নাই বলিলেই হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাত্র ছিল। বৌদ্ধধর্মের আকর তেঙগ্যুর ও কেঙগ্যুর সংগ্রহ করিতে না পারিলে গবেষণার কার্য অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমে একজন তিব্বতি লামাকে আনা হইল; তাঁহার চেষ্টায় প্রায় চারি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিব্বত হইতে তেঙগ্যুর ও কেঙগ্যুর সংগৃহীত হইয়া আসিল। যে লামাকে নিযুক্ত করা হয়, তিনি শাস্ত্র সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন না, তবে তাঁহার দ্বারা তিব্বতি পুঁথির অনুলেখন কার্য ভালোভাবেই চলে। অনুলেখনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল; কারণ তিব্বতি ছাপা স্থানে-স্থানে এমন অস্পষ্ট যে লিপি-অভিজ্ঞ ছাড়া অন্যের পক্ষে সহজে পাঠ করা দুঃসাধ্য ছিল। বহু খণ্ডে অনুলিখিত পুঁথি বিশ্বভারতীর চীনা গ্রন্থাগারে আছে।

৭২

চীন হইতে প্রত্যাবর্তনের দুই মাসের মধ্যেই কবি দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন ১৯২৪ সেপ্টেম্বরে ও দেশে ফিরিয়া আসেন ১৯২৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে।

এই সময়ে বিশ্বভারতীতে অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে আসেন ডক্টর স্টেন কোনো। ইনি নরওয়েবাসী, ভারতের প্রাচীন ভাষা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীতে ইনি মধ্য এশিয়ার লুপ্ত ভাষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; এ ছাড়া প্রাকৃত ভাষা পড়ান।

স্টেন কোনোর গবেষণার ধারা এখানে কেহই ধারণ করিয়া রাখেন নাই; অথবা এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নাই যাহাতে করিয়া এই গবেষণাধারা এখানে চালু থাকিতে পারে। একমাত্র মনোমোহন ঘোষ কিছুটা ধরিয়া রাখেন। মনোমোহন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া শান্তিনিকেতনে আসেন; প্রথমে তাঁহাকে শ্রীনিকেতনে অফিসে ও পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে কার্য দেওয়া হয়। মনোমোহন আপন শক্তি বলে বি. এ. পাস করিয়া কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন। তিনি আশ্রম ত্যাগের পর এম. এ. পাস কবিয়া প্রাকৃতের উপর গবেষণা করিয়া 'ডক্টর' হন। তাঁহাব এই শিক্ষার বুনিয়াদ বিশ্বভারতীতে স্টেন কোনোর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৭৩

১৯২৫ সন হইতে বিশ্বভারতীর নূতন ব্যবস্থা হইল। এতকাল বিশ্বভারতীতে উত্তরবিভাগ বা স্কুল এই দুইটি ভাগ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২২ সন হইতে অসহযোগী ছাত্রদল আসিতে আরম্ভ করেন। কালে অসহযোগের তাপ নিবিয়া আসে এবং বাস্তবতাবোধ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার প্রয়োজনও অনেকে অনুভব করেন। ফলে বিশ্বভারতীর পূর্ববিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একদল বিশ্বভারতীর নিজস্বধারায় ও একদল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন বা গবেষণাবিভাগে এখন সার্টিফিকেট দিবার কথা উঠিতেছে (জুন, ১৯২৪)।[১]

দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় শিক্ষাবিভাগ নূতনভাবে গঠিত হইল। বিশ্বভারতীর পরীক্ষা-নিরপেক্ষ উচ্চতর জ্ঞান-আলোচনার জন্য বিভাগের নাম হইল 'বিদ্যাভবন'। 'কলেজে'র

[১] 'Vidya-Bhavana (Institute of Research) Bulletin 4 Educational Institutions at Santiniketan June, 1924.

'Regular students of Vidya-Bhavana, either resident or non-resident, may be granted certificates on satisfactory completion of their work and on presentation of an approved thesis which must first be published in some recognised journal. Every candidate will thereafter ordinarily be required to present himself before a public convocation for defending his thesis.'

নাম 'শিক্ষভবন' ও স্কুলের নাম 'পাঠভবন' হইল। এই শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ইনি 'প্রবাসী' ও 'মর্ডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদকত্বের অনেক কাজ শান্তিনিকেতনে বসিয়াই করিতেন। শিক্ষাভবনে তখন ছাত্র-সংখ্যা সামান্য; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ কার্য করা খুব কঠিন হয় নাই।

১৯২৬ সনে শিক্ষাভবন বা কলেজ ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ হইলেন নেপালচন্দ্র রায়; জুলাই মাস হইতে জাহাঙ্গীর উকিল। উকিল বোম্বাই-এর পার্সি— অক্সফোর্ডের বি.এ.— ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বিশেষ নিয়ম করিয়া বিশ্বভারতীর পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সুযোগ দান করিলে শিক্ষাভবন দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

নূতন অধ্যাপক আসিলেন প্রেমসুন্দর বসু; ইনি দর্শনের অধ্যাপক। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া প্রেমসুন্দর সরকার সম্পৃক্ত কলেজের কাজ ত্যাগ করিয়া বিহারজাতীয় শিক্ষালয়ে যোগ দেন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দা পড়িয়া আসিলে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ইনি নববিধান সমাজের নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু ব্রাহ্ম, অত্যন্ত নীতিমান পুরুষ।

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে কবি ইতালিতে কয়েক দিন থাকেন; সে-সময় তাঁর সহিত পরিচয় হয় কার্ল ফর্মিকির। ফর্মিকি ভালো ইংরেজি জানিতেন বলিয়া তখন কবির দোভাষী হন। ইনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' ইতালিয়ান অনুবাদক; মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের পরম সমর্থক, অত্যন্ত চতুর লোক। কবি ফর্মিকির বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশ্বভারতীর অভ্যাগত-অধ্যাপক পদগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

ফর্মিকির এই আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সহিত মুসোলিনীর সৌহার্দ্য স্থাপনের সুযোগ পাইলেন। আন্তর্জাতিক জগতে তখন (১৯২৫) রবীন্দ্রনাথের যেমন সুনাম, মুসোলিনীর তেমনি বদনাম। মুসোলিনী তাঁহার দুর্নাম শোধন করিবার জন্য ভারতের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বিশ্বকবির আন্তর্জাতিক মহাবিদ্যালয়ের জন্য বহুশত ইতালীয় গ্রন্থ দান ও এক ইতালীয় অধ্যাপককে প্রেরণ করিলেন। এই ইতালীয় গ্রন্থরাজির মধ্যে ইতালীয় আর্টের অতি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। আর যে তরুণ অধ্যাপককে পাঠাইলেন, তিনি আজ তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সুপরিচিত। এই অধ্যাপকের নাম জোসেপ তুচ্চি; ইনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of Religion and Philosophy of the Far East । ফর্মিকি বিশ্বভারতী হইতে ৫০০ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু তুচ্চির বেতন আসিত রোম সরকার হইতে। ইতিপূর্বে কোনো রাষ্ট্র হইতে কোনো অধ্যাপক বেতন পাইয়া বিশ্বভারতীতে আধ্যাপনাদি করিবার জন্য আসেন নাই।

অধ্যাপক তুচ্চি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। য়ুরোপীয় বহু ভাষা ছাড়া তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত যেমন জানিতেন, তেমনই জানিতেন চীনা ও তিব্বতি ভাষা। কেবল ভাষাবিদরূপেই তাঁহার খ্যাতি নহে, বৌদ্ধ দর্শনাদি সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তুচ্চি বিশ্বভারতীতে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। তার পর তুচ্চি থাকিতেন শ্রীনিকেতনে যাইবার পথের 'প্রান্তিক' নামে বাড়িতে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনে কী গভীর অভিনিবেশ দেখিতাম! তিনি ইতালিয় ভাষা শিখাইতেন ও আমাদের চীনা পড়াইতেন। চীনা পাঠ্য গ্রহণ করেন

কুঙ্ফুৎসুর গ্রন্থ। এই পুরাতন চীনা তিনি অনায়াসে পড়াইতেন। বিধুশেখরের সহিত বৌদ্ধ ন্যায় ও দর্শন আলোচনা করিতেন এবং উভয়ে একটি বৌদ্ধ দর্শন গ্রন্থ তিব্বতি হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া সম্পাদন করেন। কবির সহিত মুসোলিনীর মনোমালিন্য হইলে তুচ্চিকে এখান হইতে সরিয়া যাইবার সরকারি আদেশ আসে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ঙো-লিম্ নামে একজন চীনাশিক্ষক বিশ্বভারতীর কাজে ইতিপূর্বে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা আধুনিক চীনা ভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্বে বৌদ্ধ চীনা ভাষার আলোচনা পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন অধ্যাপক লেভি। সুতরাং বিশ্বভাবতীতে লৌকিক-চীনা, ক্লাসিকাল-চীনা ও বৌদ্ধ-চীনা— এই তিনটি 'ভাষা' চর্চার সূত্রপাত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই ধারা অবরুদ্ধ হইল অল্পকাল মধ্যে।

ইতালিতে ফিরিয়া গিয়া ফর্মিকি রবীন্দ্রনাথকে ইতালি-সফরের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। আসলে ইহা মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ— ফর্মিকি নিমিত্তমাত্র। কবির সঙ্গে চলিলেন বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। বিশ্বভারতীর ভার অর্পিত হইল অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর উপর। কবির ইতালি সফর ও তার পর মুসোলিনীর সহিত মনোমালিন্যের ফলে বিশ্বভারতী হইতে অধ্যাপক তুচ্চিকে রাষ্ট্রীয় আদেশে স্থানান্তরে যাইতে হয়। ঙো-লিম্ কিছুকাল ছিলেন। শেষে তিনিও চলিয়া গেলে চীনা ভাষা চর্চা বন্ধ হইয়া যায়। বহু বৎসর পরে 'চীনাভবন' স্থাপিত হইলে উহা পুনপ্রবর্তিত হয়, সে কথা যথাস্থানে আসিবে।

ঙো-লিম্ বিশ্বভারতী হইতে কোনো বেতন পাইতেন না; এবং তাঁর রেঙ্গুনের চীনা বিদ্যালযের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক কারণ ছিল কি না জানি না। মনে আছে এই সময়ে একজন চীনা যুবক আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসে; ঙো-লিম্ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং এমন একটা শোরগোল তুলিলেন যে শেষকালে যুবকটিকে শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া যাইতে হয়। এর রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। আমরা ঙো-লিমের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হই। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বিদায় দিয়াছিলাম।

৭৪

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা স্কুলবিভাগকে এখন 'পাঠভবন' বলা হইতেছে। প্রমদারঞ্জন ঘোষ ইহার অধ্যক্ষ। এতকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাইভেট' ছাত্ররূপে পরীক্ষা দিতে হইত। ১৯২৬ সনে সেই নিয়ম পরিবর্তিত হইলে তাহারা সরাসরি পরীক্ষা দিবার অধিকার লাভ করিল।

পাঠভবনের শিশুবিভাগ বা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলি পৃথক এককরূপে গঠন করিয়া ১৯২৬ সনে মিঃ আরিয়াম উইলিয়ম্সের উপর উহার কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হয়। মিঃ আরিয়াম সিংহল দেশীয় তামিল খৃস্টান, শ্রীরামপুর খৃস্টান কলেজ হইতে ব্যাচেলার অব ডিভিনিটি পাস, বিলাতে Y. M. C. A.-এর সহিত কয়েক বৎসর কার্য করিয়া নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ান্তে

দেশে ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ১৯২৫ সনে আশ্রমের কার্যে যোগদান করেন ও শিশুদের শিক্ষাদি ব্যাপারে মনোযোগী হন।

এই বৎসর দুইজন নূতন শিক্ষক আসিলেন সত্যজীবন পাল ও তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। সত্যজীবন এখানে প্রথমে সাধারণ শিক্ষকরূপে আসেন ও পরে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। সত্যজীবন বি. টি. পাস। তখন শিক্ষার বাজারে 'ড্যাল্টন' পদ্ধতির খুবই নাম-ডাক। তিনি এই পদ্ধতি স্কুলে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। যে-দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে সকলপ্রকার জ্ঞানের চর্চা হয়, যেখানে শিশুদের জন্য অসংখ্য গ্রন্থ মাতৃভাষায় রচিত, যেখানে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক বালকদের পাঠ্য নির্বাচনে সহায়তা দান করিতে সদাই প্রস্তুত— সেখানে ড্যাল্টনের পদ্ধতি হয়তো কার্যকরি হইতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের স্কুলে তাহা যে সম্ভব নয়, তাহা বিদ্যালয়েব পরিচালকগণ ভাবেন নাই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ে যে কোনো পদ্ধতি আছে এবং তাহাব পরীক্ষার যে প্রয়োজন, সে কথা কর্মীরা এখানে বাস করিয়াও ভুলিয়া থাকেন— অথবা রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সহায়-গ্রন্থ না পাওয়ায় লোকে আপনার মতো করিয়াই কবিকে গ্রহণ করেন— তাহা আ-কৃত না বিকৃত তাহা বুঝিতে পারেন না।

তনয়েন্দ্রনাথ খুলনাবাসী— ইংরেজিতে এম.এ। কলিকাতায় বি টি ক্লাসে কিছুকাল যান— ভালো না লাগায় উহা ছাড়িয়া দেন। অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়া অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা নিবেদিতাকে লইয়া আশ্রমে আসেন। ত্রিশ বৎসর অনন্যমনে ছাত্রদের সেবা কবেন। ১৯৫৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তনয়েন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজি ভাষার 'স্কুল মাস্টার' ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সৃষ্ট 'মাস্টার মশায়' ও 'অধ্যাপকে'ব সমন্বয়ে-গড়া মানুষ। ছাত্রদের প্রতি যেমন কঠোর, তেমন স্নেহশীল। কী কবিয়া ছাত্রদের ভালো কবিয়া পড়ানো যায়— এই ছিল তাঁহার সাধনা। মাস্টার পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার নেশা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

বাংলা নববর্ষের উৎসবের দিন দেখা যায় শিশুবিভাগের বালক-বালিকারা 'আমাদের লেখা' নামে বই বিক্রয় কবিতেছে। ছেলেদের লেখা, তাহাদেব চিত্র সংগ্রহ কবিয়া তনয়েন্দ্রনাথ এই বার্ষিক পত্রিকা নিজব্যয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। সেই ধারায় এখনো প্রতি বৎসর এই পত্রিকা নববর্ষের দিন প্রকাশিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ অল্পকাল মধ্যে তনয়েন্দ্রনাথের ভিতরে আসল শিক্ষকেব (genuine) মূর্তিটিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই সর্বদাই শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শাদি করিতেন। শিক্ষাবিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পত্র রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

৭৫

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর সামুদায়িক জীবনধারার কথা এই ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না। সেইরূপ একটি ঘটনা হইতেছে— 'নটীর পূজা' অভিনয়।

পেশাদার নটনটীরা চিরকাল মানুষের আনন্দবর্ধন ও চিত্তবিনোদন করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভদ্রঘরের কন্যা ও বধূরা এ-পর্যন্ত সমাজের আনন্দ উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথের সাহসেই সর্বপ্রথম শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী গৌরী 'নটীর পূজা' অভিনয়ে নটীর ভূমিকা গ্রহণ করেন শান্তিনিকেতনে (মে, ১৯২৬)। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় পুনরায় যে অভিনয় হয়— তাহাতে নাম-ভূমিকায় গৌরী নামেন, তখন তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

আশ্রমের আদিযুগে ইহা কল্পনার অতীত ছিল; কিন্তু কালান্তরে তাহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। আজ ভারতে সর্বত্র বালিকাদের পক্ষে নৃত্যগীত সামুদায়িক শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়াছে; শান্তিনিকেতন ইহার প্রবর্তক।

৭৬

১৯২৬ সনের শেষ মাসে কবি য়ুরোপ সফরান্তে দেশে ফিরিবার পথে সংবাদ পাইলেন যে পূজাবকাশের সময় সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষচন্দ্র কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। ১৯০১ সনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইলে দ্বিতীয় দল ছাত্রের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র অন্যতম। ১৯০২ হইতে ১৯০৬ পর্যন্ত আশ্রমে অধ্যয়ন করিয়া তিনি রথীন্দ্রনাথের সহিত মার্কিন দেশে যান এবং সেখান হইতে গোপালন বিদ্যা শিখিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১০-এ যখন তিনি দেশে আসেন, তখনো বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত ছাত্র আদৌ এদেশে সুলভ হয় নাই; ইচ্ছা করিলে তিনি সহজেই ভালো চাকুরি সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ১৬ বৎসর ধরিয়া শান্তিনিকেতনে একই বেতনে কাজ করেন, কখনো বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হন। শান্তিনিকেতনের বহু কথা তাঁহার মনে উদিত হইতেছে। দেশে পৌঁছিবার পূর্বে এক পত্রে তাঁহার মনের নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে।

সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের সহিত সন্তোষচন্দ্রের জমিজমা লইয়া যে মনোমালিন্য ঘটে, তাহা শমিত হইতে দীর্ঘকাল লাগে। প্রতিষ্ঠান-মাত্রের সহিত বৈষয়িকতার বিষ কী অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত!

৭৭

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ১৯২৬ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের রেগুলেশন্স-এ বিশেষধারা যোগ করিয়া 'শান্তিনিকেতন কলেজে'কে কতগুলি অধিকার দান করেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কলেজের রূপ তখনি ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই।

১৯২৭ সনের এপ্রিল মাসে 'শিক্ষাভবন' বা কলেজ ও 'পাঠভবন' বা স্কুলকে শিক্ষাবিভাগ

নাম দিয়া একটি একক সৃষ্টি করা হইল— ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন প্রেমসুন্দর বসু। বৎসরকাল এইভাবে স্কুল ও কলেজ এক সংস্থাভুক্ত ছিল।

অতঃপর প্রেমসুন্দর বসু কাজ ছাড়িয়া য়ুরোপ চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে আসিলেন নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি (অক্টোবর, ১৯২৮)। নলিনচন্দ্র খৃস্টান, Y.M.C.A.-এর সহিত বহুকাল যুক্ত ছিলেন। কোয়েকার বা সোসাইটি অব্ ফ্রেন্ডস নামে প্রতিষ্ঠান তাঁহার শান্তিনিকেতনে ব্যয় বাবদ বৎসরে ২০০ পাউন্ড দিতেন। ১৯২৮ সনের নভেম্বরে নলিনচন্দ্রকে কলেজের অধ্যক্ষ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯২৮ সনের গোড়ায় প্রমদারঞ্জন ঘোষকে পাঠভবনের অধ্যক্ষ পদ হইতে সরাইয়া আশ্রমসচিবের পদ প্রদত্ত হয়; সত্যজীবন পাল হন পাঠভবনের অধ্যক্ষ। আরিয়াম রবীন্দ্রনাথের খাস মুন্সীরূপে কাজ করিতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ১৯২৮ সনের অগস্ট মাস হইতে বিদ্যালয়ের কার্যে পুনরায় যোগ দেন। সেই বৎসর নভেম্বরে তিনি পাঠভবনের রেক্টরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নলিন গাঙ্গুলিও এইসময় শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ।

নলিনচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া কলেজকে সম্পূর্ণ নূতন রূপদানে ব্রতী হইলেন। গত বৎসর শিক্ষাভবনের এমন দশা হইয়াছিল যে কর্তৃপক্ষ অর্থসংকটের জন্য তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দেন; এবং কলেজ বন্ধ করিয়া দিবেন কি না সে বিষয়েও ভাবিতে আরম্ভ করেন।

নলিনচন্দ্র শান্তিনিকেতনের সকল শিক্ষিত নরনারীর সহায়তা গ্রহণ করিয়া নূতন-নূতন লোককে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করিয়া [illegible] সজীব করিয়া তুলিলেন। অল্পকালের মধ্যে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ১৯২৮ সনে যেখানে কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ জন মাত্র, পর বৎসর সেখানে হইল ৫০ জন (৩৭ বালক, ১৩ বালিকা)।

এই সময়ে কলাভবনের নিজস্বগৃহ, শ্রীসদন ও পিয়ার্সন হাসপাতালের গৃহ নির্মিত হয়। কলাভবন এতদিন স্থান হইতে স্থানান্তরে সরানো হইয়া আসিয়াছে— 'দ্বারিক' শিশুবিভাগ, লাইব্রেরির উপরতলায়। অবশেষে তাহারা নিজ গৃহ পাইল। বালিকাদের জন্য নূতন গৃহের একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। 'শ্রীসদন' নির্মিত হইবার পর মেয়ে হোস্টেল সেখানে উঠিয়া গেলে 'শিক্ষাভবনের' ছাত্ররা 'দ্বারিকে' ও 'নেবুকুঞ্জে' আশ্রয় পাইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ নিয়মপ্রণয়ন করিয়া শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনকে কলেজের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে কলেজ তদারকের জন্য লোক প্রেরণ করিতে হইত। প্রথমবার এই তদারকের কাজে আসিলেন ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হার্লে ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁহারা প্রত্যেক অধ্যাপকের যোগ্যতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাগজপত্র দেখিলেন। আমি কলেজে পড়াই ইতিহাস। আমি ভাবিতেছি আমি কী কাগজপত্র দেখাইব— কোন পাসের সার্টিফিকেট দাখিল করিব! আমার পালা আসিল ; তখন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন— 'Well, Harlez, I know him; it is all right— pass on.' দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে জানিতেন। কী জানিতেন, জানি না। তবে তখন আমি National Council of Education-এ হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় বক্তৃতা করিতেছি— সে কথা অধ্যক্ষ দাশগুপ্ত জানিতেন। ও সময়ে ট্রাপ (Trapp) নামে এক জার্মান যুবক বিশ্বভারতীতে আছেন—

সংস্কৃত পড়েন। তিনি বাংলাও শেখেন আমার কাছে ভালোভাবেই। সেই যুবকটির নিষ্ঠা দেখিয়াছিলাম। প্রতি প্রাতে রতনকুটির সম্মুখে পায়চারি করিতে করিতে পাতঞ্জলির ভাষ্য মুখস্থ করিতেছেন। কয়েক বৎসর পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর একখানি বড়ো বই লিখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আর খোঁজ পাই নাই।

নলিন গাঙ্গুলির সময় বহু নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। *Visva-Bharati*র বার্ষিক প্রতিবেদনে (1929, page 13) লিখিত হয়— 'The remarkable progress shown by the college is entirely due to his enthusiasm and personal exertions.' তাঁহার চেষ্টায় বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এখন ডক্টর)-কে কেমিস্ট্রি পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করা হইল; তিনি বোলপুরবাসী। কিন্তু ল্যাবরেটরি তখন শ্রীনিকেতনে; সেখানে ছাত্রদের ক্লাস হইত। উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়াইতে শুরু করিলেন সন্তোষবিহারী বসু শ্রীনিকেতনের কৃষিবিদ! ফরাসি পড়ান বেনোয়া; জার্মান পড়ান Trapp নামে এক জার্মান যুবক। মোটকথা নলিনচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত চেষ্টায় কলেজ বিভাগে দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃত, বাংলা, অর্থনীতি প্রভৃতি বহুবিষয় অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু চার বৎসর পরে, নলিনচন্দ্রের মন বিরূপ হইয়া উঠিল নানা কারণে। তিনি চাহিয়াছিলেন একটি 'কলেজ' গড়িতে, যেমন মোহিতচন্দ্র এককালে চাহিয়াছিলেন একটি 'স্কুল' করিতে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মনে বাধা। ১৯৩০ সনে কবি জার্মানিতে। কলেজের ছাত্রদের কৃতকার্যতাদি সংবাদ দিয়া নলিনচন্দ্র পত্র দেন। কবি এই পত্রের উত্তরে লেখেন: 'পরীক্ষার ফল যে খুব বেশি দামি এ কথা আমি কোনোদিন মনে করি নে।... শিক্ষার যথার্থ সার্থকতা প্রাণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা— পরীক্ষা পাস করানো নয়।' নলিনচন্দ্র বুঝিলেন যে কোথায় একটা অমিল হইতেছে।

৭৮

বিদ্যাভবনে উচ্চতর জ্ঞানালোচনা ও গবেষণার কার্য ভালোই চলিতেছে। বিধুশেখর অধ্যক্ষ। ১৯২৮ সনের জানুয়ারি মাসে চেকোস্লোভাকিয়ার অধ্যাপক V. Lesny-কে চারি মাসের জন্য 'অভ্যাগত অধ্যাপক' পদ দান করিয়া বিশ্বভারতীতে আনা হইল। লেসনির বিদায়কালে কবি স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অধ্যাপককে একটি স্বর্ণ অঙ্গুরী (বিশ্বভারতী সীল সমেত) উপহার দিয়াছিলেন (১৯২৮, এপ্রিল)।

অধ্যাপক লেসনি বাংলা ভাষা ভালো করিয়া শিখিয়া 'লিপিকা'র চেক অনুবাদ করেন ও কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী চেকভাষায় লেখেন। এই হইতে চেকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। এখন য়ুরোপের মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চায় গুণগতভাবে এই দেশই বোধ হয় অগ্রণী— যদিও সোবিয়েত রুশ সংখ্যাগুরুত্বে সকলের ঊর্ধ্বে।

১৯২৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে বেনোয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া কাবুলে কাজ লইয়া চলিয়া গেলেন; সেখানে বাদশাহ আমানুল্লা আফগানিস্তানকে নূতনভাবে গড়িবার জন্য

বিদেশীদের আকর্ষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলিও কাবুল যান। তাঁহার 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থে সেখানকার কথা অপরূপ ভাব ও ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বেনোয়া চলিয়া গেলে ফরাসি ভাষা শিক্ষণ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া গেল। এ ধরনের ঘটনা নূতন নহে— একজন অধ্যাপক চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার বিষয়ের অধ্যাপনাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ধারাবাহিকতা বহুবার নষ্ট হইয়াছে।

৭৯

বিশ্বভারতীর সহিত এই সময়ে জৈন সম্প্রদায়ের হৃদ্যতা হয় অমৃতসরের দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের এক ধনীর অর্থানকূল্যে। পণ্ডিত মথুরানাথজি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া যান (জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯২৮)। লাহোরের এক জৈন মহোদয় 'কেশর কুমারী'র নামে জৈন গ্রন্থমালা লাইব্রেরিতে দান করেন। ইহার পর জিয়াগঞ্জ ও কলিকাতার ধনী ও গুণী জৈনরা অর্থাদি সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। পণ্ডিতপ্রবর জিনবিজয়মুনি বহু জৈন ছাত্র আনিয়া একটি ছাত্রাবাসও স্থাপন করেন। বিশ্বভারতীর নামে কিছু জৈন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইঁহাদের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষই ভুল করেন; তাঁহারা জৈন ছাত্রদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করায় গোল বাধে। তাহাদের আহার, আচার, ব্যবহার পৃথক— সমস্তের সহিত তাহা খাপ খাইল না। গুজরাটি ছাত্রদের সম্বন্ধেও সেই সমস্যা হয় এক সময়ে।

৮০

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনধর্ম সংস্কৃত, পালি, চীনা, তিব্বতি ভাষা চর্চার আয়োজন হইয়াছে। ইসলাম ও আরবি-পার্সি ভাষা চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হইল হায়দারাবাদের নিজামের উদার হস্তের দান হইতে। ১৯২৭ সনে তিনি বিশ্বভারতীর হস্তে একলক্ষ টাকা দিয়া বলেন যে এই মূলধনের আয় হইতে ইসলামীয় বিভাগ চালিত হয় ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র স্থাপনের ইচ্ছা বহুকালের। ১৯২২ সনে অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গে এখানে আসেন লাহোর হইতে মৌলানা জিয়াউদ্দীন ও সিলেট হইতে কিশোর সৈয়দ মুজতবা আলি। সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্বে রুশ পণ্ডিত বগদানোভ আসায় এই নূতন বিভাগ স্থাপনা সম্ভব হইয়াছিল।

এইবার নিজাম প্রদত্ত অর্থ প্রাপ্তির পর ইসলামীয় সংস্কৃতি চর্চার জন্য 'অধ্যাপক' নিয়োগের প্রশ্ন উঠিল। হাংগেরির রাজধানী বুডাপেস্টের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক জুলিয়াস গেরমানুসকে এই পদ প্রদত্ত হইল। গেরমানুস বিখ্যাত আরবি পণ্ডিত Vambrey

ও Goldziher-এর ছাত্র; আরবি ও তুর্কি ভাষা এবং ইসলাম সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান।

১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে গেরমানুস সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসিলেন। শ্রীনিকেতনের পথে 'প্রান্তিক' নামে ক্ষুদ্র গৃহটি তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ইনি হন আরবি ভাষার অধ্যাপক ও সেই বৎসর জুলাই মাসে বগদানোভ পারসিয়ান-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইসলামীয় গ্রন্থাগারে— এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত আরবি পার্সি বই ছিল একমাত্র সম্বল। ১৯২৩ সনে স্টেলা ক্রামরিশের এক মুসলমান বন্ধু কয়েকটি বিরাট কাঠের বাক্সের মধ্যে কয়েকশত মূল্যবান গ্রন্থ রাখিয়া মারা যান; সেই-সব বই ক্রামরিশের চেষ্টায় পাওয়া গেল। আনাইয়া দেখা গেল বহু বৎসরের অযত্ন ও অবহেলায় অধিকাংশ কীটদষ্ট বই অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে; তবুও বহু চেষ্টা করিয়া কিছু উদ্ধার করা গেল। এ বিষয়ে জিয়াউদ্দীন সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম স্মরণীয়। ১৯২৬ সনে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মিশরে যান। সেখানকার রাজা ফুয়াদ উৎকৃষ্ট আরবি গ্রন্থরাজি বিশ্বভারতীর জন্য উপহার প্রেরণ করেন। এ ছাড়া দেশ-বিদেশ হইতে বই কেনাও হইল প্রচুর। এইভাবে বিশ্বভারতীর একটি নূতন অধ্যায়ন-অধ্যাপনা বিভাগ গড়িয়া উঠিল।

গেরমানুস ১৯২৯ এপ্রিল হইতে ১৯৩২ মার্চ পর্যন্ত বিদ্যাভবনের অধ্যাপক ছিলেন। শেষদিকে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে বিদ্যাভবনে একটা খুব ভাঙচুর হইয়া গিয়াছে। পার্সি ভাষার অধ্যাপক বগদানোভ ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর কলিন্সকে অকস্মাৎ শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। কারণটি বড়োই অদ্ভুত। মিস স্টোরি নামে এক ধনী ইংরেজ মহিলা ভারত সফরে আসেন ও শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন ঘুরিয়া যান। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ মি. গাঙ্গুলি আম্রকুঞ্জে পার্টি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে। জেনেভায় এই মহিলার গৃহে অতিথি হইয়া বাস করিতেছেন। কবির সহিত খোসগল্প করিবার সময়ে মিস স্টোরি বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপকদের সম্বন্ধে এমন-সব বলেন যাহা রবীন্দ্রনাথকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। রুশীয় বগদানোভ ছিলেন কট্টর জারপন্থী, আর ডা. কলিন্স ছিলেন পাকা বৃটিশ। সময়টা ছিল গান্ধীজির আইনঅমান্য আন্দোলনের পর্ব। ইহার তরঙ্গ শান্তিনিকেতনের কলেজের ছাত্রদের স্পর্শ করে। তাহারা খুব ঘটা করিয়া মেলার মাঠে বিলাতি কাপড় পুড়াইয়া উৎসব করে। এই-সব ঘটনায় বিদেশী অধ্যাপক খুবই বিচলিত হন। মিস স্টোরি কবির কাছে ইঁহাদের সম্বন্ধে কী বলেন তাহা আমরা জানি না। আমরা জানিলাম জেনেভা হইতে কবি এই দুইজন অধ্যাপককে বিদায় করিয়া দিবার নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। এক মহিলা আগন্তুকের একতরফা অভিযোগে বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে কবির এই আদেশদান সংগত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কবির মনের ক্ষোভ তাঁহার কন্যার নিকট লিখিত পত্রেও প্রকাশ পায়। তিনি লিখিতেছেন— 'শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার... উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে।... আবর্জনা যদি না এখনি সরানো যায়, তা হলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠবে।' কবি এমনও না কি জানান যে তাঁহার দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যেন অবাঞ্ছিতেরা আশ্রম ত্যাগ করেন। এই দুইজনই সত্যকার পণ্ডিত ছিলেন— তাঁহারা চলিয়া গেলে বিদ্যাভবনের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ হয় নাই।

৮১

১৯৩০-এর য়ুরোপ সফরকালে রবীন্দ্রনাথ পক্ষকালের জন্য সোভিয়েত রুশের মস্কৌ ভ্রমণ করিয়া আসেন। নূতন দেশ কবিকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি ভাবিতেছেন, সেখানে ভেদহীন সমাজ স্থাপন করিবেন। কবি কল্পনা করিতেছেন যে সমবায় ভাণ্ডার আশ্রমে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের গৃহীদের যাবতীয় সামগ্রী সমবায় পদ্ধতিতে সরবরাহ হইবে। প্রত্যেক গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা ও সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল আমার উপর। কলেজের কয়েকটি ছাত্র আমায় সহায়তা করে। এই দলে একটি মালায়ালি ছাত্র ছিলেন— নাম শিবরাম পিল্‌লে। তিনি পরে সেখানকার উকিল হন। ছাত্রদের সহায়তায় সমস্তই প্রস্তুত হইল— প্রত্যেকটি সামগ্রী কী পরিমাণে লাগিবে তাহার বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম; কিন্তু সেটি কার্যে রূপদানের কোনো আগ্রহ কর্তৃপক্ষের দেখা গেল না। কেন গেল না— তাহার সদুত্তর কেহ দিতে পারিবে না।

বিদেশে থাকাকালে কবির মনে শিক্ষাভবন সম্বন্ধেও উদ্‌বেগের কারণ হইয়াছিল— উহার বাহিরের সাফল্য-সংবাদে। জার্মানি হইতে অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকে যে পত্র লেখেন (জুলাই ২৮, ১৯৩০) তাহা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখিলেন (সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৩০) 'আমার বিশ্বাস ধীরেনকে যদি ঐ পদ [অধ্যক্ষতা] দেওয়া যায় তো ভালোই হয়।'

ধীরেন হইতেছেন ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন— পরে বাংলা সরকারের শিক্ষাসচিব। ধীরেন্দ্রমোহন, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রায় শিশুকাল হইতে আশ্রমে লালিত। দিল্লির নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ পাস করিয়া তিনি ১৯২৬ সনে বিলাত যান। সেখানে প্রায় পাঁচ বৎসর নানাবিষয়ে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D. উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৯৩০)।

সে সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর হইয়া আসিলেও এ দেশে চাকুরি পাওয়া সহজ ছিল না। তাই তিনি বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতনে প্রেমচাঁদ লালের ছুটির পর্বে শিক্ষাচর্চা ও গ্রাম্যশিক্ষা বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। সেখানে দুই বৎসর আছেন। ১৯৩২ সনে অক্টোবরে প্রেমচাঁদ লাল আমেরিকা হইতে ডক্টরেট পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সমস্যা হইল ধীরেন্দ্রমোহনের কাজ লইয়া। তখন তাঁহাকে শিক্ষাভবন বা কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইল। নলিনচন্দ্র পূজার ছুটির পর আসিলেন না (অক্টোবর, ১৯৩২)। তিনি বুঝিতেছিলেন তাঁহার কর্মপদ্ধতি কবির এবং অন্যান্য অনেকের পছন্দ হইতেছে না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে যখনি কবির 'আদেশ' কেহ রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা ও শক্তিমতো বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনি কবির মনে হইয়াছে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, ইহা তো সে রূপ লয় নাই। সেইজন্য শান্তিনিকেতনে খুবই অস্পষ্ট একটা শাব্দিক 'আদর্শবাদে'র কথা পরস্পরের মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু তাহার রূপ কী, তাহা বাস্তব জীবনে কী আকার গ্রহণ করিয়া সার্থক হইতে পারে, তাহা কখনো স্পষ্ট হয় নাই। ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে সুষ্ঠু গবেষণা ও তাহাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা বরাবরই ক্ষীণ।

৮২

পাঠভবন বা স্কুলের নানারূপ অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হইতেছে, ১৯৩২ জুলাই মাস হইতে আশা অধিকারী স্কুল বিভাগের রেক্টর বা প্রধানা নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বে ইনি শিশুবিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেছিলেন। ইনি ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত অধ্যক্ষতা করেন। এই কয়মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের বহু পরিবর্তন হয়। আশাদেবীর মনে হইল, তাঁহার প্রাগ্রসরী শিক্ষাবিষয়ক মতবাদ কার্যে পরিণত করিবার বাধা হইতেছেন পুরাতন শিক্ষকরা। পুরাতনদের মধ্যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও নগেন্দ্রনাথ আইচকে বয়সের অজুহাতে বিদায় করানো হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিপর্ব হইতে ইঁহারা শিক্ষাকার্যে ব্রতী ছিলেন। জগদানন্দ ও হরিচরণের ষাট বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আইচের সে বয়স হয় নাই। আমি কবির কাছে গিয়া নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলে, তিনি একটু উষ্মা সহকারে বলিলেন, 'আমি আর কতকাল বহন করিব।' আমি বলিলাম— 'আপনি কি জানেন না যে এককালে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ— সামান্য হইলেও বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছিলেন।' কবি বলিলেন, 'এই সব অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।' বলাবাহুল্য যে স্রোত তখন বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহা রোধ করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব নহে। নগেন্দ্রনাথকে কীভাবে ছাত্রদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বৃত্তি সংগ্রহ করিতে হইত— কী দীনতা তাঁহাকে বহন করিতে হয় তাহা অবর্ণনীয়।

পুরাতন বিদায় হইল, নূতন আসিল; শুধু নূতন নহে অদ্ভুত আসিল— ব্যাংক্রফট নামে এক ইংরেজ ও জ্যাকবসন নামে এক নিউজিল্যান্ডার। উভয়েই পাঠভবনের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শুধু তাহাই নয়— ব্যাংক্রফটকে ছাত্র-পরিচালক করা হয়। জ্যাকসন ইংরেজি পড়াইতেন। কয়মাস ছাত্ররা কী যে শিখিল— কীভাবে কাটাইল— তাহা কেহ জানিল না। এইটুকু বুঝা গেল ছাত্রদের সময় ও বিদ্যালয়ের অর্থ অনেক নষ্ট হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আশাদেবী আরিয়ামকে বিবাহ করেন এবং কয়েকমাস পরে উভয়ে আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বৃহত্তর ক্ষেত্রে কার্য করিবার ও আত্মপ্রকাশের বিরাট সুযোগ পাইয়া আজ তাঁহারা উভয়েই সার্থকজীবন হইয়াছেন।

১৯৩৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা ও পাঠভবন পুনরায় একত্র করিয়া ধীরেন্দ্রমোহনের কর্তৃত্বাধীনে আনা হইল।

৮৩

শিক্ষাভবন তাহার যথার্থ কলেজীয়রূপ গ্রহণ করে ১৯২৯ সনে নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলির সময় হইতে। কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার দীন আয়োজন শুরু হয় তাঁহারই সময়। ধীরেন্দ্রমোহনের চেষ্টায় কয়েকজন উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত হন; তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম স্মরণীয়— তিনি প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' লেখা হইত না, প্রমথনাথ তাহার

আরম্ভ-খসড়া না করিলে; তাঁহার 'পৃথ্বীপরিচয়' গ্রন্থ সুপরিচিত।

প্রেসের ও গুদাম ঘরের সংলগ্ন করোগেট টিনের যে কয়খানা ঘর নির্মিত হইয়াছিল, তাহার একটিতে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হইল। পাঠকের স্মরণ আছে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে ছাত্রদের বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞানাগার ছিল; এখন সেইটি এই ঘরে উঠিয়া আসিল এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতি কেনা হইল। রাজশেখর বসুর সহিত এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। কবি ভাবিলেন, রাজশেখরকে বিশ্বভারতীর মধ্যে আকর্ষণ করিতে পারিবেন; তাঁহার নামে গ্রন্থ উৎসর্গ করিলেন; টিনের ঘরের প্রাচীরে একটি শ্বেত প্রস্তরের ফলকে 'রাজশেখর বিজ্ঞানসদন' খোদিত করিয়া সংলগ্ন করা হইল।

পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য হাতের কাজ শিক্ষা নূতন প্রাণ পাইল সুইডেন হইতে স্নয়েড শিক্ষিকাদের আগমনে। ছেলেদের হাতে-কলমে কিছু কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপনের অল্পকাল পরেই আরম্ভ হইয়াছিল; সাধারণত ছুতোরের কাজই শেখানো হইত। এ বিষয়ে খুবই পরিবর্তন হয় লক্ষ্মীশ্বর সিংহের দ্বারা। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

৮৪

১৯৩৪ সনের গ্রীষ্মাবকাশের পর শ্রীসদন বা মেয়েদের বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষ হেমবালা সেন কাজ হইতে ছুটি লইলেন বা বিদায় হইলেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরিদর্শিকার শুষ্ক কর্তব্য পালনের মধ্যে তাঁহার জীবন সীমিত ছিল না; ছাত্র-ছাত্রীদের দুগ্ধ সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছায় তিনি গোপালন করিতেন; ঢেঁকি রাখিয়া ধান ভানাইয়া টাটকা চাউল করাইতেন। ছাত্রীদের প্রতি তিনি যেমনই দরদী, তেমনই নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর ছিলেন। এই কঠোরতা কাহারো কাহারো মনে হইত অত্যধিক নীতিপরায়ণতামাত্র। বালিকাদের পক্ষে অসময়ে বাহিরে যাওয়া-আসা সম্বন্ধে যে-সব নিয়ম প্রত্যেক হস্টেলেই আছে, তাহা তিনি কর্তব্যবোধেই পালন করিতেন। তাহাতে সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলিয়া কবির মন তাঁহার প্রতি বিরূপ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে হেমবালা সেনকে কর্ম ত্যাগ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সিংহল সফরান্তে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া হেমবালা দেবীকে কয়েকখানি পত্র দেন। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া তাঁহাকে যাহা করিতে হইয়াছিল, এই পত্রগুলি তাহা মোলায়েম করিবার চেষ্টা মাত্র।

৮৫

বিদ্যাভবনের মধ্যেও পরিবর্তন হয় কিছু। ইসলামিক অধ্যাপক গেরমানুস দুই বৎসর কার্য করিয়া ১৯৩২ সনে মার্চ মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার স্থলে আরবি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইল না। মৌলানা জিয়াউদ্দিন পার্সিয়ান লেকচারারের কার্য করিতে লাগিলেন। আসল কথা, আরবি, পার্সি অধ্যয়ন করিবার জন্য যে পরিবেশ সাধারণত সাম্প্রদায়িক বিদ্যায়তনে দৃষ্ট হয়, তাহার অভাবহেতু ছাত্র পাওয়া দুষ্কর হইল। এ যে কেবল ইসলামিক বিভাগে ঘটিল, তাহা নহে। জৈন বিভাগে মুনি জিনবিজয় নিষ্ঠার সহিত কার্য করিতেন; সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে বলিয়া তাঁহার পক্ষে শান্তিনিকেতনে বাস করা সম্ভব ছিল; কিন্তু সাধারণ জৈন ছাত্র-গবেষকদের পক্ষে এই স্থানের জন্য সে আকর্ষণ হইত না।

সিংহল, বর্মা, সিয়াম, চীন প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ ও গৃহীরা আসিযাছেন সত্য, কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতি আয়ত্তের জন্য তাহাদের আগ্রহ স্বল্পই দেখা যাইত। কেহ সংস্কৃত শিখিবার জন্য, কেহ বি. এ, এম. এ. পরীক্ষা দিয়া ডিগ্রি লাভের জন্য, কেহ সংগীত বা চিত্রকলা আয়ত্তের জন্য আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলার মাধ্যমে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাগিদ কাহারো বড়ো দেখা যাইত না। আর অ-ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বিক ও বিচিত্ররূপের তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশনের কোনো সুকল্পিত পাঠক্রমের ব্যবস্থা হয় নাই। প্রাচ্যের সামান্য পরিচয়-সম্পন্ন ভারতীয় বা বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠ গ্রহণ ব্যর্থ হইত। তবে যে-সব ভারতীয় ছাত্র কোনো বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লইয়া আসিতেন এবং এখানে নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা কৃতিত্বের সহিত গবেষণাকার্য করিয়াছেন; এবিষয়ে বিধুশেখরের ছাত্রেরাই যশস্বী হইয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি ডক্টর গেরমানুস চলিয়া যাইবার পর ইসলামিক অধ্যাপক পদ বহুকাল শূন্য থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৩২ সনে রবীন্দ্রনাথ ইরান সফর করিয়া ফেরেন এবং তথাকার শাহনশাহ রেজাশাহ পহলবী বিশ্বভারতীর জন্য একজন অধ্যাপক প্রেরণ করেন। আগা পুরে দাউদ ১৯৩৩ সনের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে আসিলেন; সঙ্গে তাঁহার আসেন বোম্বাই হইতে দোভাষী পণ্ডিত মি. ফ্রামরাজ বোদে (Bode)। অধ্যাপক পুরে দাউদ জার্মান-প্রবাসী আবেস্তান পণ্ডিত; তিনি জার্মান দেশে বিবাহাদি করিয়া বসবাস করেন; জার্মান মাতৃভাষার ন্যায়; ইংরেজি সামান্যই জানেন। তাই তাঁহার ভাষণাদি মি. বোদে তর্জমা করিয়া বলিতেন।

বিশ্বভারতীতে জরথুস্ট্রের ধর্মালোচনার জন্য বোম্বাই-এর পার্সিসমাজ যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বভারতীর হস্তে সমর্পণ করেন নাই। বোম্বাই-গুজরাট অঞ্চলে বিশ্বভারতীর হস্তে তহবিল সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া দিবার বিরুদ্ধে একটা কঠোর মনোভাব দেখা গিয়াছিল। বিশ্বভারতীর সাধারণ তহবিলের নিত্য অভাব; তাই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ বিশেষ তহবিলগুলি হইতে অর্থ 'ধার' করিতেন; কিন্তু তাহা পূরণ করার সাধ্য তাঁহাদের প্রায়ই হইত না। পার্সিরা একটি ট্রাস্টের হস্তে সেই ধনভাণ্ডার ন্যস্ত করেন। তাহারই সুদ হইতে আবেস্তান বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ হইত। এই ট্রাস্টের প্রথম ট্রাস্টিদের মধ্যে ছিলেন দিন্‌শা ইরানী (কবির ইরান সফরের অন্যতম সঙ্গী) ও কবি স্বয়ং।

আবেস্তান চর্চা শান্তিনিকেতনে আরম্ভ করেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডা. তারাপুরওয়ালার নিকট হইতে বিধুশেখর প্রারম্ভিক পাঠ গ্রহণ করেন; বৈদিক সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বুনিয়াদ তাঁহার সুদৃঢ় থাকায়, আবেস্তান ভাষা সহজেই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পুরে দাউদ আসায় এই চর্চা পুনর্জীবিত হয়।

অধ্যাপক পুরে দাউদের সাহায্যে মৌলানা জিয়াউদ্দিন কবির কবিতা আধুনিক পার্সি ভাষায় তর্জমা করেন; ইতিপূর্বে উর্দুতে তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল হইতে বিধুশেখরের সহিত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কয়েকটি বিষয় লইয়া মতভেদ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে একটি কার্য খালি হইলে তিনি তাহার প্রার্থী হন এবং ১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসে সেই কার্য পাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার যুগ হইতে তিনি ইহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের ভরসায়, তিনি একবার শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যান। সে আয়োজন ব্যর্থ হইলে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসেন ও বিশ্বভারতী গড়িবার সহায়তা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর কার্য করিয়া যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন আবার তিনি বিশ্বভারতীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তখন রবি অস্তমিত এবং বিধুও ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ১৯৫৯ সনের ৪ এপ্রিল বিধুশেখরের মৃত্যু হয়।

১৯৩৩ সনের শ্রাবণ মাসে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের সহিত সম্বন্ধ চুকাইয়া কলিকাতাবাসী হন। প্রায় ত্রিশ বৎসর এই আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী। রবীন্দ্রসংগীতের গুরু ছিলেন তিনি; তাঁহারই শিষ্য, প্রশিষ্যরা আজ ভারত-আকাশকে কবির গানে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। দিনেন্দ্রনাথ কেন বিশ্বভারতীর সহিত সম্বন্ধশূন্য হইলেন, তাহার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের জীবনীর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি জমিদারি সংক্রান্ত অর্থাদি ব্যাপার ঘটিত এই মনোমালিন্য ঘটে রথীন্দ্রনাথের সহিত। মোটকথা, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সহিত দিনেন্দ্রনাথ ও বিধুশেখরের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ খুবই দুঃখিত হন। বিদ্যাভবনের কর্তৃত্বের ভার অর্পিত হইল ক্ষিতিমোহন সেনের উপর; সংগীতভবনের দায়িত্ব গিয়া পড়িল শৈলজারঞ্জন মজুমদারের উপর। শান্তিদেব ঘোষ পূর্ব হইতেই আছেন; তাঁহার উপর স্বভাবতই রবীন্দ্রসংগীত পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্ব গিয়া পড়িল।

৮৬

বিশ্বভারতী কলাভবনের অন্যতম অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ করকে ১৯৩৫ সনের মার্চ মাসে তাঁহার শিল্পসাধন পীঠচ্যুত করিয়া কর্মসচিবের পদে বসানো হইল।

সুরেন্দ্রনাথের শিল্পমানস ক্রমশ স্থাপত্যরচনায় যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার

বুনিয়াদ হয় শান্তিনিকেতনে— রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তাহা বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ যাহার মধ্যে সামান্য শক্তি লক্ষ করিতেন, তাঁহাকে অনুকূল পরিবেশ রচনার মাধ্যমে, প্রচুর স্বাধীনতার মধ্যে বিচিত্র কর্মরূপায়ণের সুযোগ দিতেন। তাহার ফলে অজিতকুমার, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় গুণীদের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। আমিও যে সামান্য কাজ করিতে পারিয়াছি, তাহা কবি ও কবিসুত রথীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠিত সহায়তা ও উৎসাহতেই সম্ভব হইয়াছে।

৮৭

বিদ্যাভবন, সংগীতভবন ও কলাভবন যেমন পরিবর্তন হয়— তেমনি পরিবর্তন ঘটে শ্রীসদনে বা মেয়ে বোর্ডিং-এ। হেমবালাদেবী চলিয়া যাইবার পর প্রতিমাদেবীকে প্রণেত্রী করিয়া, অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তীদেবীকে পরিদর্শিকা করিয়া বালিকাদের হস্টেল চালাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু বেশিদিন তাহা সম্ভব হইল না। তখন মাদামোয়াজেল বসনেক (Bossenec) নামে এক ফরাসি মহিলাকে এই কার্যভার দিয়া আনা হইল (অক্টোবর, ১৯৩৫)। তিনি না জানিতেন ইংরেজি বা কোনো ভারতীয় ভাষা, না বুঝিতেন ভারতীয় বালিকাদের মনোভাব। তবুও অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ শক্তিবলে তিনি এই কার্য সুচারুভাবে কিছুকাল সম্পন্ন করেন।

শিক্ষাভবন ও পাঠভবন এখনো এক অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। এখানেও নিত্য নূতন শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত চলে। তথাচ এই ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠান আগাইয়া চলিয়াছিল।

৮৮

শান্তিনিকেতনের সীমা ক্রমশই বাড়িতেছে। আদিপর্বে ২০ বিঘা জমির দক্ষিণে যে মাঠ পড়িয়াছিল, তাহা দ্বিপেন্দ্রনাথ বন্দোবস্ত লন। পরে তাহা রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ করেন। দেখিতে দেখিতে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে প্রায় ২,৫০০ বিঘা স্থান বিশ্বভারতীর অন্তর্গত হইয়াছে— ইহার মূল্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে যে বিরাট মাঠ পতিত ছিল— তাহার কিয়দংশ ছিল সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের, অপরাংশ ছিল সুপুরের জমিদারদের। এই জমি গবর্মেন্টের সাহায্যে (Land acquisition) ক্রয় করা হয়। এই কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং কলিকাতার তরুণ উদীয়মান ব্যারিস্টার, আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র সুধীরঞ্জন দাশ।

জমি তো পাওয়া গেল। এইবার বিশ্বভারতীর জীবন-সদস্যদের মধ্যে সেই জমি বণ্টনের

প্রস্তাব সংসদ গ্রহণ করিয়া 'শান্তিনিবাস' নামে কলোনির নকশা প্রস্তুত করিলেন।

কালে সেখানে এক বিরাট পল্লি গড়িয়া উঠিল— অবশ্য এইটির সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়— যখন লোকে কলিকাতা হইতে দূরে বাস করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। সরকারের সাহায্যে জমি ক্রয় করিয়া তাহা এভাবে বিশ্বভারতীর সহিত সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তিদের বসতি করিতে দিবার সার্থকতা কী, তাহা স্পষ্ট নহে। আজ বিশ্বভারতীর বিস্তারের স্থান অত্যন্ত সীমিত। অথচ সেই-সব জমি লইয়া মালিক-মেম্বরগণ ব্যবসায় করিতেছেন!

শান্তিনিকেতনের চারি পাশে পূর্বপল্লি ও দক্ষিণপল্লিতে বহু গৃহস্থ আসিয়া বাস করায় নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্বে একটি শিক্ষিত স্থায়ী ভদ্রমণ্ডলীর আবশ্যক অনস্বীকার্য; কিন্তু সেই মণ্ডলী যদি বিশ্বভারতীর আদর্শ তথা মহর্ষি ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, তবেই তাহার স্বার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে এই জনসমস্যার আবির্ভাব হয় নাই; তবে তাঁহার সময়ে এই জনতাকে আহ্বান করিয়া আনিবার সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হইয়াছিল।

৮৯

বিশ্বভারতী যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহার জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ কোথায়? জীবন সদস্যদের এককালীন আড়াইশত টাকা প্রদত্ত তহবিল; দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিয়া, ছাত্রছাত্রীদের লইয়া নৃত্যগীত করিয়া, ধনীর দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া অর্থ আনিতেন। এ ছাড়া ছিল প্রকাশনবিভাগের আয় ও কয়েকটি রাজা, মহারাজা ও ধনীর বাৎসরিক দান। এই ছিল আয়। ব্যয় করিতেন কর্মসমিতি— যাঁহারা অর্থ অর্জন করিতেন না; অবশ্য কবির বিচিত্র সংগত-অসংগত ইচ্ছা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য কতকটা দায়ী ছিল। তাই সাধারণ খরচের জন্য বিবিধ তহবিল (year-marked) হইতে টাকা ঋণ (loan) গ্রহণ করা হইত এবং সাময়িকভাবে কাজ চালাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে কত তহবিলের ধার আর পূরণ করা হইল না— কত দাতার অর্থ এইভাবে সাধারণ ব্যয়ের খাতে বহিয়া গিয়াছে!

এইরূপ অর্থদৈন্য দূর করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ সনের বসন্তকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া নৃত্যাভিনয়ে বাহির হইলেন। পাটনা, এলাহাবাদ হইয়া যে সময় দিল্লি পৌঁছিলেন, তখন সেখানে গান্ধীজি আছেন। কবিকে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে এইভাবে ঘুরিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। কবির সহিত সাক্ষাত করিয়া জানিতে পারিলেন যে বিশ্বভারতীর সর্বসাকুল্যে ঋণের পরিমাণ ষাট হাজার টাকা। গান্ধীজি পরদিন বিড়লাদের নিকট হইতে ষাট হাজার টাকার চেক আনিয়া কবির হস্তে দিলেন ও বলিলেন 'এভাবে ভ্রমণ আর করিবেন না'। কবি সত্বর ফিরিয়া আসিলেন। ১৯৩৬ সনের বিশ্বভারতীর বার্ষিক রিপোর্টে সানন্দে ঘোষণা করা হয় যে তাঁহারা পুরাতন ধার সমস্ত

শোধ করিয়া দিয়াছেন ('able to clear off all our debts') এবং নূতন বৎসরে কোনো ঘাটতি নাই।

কিন্তু এ স্বস্তির নিশ্বাস কয়দিনের। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে নানা রন্ধ্রপথে অর্থ প্রবাহিত হইয়া পুর্বসমস্যাকেই চিরন্তন কবিয়া রাখিয়া গেল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ববীন্দ্রনাথ যে নাট্যাভিনয়েব দল লইয়া মাঝে-মাঝে সফবে বাহির হইতেন, তাহার উদ্দেশ্য সাধাবণভাবে বলা হয় অর্থসংগ্রহ। কিন্তু সেইটাই শেষকথা নয়। কবির এই নাট্যাভিনয়ে নিজের অপার আনন্দ ছিল; সেই আনন্দ পরিবেশন, আর্টের নব-রূপায়ণ দেখাইবাব জন্য প্রেরণা অনুভব করিতেন। অর্থের আয়-ব্যয়ের মাপকাঠিতে বিচাব কবিতে গেলে কবির ব্যক্তিত্বেব ও তাঁহাব সৃষ্টিধর্মের পরিপূর্ণ চিত্রটি অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

৯০

গঙ্গোত্রী হইতে যে ক্ষীণ জলধারা ১৯০১ সনে প্রবাহিত হয়— আজ তাহাতে কত শাখানদী আসিয়া মিশিয়াছে— কত উপনদী ভাঙিয়া বাহিব হইয়া নূতন নূতন ভূখণ্ডকে উর্বরা করিতেছে। স্কুল বা পাঠভবন, কলেজ বা শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, কলাভবন, সংগীতভবন একের পর এক ব্রহ্মবিদ্যালযেব শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন -চর্চার ব্যবস্থা হইয়াছে। কবির বহুদিনের ইচ্ছা, এখানে ইসলাম সংস্কৃতিও তাহার প্রাপ্যস্থান গ্রহণ কবে। তাহাও নিজামেব ঔদার্যে সফল হইয়াছে। এবার চীনাভবন স্থাপিত হইল। পাঠকের মনে আছে ১৯২১ সনে অধ্যাপক লেভি চীনা ভাষা চর্চা আরম্ভ করিয়া যান। তাব পর চীনা অধ্যাপক ভো-লিম্ ও ইতালির অধ্যাপক তুচ্চি চীনা ভাষার আলোচনার বর্তিকাটি উজ্জ্বল করিয়া ধবেন। তার পব দীর্ঘকাল লোকাভাবে, অর্থাভাবে চীনা চর্চা স্থগিত থাকে।

১৯২৮ সনে তান্-য়ুন্-সান্ নামে এক চীনা যুবক শান্তিনিকেতনে আসেন। দুই বৎসব আশ্রমে বাস করিয়া ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ও শান্তিনিকেতনের মর্মকথাটি আত্মগত কবিয়া দেশে ফিরিয়া যান এই সংকল্প লইয়া যে ববীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে কার্যত শান্তিনিকেতনে রূপদান কবিবেন। চীনদেশে তিনি Sino-Indian Cultural Society স্থাপন করিয়া তদ্দেশীয় মনীষীদেব প্রীতি অর্জন ও অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। অতঃপব তাঁহার চেষ্টায় যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা দ্বাবা চীনাভবনের পত্তন হয় (১৯৩৭ সনে)। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহবলাল নেহেরু নবনির্মিত চীনাভবনের দ্বার উন্মোচন কবিবেন স্থির ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইযা পডায় তিনি আসিতে পাবিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সেদিনের সভায় বলেন 'Let all human races keep their own personalities, and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living.' কবি বলিতেন— জগতেব সমস্যা এ নহে— কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া মিলন করা হইবে—

সমস্যা হইতেছে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া মিলন সংঘটন করিতে হইবে। কবি বলিলেন, 'Visva-bharati will remain a meeting place for individuals from all countries, East or West, who believe in the unity of mankind and are prepared to suffer for their faith.'

চীনাভবনের বিশাল অট্টালিকা এবং পার্শ্বস্থ অন্যান্য গৃহাদি চীনদেশ হইতে প্রাপ্ত অর্থে নির্মিত হইল। বলাবাহুল্য— এই ব্যাপারে অধ্যাপক তান্-য়ুন্ সান্-এর একক শ্রম ও নিষ্ঠা স্মরণীয়।

৯১

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পনেরো বৎসরের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একদিন উহার প্রস্‌পেক্টাসের মধ্যে ছিল 'The system of examinations will have no place whatever in the Visva-bharati, nor is there any confering of degrees.' অবশ্য এইটি ছিল উত্তরবিভাগের আদর্শ। তার পর সেই উত্তরবিভাগের এক অংশ কলেজ বা শিক্ষাভবনে পরিণত হয়; তখন পরীক্ষার ফলের উপর দৃষ্টি না দিয়া উপায় থাকিল না। যাহারা বিদ্যাভবনে কাজ করিল, তাহারা বিদেশে গিয়া ডিগ্রি আনিল এবং সেই ডিগ্রির জোরে জীবিকা অর্জনের উপায় করিয়া লইল। এই অবাস্তব পরিকল্পনা একদিন স্বাভাবিকভাবেই অবলুপ্ত হয় এবং কলেজী অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পরীক্ষায় সুফল আকাঙ্ক্ষালোলুপ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক একখানি পত্র হইতে তাহার স্পষ্ট আভাস আমরা পাই। তিনি লিখিতেছেন যে বিদ্যালয় ক্রমে সহজপন্থার দিকেই চলিয়াছে— 'শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি— সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে; তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেইদিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিদ্যালয় যদি একটা হাইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয়, তবে বলতে হবে ঠকলুম। এখন হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে।' এইটি লেখেন ১৯৩৫ সনে জুলাই মাসে। এ-সব কথা নূতন নহে। কতবার ভাবিয়াছেন, পরীক্ষার মোহ কাটাইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র করিবেন; কিন্তু বাধা কোথায় এবং কত, তাহার আলোচনা আমরা একাধিকবার পূর্বে করিয়াছি।

বিশ্বভারতীতে বহু নূতন কর্মী আসিয়াছেন, যাঁহাদের শান্তিনিকেতনের tradition বা পরম্পরা গত জীবনধারার সহিত সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা বিদ্যালয়ের ও কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সাফল্য সৃষ্টির জন্য আসিয়াছেন; সে কাজ তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত করিতেছেন। আদর্শ যখন দৃশ্য হয়, তখনি তাহা অত্যন্ত common place বা সাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কবির সদা চলমান মনে সেটি সায় পায় না।

৯২

বিশ্বভারতী নানাদিক হইতে বড়ো হইতেছে। পুরাতনের সহিত নবীনদের সংঘাত আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ বিশ্বভারতীর সংবিধানকে কেন্দ্রগত করিবার দিকে ঝুঁকিলেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকমণ্ডলীর যে শক্তি ও সম্মান ছিল তাহা গিয়া বর্তায় সংসদ তথা কর্মসমিতির হস্তে। অধ্যাপকমণ্ডলীর এককালে যে ক্ষমতা ছিল তাহার একটি উদাহবণ দিতেছি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমপর্বে বা বিশ্বভারতীর আদিযুগে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা ছিল না; ইহার কারণ অবশ্য অর্থাভাব। আদিযুগে বেতন ছিল কম, সুবিধা-সুযোগ ছিল বহু ও বিচিত্র। সে সময়ে অর্থের প্রয়োজনও ছিল কম, সভ্যতার চাহিদাও সামান্য। কালে, যুদ্ধোত্তর পর্বে অর্থমান যায় বাড়িয়া। বিশ্বভারতী পর্বে তাই প্রভিডেন্ট ফান্ড সৃষ্টির জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্পাদকরূপে আমি পরিকল্পনা পেশ করি, এবং সম্পাদকরূপে যে শক্তি ছিল, তাহার দ্বারাই শেষপর্যন্ত উহা কার্যকরী করিতে সক্ষম হই। এই অধ্যাপকমণ্ডলীই এককালে সর্বাধ্যক্ষ, বিভাগীয় অধ্যক্ষ, বিষয়গত পরিচালক ও অন্যান্য সকল কর্মীদের নির্বাচন করিত; কর্মী নিয়োগ করিতেন কার্যনির্বাহক সমিতি। এই-সব নির্বাচনাদির ভাব এখন সংসদের উপর— তাহাতে অবশ্য অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রতিনিধি থাকেন।

এইরূপ কেন্দ্রগত করার বিবিধ কারণের মধ্যে হয়তো-বা কর্মীদের কিছুটা ঔদাসীন্য অন্যতম। কালান্তরে কেন্দ্রীয় কঠিনতার যে প্রয়োজন এ কথা কবি বুঝিতেছেন। তা ছাড়া এখানকার অধিকাংশ কাজকর্মের জন্য তাঁহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়; তাহাদের মতামত সমর্থন করিতে হয়; তাঁহার বয়স এখন পঁচাত্তর হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বভারতীর কর্মীদের মধ্যে নূতন লোক অনেক। নূতন ব্যবস্থায় তাঁহাদের কর্ম-অধিকার, দায় ও দায়িত্ব বহুল পরিমাণে সংকুচিত এবং কর্মকর্তাদের শক্তি ও অধিকার অপরিমিতভাবে বর্ধিত হইযাছে। রবীন্দ্রনাথের এই পরিস্থিতি ভালো লাগে না; কর্মীদের এভাবে অধিকার বঞ্চিত করায় মন সায় পায় না। কিন্তু গত পঁয়ত্রিশ বৎসরে একটা tradition গড়িয়া উঠে নাই; নিষ্ঠাবান কর্মীমণ্ডলীও না। রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীর সকল শ্রেণীর কর্মীদের আহ্বান করিয়া যে ভাষণ দিয়াছিলেন— তাহা একদিকে বর্তমান ব্যবস্থারই সমর্থন 'ঢিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল 'ডিমক্রেসির'র নামে।— আমরা পরের শাসনে বাঁধা কাজ চালাতে পারি; কিন্তু নিজের প্রবর্তনায় পারি নে। এই কারণে আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল।— তাই এখানে চারি দিকে পরস্পর সম্বন্ধের অবাধ উদারতার মাঝখানে কর্মচালনার কর্তৃত্বপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে।' কিন্তু কবির ইচ্ছা সরকারিভাবে যে-সব অধিকার হইতে অধ্যাপকগণ নববিধান মতে বঞ্চিত, ব্যক্তিগতভাবে কবি তাহা পূরণ করিবেন। তাই এই ভাষণে তিনি বলেন 'আজ তোমাদের ডেকেছি, কোনো কিছু নতুন করবার বলবার জন্য নয়। আগে আমাদের এখানে যে অধ্যাপকদের মিলন সমিতি ছিল তারই স্মৃতি মনে আনবার জন্য। আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদের সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল, তারই পুনরুদ্ধার করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।... দেশে বাইরে বড়ো-বড়ো কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাদলি মারামারি হচ্ছে। যদি আমাদের এ আশ্রম তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়, তবে সেটা তো বাঞ্ছনীয় হবে না, অথচ মন জুগিয়ে সত্য গোপন করার মতো প্রবৃত্তি যেন আমাদের না

হয়। কারণ চিত্তের দুর্বলতা থাকলে সত্যকার মিলন হবে না— হতে পারে না... কোনো একটা বিশেষ দিনে অধ্যাপকরা সমবেত হয়ে পরস্পর খোলাখুলিভাবে বলবার কইবার সুযোগ যাতে পান, সেটা আমার ইচ্ছা। আমিও এইরকম মিলন সভা হলে যোগ দিতে পারব।... যদি অধ্যাপকসভা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্যে যে, কোনো অসামঞ্জস্য ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারি।' (২ অগস্ট, ১৯৩৬)

কিন্তু যে স্রোত বহিতেছে, তাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি আব তাঁহার নাই!

৯৩

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে, যদি শিক্ষাসত্র ও লোকশিক্ষা সংসদের উল্লেখ করা না হয়। শিক্ষাসত্র যদিও শ্রীনিকেতনের সঙ্গেই মুখ্যত যুক্ত, তবে ইহার আরম্ভ হয় শান্তিনিকেতনে।

অনেকের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথ হাত-হাতিয়ারি শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি চতুঃ-কলা বা four arts— সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলাকেই একান্তভাবে শিক্ষণীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমপর্বের মধ্যে আমরা বারে-বারে হাতের কাজ শিখাইবার আয়োজন করিতে দেখি— কখনো জাপানি মিস্ত্রি, কখনো দেশি ছুতোর, কখনো শিক্ষিত কারুকর আসিয়াছে, গিয়াছে। নিয়মিতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। কারুশিক্ষা সম্বন্ধে কবি লেখেন— 'আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো-না-কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়— আসল কথা এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব, সতেজ হয়ে ওঠে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়।... দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সফলতার সঙ্গে মনের সফলতার যোগ আছে— এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালোরকমের মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।'

শান্তিনিকেতনে কবির এই পরিকল্পনা কখনো তেমনভাবে রূপ গ্রহণ করে নাই; তাহার কারণ সাধারণ ভদ্র মধ্যবিত্ত বা হঠাৎ ধনীদের পুত্ররা এই-সব হাতের কাজের প্রতি মনোযোগী হইত না; কারণ তাহারা জানে, মসী পিসিয়া তাহাদের ধনাগম হইবে— পেশীর সাহায্যে জীবিকার ধান্ধায় তাহাদের নামিতে হইবে না। 'The tradition of the community, which calls itself educated, the parents, expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all over-whelmingly arrayed against the idea I had cherished.... 'it is not possible to give them the ideal kind of education.'

কবির মনে কর্ম বা শ্রমকেন্দ্রিক বিদ্যায়তনের স্বপ্ন রূপদানকল্পে এল্‌ম্‌হার্স্টের সহিত পরামর্শ করিয়াও তাঁহার সহযোগিতা ও উৎসাহে শান্তিনিকেতনের পূর্বপ্রান্তে সন্তোষচন্দ্র

মজুমদারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসত্র উন্মোচিত হয়। কবি জানিতেন এই বিশেষ বিদ্যালয়ে গ্রামের ছেলেরাই শিক্ষা লইতে আসিবে। তাঁহার বিশ্বাস, এখানেই project education বা পরিপূর্ণ শিক্ষার বুনিয়াদ পত্তন হইবে এবং অচিরকাল মধ্যে 'the village school will be the real school'— এই উক্তি (১৯৩১) গান্ধীজি প্রবর্তিত Basic education পরিকল্পনার বহু পূর্বের।

রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাসত্র স্থাপন করেন। কালে ইহা কীভাবে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় এবং কালান্তরে তাহা কেমন করিয়া সর্বার্থক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে— তাহার আলোচনা অন্যত্র হইবে।

৯৪

১৯৩৬ সনে শিক্ষা সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিষয়ক কয়েকটি ভাষণ দেন। "শিক্ষার সাঙ্গীকরণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তার অনুক্রমণরূপে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক সাহেবকে লিখিত এক পত্র মুদ্রিত হয়। তাহাতে কবি লোকশিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। দেশের যে-সকল নরনারী নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত, অবসরমতো যাহাতে ঘরে বসিয়া তাহাবা শিক্ষিত হইতে পারে, তাহার পরিবেশ সৃষ্টি সরকাবই করিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষোত্তীর্ণেরা যদি সরকারের আনুকূল্যে ও স্বীকৃতি লাভ করে, তবেই তাহার সফলতাব আশা। 'রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।'

নানা কারণে বাংলার লীগমন্ত্রী-পরিষদ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতেই ইহার কার্য শুরু করা হয়। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মসচিবরূপে ইহার সম্পাদক হইলেন, আমার উপর সহকারি-সম্পাদকের কার্যভার অর্পিত হইল। বৎসর কাল পরে উহা শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়— কারণ মুখ্যত ইহা গ্রামোদ্যোগের কার্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়।

লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের মানপত্র প্রদত্ত হইত বিশ্বভারতীর সমাবর্তন দিবসেই। কিন্তু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইলে (১৯৫১) এই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকারের আইনগত বাধা আছে দেখা গেল। ১৯৬২ সনে বিশ্বভারতী আইন সংশোধন করিয়া লোকশিক্ষার স্নাতকদের মর্যাদা দান করা হইয়াছে।

৯৫

হিন্দি ভাষাভাষীর দেশের বাহিরে হিন্দি ভাষা, সাহিত্য,ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য শান্তিনিকেতনেই বোধ হয় প্রথম 'হিন্দিভবন' স্থাপিত হয়। শান্তিনিকেতনে হিন্দিব চর্চা বহুকালের। প্রাক্-ব্রহ্মাচর্যাশ্রম পর্বে শান্তিনিকেতন মন্দিরে যে আশ্রমধারী পিতা ও পুত্র ছিলেন, তাঁহারা উত্তর প্রদেশের লোক। তাঁহারা বাংলার বাহিরে হিন্দিতে 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রচার করিতে যাইতেন; হিন্দি ভাষায় ব্রাহ্মধর্মীয় গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন।

শান্তিনিকেতনে হিন্দি চর্চার সূত্রপাত হয় ক্ষিতিমোহন সেনের বিদ্যালয়ে যোগদানের পর হইতে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ক্ষিতিমোহন 'কবীর' বাংলা হরফে, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই চারিখণ্ড গ্রন্থের উপব নির্ভর করিয়া পরে *One Hundred Poems of Kabir* নামে সুপরিচিত গ্রন্থ ইংরেজিতে ও তৎপবে প্রায় সকল পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে আন্তরপ্রদেশের ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম হিন্দিই হইবে, তবে তিনি উহাকে জোর করিয়া চালু করাইবাব চেষ্টা হইতে উৎসাহীদের নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, হিন্দি পঠন-পাঠন আরম্ভ হয বিশ্বভারতী পর্বে। কবির ও এন্ড্রুজেব ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে যেমন নানা ভাষা ও বিদ্যাচর্চার আয়োজন হইতেছে, তেমনই হিন্দি চর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র এখানে প্রতিষ্ঠিত কবা। তজ্জন্য এন্ড্রুজই ছিলেন উৎসাহী। এই বিদেশী—যিনি সর্বপ্রথম ভাবতের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি সর্বভাবতীযদের বাক্‌বিনিময়ের জন্য হিন্দিকেই মুখ্যস্থান দিয়াছিলেন। হিন্দিভবনের অর্থসংগ্রহ তিনিই করেন। হিন্দিভবনের ভিত্তিস্থাপন দিন (১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮) এন্ড্রুজই পৌরোহিত্য করেন। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, যে দেশে কি এমন ব্যক্তি নাই, যিনি শান্তিনিকেতনে 'হিন্দি অধ্যাপক' পদ সৃষ্টির জন্য অর্থদান করিতে পারেন। হিন্দিভবনের অট্টালিকা নির্মাণ ও প্রাথমিক কার্যাদির জন্য সহায়তা পাওয়া গেল হলবাসিয়া ট্রাস্ট হইতে। এক বৎসর পর (৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৯) হিন্দিভবন নির্মিত হইয়া গেলে জওহরলাল নেহেরু উদ্বোধন করিলেন।

কবির জীবনকালে বিশ্বভারতীর এই হিন্দিভবন প্রতিষ্ঠাই শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৯৬

১৯৩৯ সনের শেষদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। দেখিতে দেখিতে তাহা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। যে অর্থদৈন্য, খাদ্যাভাব দেশব্যাপী, তাহা বিশ্বভারতীর দ্বারে আসিয়াও আঘাত করিল। বাংলা গবর্মেন্ট বা লীগ মন্ত্রীসভা একবার পঁচিশ হাজার টাকা বাজেটে বিশ্বভারতীর জন্য ধার্য করিলেন। কর্তৃপক্ষ বাজেটের অঙ্ক দেখিয়া উৎফুল্ল। কিন্তু সে টাকার sanction মেলে না। তখন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং হাসান সুরাবর্দী সর্বময় কর্তা বলিলেও চলে। মনে আছে রথীন্দ্রনাথ আমাকে পাঠাইলেন। লীগের কত চাঁই ও পুঁটির নিকট ধর্না দিলাম,

এখন ভাবিলেও খারাপ লাগে। অবশেষে বহুকাল পরে টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু এই একবার মাত্র। এদিকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সেই পঁচিশ হাজারের ভরসায় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছেন, অনেকগুলি প্ল্যানও প্রস্তুত করিয়াছেন। সে-সবই বন্ধ করিতে হইল।

কবির শরীর দিন দিন খারাপ হইতেছে। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁহার মর্ত্যজীবনের কাল শেষ হইয়া আসিতেছে। বিশ্বভারতীর জন্য খুবই উদ্‌বিগ্ন। ১৯৪০ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ আসিলেন কবিকে দেখিবার জন্য। গান্ধীজির ফিরিবার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে একখানি বন্ধ পত্র দেন। সেই পত্রে কবি লেখেন যে তাঁহার অবর্তমানে বিশ্বভারতীর ভার গান্ধীজি যদি গ্রহণ করেন, তবে তিনি সুখী হইবেন। গান্ধীজি এই পত্রখানি দেন আবুল কালাম আজাদকে এবং যথাসময়ে যথা কর্তব্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

ভারত স্বাধীনতা লাভ কবিয়া (১৯৪৭) স্বীয় সংবিধান রচনায় প্রবৃত্ত হইল। অতঃপর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রেসিডেন্ট পাইবার পর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করিল (মে, ১৯৫১)।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠার দশম বৎসরে রবীন্দ্রনাথ আপনার অন্তরেব বিশ্বাসবলে ব্রহ্মাচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। আর তাঁর মহাপ্রয়াণের দশ বৎসরের পর দেশের সকল দলের প্রতিনিধিদের সর্ববাদী সম্মতিক্রমে ভারতীয় পার্লামেন্ট তাঁহার বিদ্যায়তনের ভার গ্রহণ করিলেন।

শান্তিনিকেতনের তরুশূন্য প্রান্তরে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের যে শিশুতরুটি রোপণ করেন, তাহা অর্ধশতাব্দী-মধ্যে একটি বিশাল মহীরূহে পরিণত হইয়াছে। তাহার শাখায় কত নীড় বচিত হইয়াছে। ১৯১১ সনে অজিতকুমার চক্রবর্তী ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে যে ভাষণ দান করেন, তাহা যেন এতদিনে রূপগ্রহণ করিল। রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা ও বিশ্বভাবনা মিলিয়া বিশ্বভারতী ভারতকে বিশ্বের নিকট ও বিশ্বকে ভারতের নিকট আনিয়া দিয়াছে। কবির কণ্ঠে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' যে বাণী উদ্গীত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবে রূপ লইয়াছে শান্তিনিকেতনেরই প্রান্তরে।

শান্তিনিকেতনবাসীরা এই উত্তরাধিকার সগৌরবে রক্ষা করুন এই আশায় গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম।